প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৭

প্রকাশক ঃ

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শশধর প্রকাশনী

১৯এ, কেদার বসু লেন

কলিকাতা-৭০০০২৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রণ ঃ

অশোক কুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস

১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

অনুবাদকবৃন্দ

শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দাশ

শ্রী মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং

শ্রী ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকের কথা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম' (ধর্ম)।

জীবন এবং সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হোল প্রেম। প্রেম আছে, থাকবে। তার রূপ, ভঙ্গী পাল্টায় সময়ের অগ্রসরতায়, সামাজিক—অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তবু প্রেম পুরনো হয় না, এর তীব্র আবেগ নিষ্প্রভ হয় না। প্রেমের প্রতি আমাদের আগ্রহ কমে না। বিশেষ করে সেই প্রেম যদি এক বিদেশী যুবকের সঙ্গে বাঙালী মেয়ের সেই তিরিশের দশকের হয়; যখন আমাদের দেশ পরাধীন, সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার বেড়াও বেশ মজবুত। সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত দার্শনিক-পণ্ডিত মির্চা এলিয়াদের দু-একটি রোমান্টিক উপন্যাসের মধ্যে এইটির পটভূমি কলকাতা। বিষয়বস্তুর এই অভিনবত্বই আমাদের ১৯৩৩ সালে রুমানিয়ান ভাষায় প্রকাশিত এবং ১৯৫০ সালে ফরাসী ভাষায় অনূদিত এই বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশে আগ্রহী করে তোলে। এর জন্য মূল রুমানিয়ান ভাষায় প্রকাশিত এবং ফরাসী ভাষায় অনূদিত দুটি বই-ই আমাদের পাঠ এবং তুলনা করতে হয়েছে।

কলকাতার Alliance Francaise এর ডাইরেক্টর Monsieur Michel Carriere এর সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হোত কি না সন্দেহ আছে। উনি শুধু বইটি দিয়েই সাহায্য করেন নি, উনি দিল্লীর Ambassade de France En Inde'এর Publications Adviser Mr. Rajesh Sharma'র সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। Mr. Rajesh Sharma ফ্রান্স থেকে বইটি বাংলায় প্রকাশের অনুমতি সংগ্রহে এবং অন্যান্য ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ কলকাতার Alliance Francaise এর Smt. Ranu Purakaistha'র আগাগোড়া আন্তরিক সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। বইটি প্রকাশে উনি বিভিন্ন প্রকারে আমাদের সাহায্য করেছেন। আমাদের অন্যতম অনুবাদক শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দাশের মূল্যবান পরামর্শ এবং শ্রম অবশ্য স্বীকার্য।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে অমানুষিক পরিশ্রমে বইটির প্রচ্ছদ, পরিমার্জনা, পুনরলিখন এবং সম্পাদনা করেছেন শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছে ঋণ অপরিশোধ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম গ্রন্থ 'চলচ্চিত্রের আবির্ভাব' যা জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত তা প্রকাশের গৌরব আমাদের সংস্থারই।

ভূমিকা

লা নুই বেঙ্গলীর নায়ক অ্যালেন এক ইওরোপীয়ান যুবক। এক শিল্প সংস্থায় ড্রাফট্‌স্‌ম্যানের কাজ নিয়ে সে ভারতবর্ষে এল। কর্মক্ষেত্রে সরাসরিভাবে সে দায়বদ্ধ ছিল বাঙালী নরেন্দ্র সেনের কাছে। অর্থাৎ সে ছিল নরেন্দ্র সেনের অধস্তন কর্মচারী। ক্রমশঃ নরেন্দ্র সেন আকৃষ্ট হলেন যুবক অ্যালেনের উদ্যমী, পরিশ্রমী চরিত্রের প্রতি। অ্যালেনকে দত্তক পুত্র হিসেবে সারা জীবন নিজের কাছে রেখে দেওয়ার ইচ্ছেও তাঁর মনের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করলো। তিনি অ্যালেন কে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসে রাখলেন। সবার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ক্রমশঃ পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যেও অ্যালেনের প্রতি স্নেহ, মায়া, মমতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

মৈত্রেয়ী নরেন্দ্র সেনের মেয়ে। তার তখন বছর যোল বয়স। অ্যালেন-মৈত্রেয়ীর পরিচয়ের প্রথম পর্বে অ্যালেন তার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করেনি। সময় থেমে রইল না। অ্যালেন যত এদেশের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকল, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোল তত সে অনুভব করতে, শ্রদ্ধা করতে শুরু করলো ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সেবাপরায়ণতার গভীরতাকে এবং সে পাশাপাশি কলকাতার তদানিন্তন ইওরোপীয়ান এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান রুচি এবং জীবনযাত্রার অন্তঃসার শূণ্যতার প্রকৃত চেহারা সম্পর্কে অবহিত হোল। সে লক্ষ্য করতে শুরু করলো মৈত্রেয়ীর দেহ সৌন্দর্যের সঙ্গে বুদ্ধি-মত্তা এবং কবি মনের আশ্চর্য মিশ্রণ। নরেন্দ্র সেন এবং তাঁর স্ত্রীর তার প্রতি অতিরিক্ত পক্ষ-পাতিত্ব, সহানুভূতি দেখে অ্যালেনের মনে হোল যে তাঁরা অ্যালেনের সঙ্গে মৈত্রেয়ীর বিবাহের কথা ভাবছেন। তার ব্যক্তিগত ধর্মীয় সংস্কার, ঐতিহ্য যে তার আশ্রয় দাতাদের সংস্কারের থেকে অনেক দূরে এবং তা যে তাদের বৈবাহিক মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করলেও করতে পারে এ ভাবনা তখনকার মতো অ্যালেনের মন থেকে তিরোহিত হোল। সে ঝুঁকে পড়লো মৈত্রেয়ীর দিকে। মৈত্রেয়ীরও বোধ হয় অ্যালেনের প্রতি আকর্ষণ কম ছিলনা। সুতরাং অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দিল প্রেম। এক বাঁধভাঙা, দুর্বার প্রেম। অ্যালেন কিন্তু এই যুবতী মেয়েটির মনের সম্পূর্ণ অধিকার পেলনা। মেয়েটির রহস্যজনক মনের কাছে অ্যালেন বার বার বাধা পেতে থাকলো। মৈত্রেয়ীর মনকে তার মনে হোল এদেশের জঙ্গলের মতোই জটিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং গভীর। তার মনের গভীরতার তল পেলনা অ্যালেন। কখনো, কখনো অ্যালেনের অপরিণত মনে

এই প্রচণ্ড প্রেমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দিল অযৌক্তিক ঈর্ষা, ঘৃণা, সন্দেহ, বিতৃষ্ণা। সে সব কিছু বুঝতে পারলেও যুক্তির পূর্বনির্ধারিত পথে এগুলো ঘটছিল না। অ্যালেন বুঝতে পারছিল না মৈত্রেয়ী এর আগে অন্যকে মন সমর্পন করেছে কি না। কিন্তু সে ইতিমধ্যেই তার কামনা বাসনার কাছে আত্মসমর্পন করে ফেলেছে। সে ধর্মান্তরিত হবার চিন্তাও করতে শুরু করেছে। মৈত্রেয়ী হয়ে দাঁড়াল তার একমাত্র কামনার ধন, ক্লান্তির আশ্রয়।

তাদের এই ঘনিষ্টতার কথা কিন্তু গোপন রইল না। নরেন্দ্র সেন অ্যালেনকে বিতাড়িত করলেন এবং এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে দুজনের মধ্যে কোন যোগাযোগ রাখা সম্ভব না হয়।

কিন্তু এভাবে সব কিছু শেষ করে দেওয়া সম্ভব হোলনা। অ্যালেনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য মৈত্রেয়ী এক বিপজ্জনক পথে পা বাড়াল। এদিকে অ্যালেনের মন তখন দুভাগে বিভক্ত। একদিকে তার মৈত্রেয়ীর কষ্টের জন্য নিজেকে দায়ী করার চিন্তায় প্রচণ্ড অনুশোচনা, অসহায়তা অপর দিকে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ক্রোধ। সে আপাত শান্তি খোঁজার জন্য আগের ক্ষনিকের সঙ্গিনীদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, এর ফলে তার হারান ভালোবাসার প্রতি মমতা, আনুগত্য বিস্ময়করভাবে প্রখরই হয়ে উঠল এবং সে তীব্র হতাশায় ভেঙে পড়লো।

অ্যালেন তার প্রখর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অনুভূতির তিক্ষ্নতা দিয়ে সুচারুভাবে জাগিয়ের তুলেছিল মৈত্রেয়ীর মনোজগৎ। সে জগৎ ছিল একাধারে অনুভূতির কাব্যময়তার, যুক্তি বিজ্ঞানের, দর্শনের, ধর্মের এবং তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল মানসিক এবং শারীরিক প্রেম—চরম এবং দুর্বার। মৈত্রেয়ী এমনই একটা নারী চরিত্র যাকে ভুলে যাওয়া সহজ নয়। তার সঙ্গে অ্যালেনের মিলন-সংঘাত, দুটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, অনুভব-যুক্তির সংঘাত এবং মিলনও বটে। তাই আত্মজীবনী-মূলক প্রেমের উপন্যাস হলেও এর বিশিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপট (সহিংস স্বদেশী আন্দোলন—বিনয়-বাদল-দীনেশের অভিযান, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, অ্যানি বেশান্ত, সরোজিনী নাইডু, হেরাবাঈ টাটার নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলন, ১৯২৬ সালে All India Women's Conference ইত্যাদি), তদানিন্তন ইওরোপীয় এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের সংস্কৃতি এবং জীবন এবং তাদের এদেশের লোকেদের প্রতি ধারণা, এদেশী উচ্চবিত্ত সমাজের তাদের প্রতি ধারণার একটা সমান্তরাল চেহারার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি একটা অজানা সৌন্দর্য এবং শক্তিতে

পাঠক মনকে নাড়া দেয়।

দুটি মুখ্য চরিত্রে সত্য সম্বন্ধে ধারণারও সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি নিজের কাছে সত্য থাকবে, না থাকলেই আত্মবিরোধ দেখা যায়, সেই অবস্থায় তার মুক্তি আর সম্ভব হয় না। হিন্দুর কাছে এইটাই প্রধান কথা। সত্য এক ব্যক্তিকে অন্যের সঙ্গে আবদ্ধ করে। সত্য সামাজিক সংহতির ভিত্তি— এই গুণগুলোকে, ব্যাখ্যাকে বাইবেলে বড় করা হয়েছে। হিন্দুর কাছে এটা অপেক্ষাকৃত সামান্য মনে হয়। অহিংসা, সংযম প্রভৃতি গুণের ব্যাখ্যার গুরুত্ব সত্যের অপর গুণটাকে উল্লেখ্য বোধ করেনি। মূলত জিতেন্দ্রিয় হয়ে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিই হচ্ছে মোক্ষলাভের উপায়।

ভগবানের দশটি প্রধান আজ্ঞার ভেতর অন্যতম প্রধান হোল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলবে না। প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে বাইবেলের কথার সঙ্গে তুলনীয় বাক্য মহাভারতে পাওয়া গেলেও এগুলো আমাদের ঐতিহ্যে তেমন মুখ্য স্থান লাভ করেনি যেমন করেছে, স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ, তার কারণ আমাদের মূল সুরটা অন্তর্মুখী। হিন্দুরা মনে মনে নিঃসঙ্গ।

এই বৈরাগ্যের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়ে আছে বসুধাকে কুটুম্ব চিন্তা। এটা আত্মীয়তাবোধের বিস্তৃতি হিসেবে শ্রদ্ধেয় কিন্তু কর্তব্যবোধের দিক থেকে নিরাপদ নয়। কুটুম্ব চিন্তায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারের প্রশ্নটা নগন্য হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক স্নেহ ভালোবাসাকে বাদ দিয়ে কোন সমাজই চলে না কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। নাগরিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বহু মানুষের সঙ্গে সংযুক্তি যাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তার বন্ধন নেই এবং দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তনশীলতা। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে অনাত্মীয় ও ভিন্ন রুচির সঙ্গে যে নীতিবোধ প্রয়োজন, প্রাচীন নীতিবোধের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য আছে।

আত্মীয় শব্দেরও স্তরভেদ আছে। অনাত্মীয়ের অধিকারকে স্বীকৃতিই উচ্চতর স্তরে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। তাই অ্যালেনের চেতনায় এবং তার সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশে প্রেম আর যুক্তির একটা দ্বান্দ্বিক বিবর্তন লক্ষণীয়। প্রেমের দৃষ্টিতে সাধারণ বিশেষ হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই আমরা নিজের কাছে 'বিশেষ'; প্রেম অপরকে নিজের অংশ করে তাকে বৈশিষ্ট্য দান করে। আর যুক্তির স্বভাব হোল বিশেষকে একটা সাধারণ তত্ত্বের সঙ্গে যুক্তে করে দেখা। যাকে আমরা অক্লেশে আত্মীয় বলে চিনি, তার প্রতি সদ্ভাবের জন্য যুক্তি প্রয়োজন হয় না। অন্য রকমটাই কঠিন।

মির্চা এলিয়াদের জন্ম ১৯০৭ সালে রুমানিয়ার বুকারেস্ত শহরে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে বসবাস করেন। 'যোগ' সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি বুকারেস্ত ইউনিভার্সিটিতে দর্শনের অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি প্রথমে রোম তারপর লিসবনে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি প্যারিসের 'লেকল দ' ওত্ এত্যুদ'য়ে' (School for Higher Studies) আমন্ত্রিত অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। এই সময় থেকেই তিনি সরাসরি ফরাসী ভাষায় লিখতে শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে ইওরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৩ সাল থেকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় ইতিহাসের অধ্যাপকের আসনে স্থায়ীভাবে মনোনীত হন।

তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি রোমান্টিক উপন্যাস—লা নুই বেঙ্গলী (Night in Bengal), ফোরে এ্যান্যত্যারদিত্ (Prohibited Forest), ল' ভিয়েই অম্ এ লোফোসিয়ে (The oldman and the officer) ইত্যাদি। ধর্ম সাহিত্যে প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হোল ল' সাক্রে এ ল' প্রফান (The sacret and the Profane), লা নস্তালজি দে জোরিজিন (Nostalgia of Origin) ইত্যাদি।

অনবধানবশত মুদ্রণ এবং অন্যান্য প্রমাদ যা যা রয়ে গেল তার জন্য দায় সম্পাদকেরই অন্য কারো নয়।

আমাদের সদ্য প্রকাশিত বই

ডিরোজিও—সম্পাদনা ঃ রমাপ্রসাদ দে	২৫
মার্কসবাদ কবিতার উৎস সন্ধানে—সম্পাদনা ঃ রমাপ্রসাদ দে	১০
প্রসঙ্গ রামায়ণ—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫
যত মত তত পথ—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫
তত্ত্বসার—রামচন্দ্র দত্ত (রামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্য	২০.
সপ্তকন্যার কাহিনী—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	২০
চারজন এবং একজন—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	২২
শুকসারি কথা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	২০.
উত্তরায়ন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
স্বর্গের বাহন—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	২২
নির্দেশ—আশাপূর্ণা দেবী	১৫
কতকাণ্ড রেলগাড়ীতে—আশাপূর্ণা দেবী	৮
মসনদ—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	(যন্ত্রস্থ)
জয় পরাজয়—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	(যন্ত্রস্থ)
আমার বাল্যকথা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২
চলচ্চিত্রের আবির্ভাব—জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার রজত কমল প্রাপ্ত)	৩৫
বিংশতি কবিতা ঃ ডিরোজিও—অনুবাদ ঃ রমাপ্রসাদ দে ও মঞ্জুষ দাশগুপ্ত	৬.
দশ দিগন্তে রবি—সম্পাদনা ঃ রমাপ্রসাদ দে	১০.
নীলদিগন্ত—মায়া বসু	২৫.
নরক স্বর্গ নরক—মায়া বসু	১২
চক্র-চক্র—বাণী রায়	১২.
সিনেমা আবিষ্কারের গপ্পো—জয়ন্ত ভট্টাচার্য	৮.
দূর কভু দূর নয়—শঙ্কু মহারাজ	২০.
কেশবচন্দ্র সেন ব্যক্তিত্ব ও গদ্যশিল্প—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৫.
স্ত্রী—কাহিনী ঃ বিমল মিত্র ঃ চিত্রনাট্য (ছবিসহ)—সলিল দত্ত	১৫.
সেরা প্রেমের গল্প—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৩০.
সেরা প্রেমের গল্প—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১৫.

মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সঠিক তারিখটা মনে না থাকায়, কাহিনীটা কোথা থেকে আরম্ভ করবো ঠিক বুঝতে পারছি না। সত্যিকথা বলতে কি সে বছরে আমার ডায়েরিতে কিছুই লেখা নেই। অনেক পরে তার নাম পেলাম, স্যানাটোরিয়াম থেকে ছুটি পাবার পর। তখন আমি থাকতাম আলিপুর অঞ্চলে, নরেন্দ্র সেনের বাড়ি। সেটা ১৯২৯ সাল। কিন্তু ইতিমধ্যেই মৈত্রেয়ীকে আমি দেখেছি কম করে দশবার। কাহিনী শুরু করবার সময় আমি যে কষ্ট পাচ্ছিলাম তা হোল মৈত্রেয়ীর সে সময়কার মুখ আমার ঠিক মনে পড়ছিল না। আর আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সেই বিস্ময়, অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ আর উদ্বেলতার কথা আমি কী করে ভাষায় প্রকাশ করবো তাও বুঝতে পারছিলাম না।

মনের মধ্যে শুধু তার একটা অস্পষ্ট স্মৃতিই এতকাল ধরে রেখেছিলাম, অক্সফোর্ড বুক স্টেশনারির সামনে, মোটরে অপেক্ষমান সেই মৈত্রেয়ীর রূপ। তার বাবা আর আমি 'বড়দিন' উপলক্ষ্যে কিছু বই পছন্দ করতে সেখানে ঢুকে ছিলাম। মনে আছে তাকে দেখে অস্বস্তিকর এক শিহরণ হয়েছিল আমার শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘৃণার ভাব আমার এল। কৌতূহলও যে একেবারে ছিল না তা নয়। আমার কৌতুহলী চোখ দেখল তার কাল রঙের খুব বড় বড় চোখ, পুরু ঠোঁট, উন্নত বুক যা বাঙালী কুমারী মেয়েদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খুব দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে যায়··· · মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার পরিচয় করানো হল। আমায় নমস্কারের সময় সে কপালে যখন হাত ঠেকাল, আমি দেখলাম তার নগ্ন বাহু। তার গায়ের রঙ অনুজ্জ্বল, বাদামী, মাটি আর মোমের যেন মিশ্রণ।

সে সময়ে আমার বাসস্থান ছিল ওয়েলেসলী স্ট্রীটের রিপণ ম্যানসনে। আমার পাশের ঘরে থাকতো 'হারোও কার'। হারোও ছিল 'আর্মী-নেভী' স্টোরের কর্মচারী। আমরা দুজনে ছিলাম ঘনিষ্ট বন্ধু। তার সঙ্গে কলকাতার অনেক পরিবারের পরিচয় ছিল। তার সঙ্গে আমি অনেক সন্ধ্যা এইসব

পরিবারদের বাড়ীতে কাটিয়েছি। সপ্তাহে একদিন আমরা যুবতী মেয়েদের নাচের আসরে আনতাম।

মৈত্রেয়ীর নগ্ন হাত আর তার অদ্ভুত কালচে বাদামী গায়ের রঙের কথা আমি হারোওকে জানাবো ভাবছিলাম। সত্যিই সেটা আমার কাছে বাস্তবিকই পুরুষালি এবং অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল। আসলে আমি এ বিষয়ে আমার ধারণটা একটু স্পষ্ট করতে চেয়েছিলাম।

হারোও তখন দাড়ি কামাচ্ছিল। দৃশ্যটা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। হারোওর পা দুটো তখন একটা ছোট টেবিলের ওপর তোলা। সামনে ছোট আয়না। চায়ের কাপ—হাল্কা বেগুনি রঙের নাইট গাউন যাতে জুতোর কালির দাগ। মনে আছে এর জন্য সে তার পরিচারককে মেরে রক্তাক্ত করেছিল। অথচ একদিন রাতে Y. M. C. A. তে নাচের পর মত্ত অবস্থায় সে নিজেই তা নোংরা করেছিল। আগোছাল বিছানার ওপর কয়েকটা খুচরো পয়সা পড়ে আছে। আর আমি তখন কাগজ পাকিয়ে সরু করে পাইপের মুখ পরিষ্কার করার বৃথা চেষ্টায় রত।

—না রে অ্যালেন, একটা বাঙালী মেয়েকে তোর ভাল লাগবে কি করে? ওরা খুব ছ্যাবলা। আমি তো এখানে জন্মেছি। আমি ঐসব মেয়েদের তোর চাইতে অনেক ভালভাবে জানি। বিশ্বাস কর, ওরা নোংরা, ওদের সম্বন্ধে আর কিছু ভাবা যায় না, ভালবাসা তো একেবারেই চলে না। ওই মেয়েটা তোকে কোনদিনই পাত্তা দেবে না।

আসলে হারোওই ভুল করেছিল। আমি সুন্দরভাবে এক বাঙালী যুবতীর বর্ণনা করেছি, তাই শুনেই সে ধরে নিয়েছিল যে, আমি তাকে ভালবাসতে চাইছি। হারোও, সব অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মতই বোকা আর গোঁড়া। কিন্তু ওর বাঙালী মেয়েদের নিয়ে রূঢ়, নির্বোধ সমালোচনা আমার মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। বসে থাকতে থাকতেই আমার অস্পষ্ট ধারণা হোল যে মৈত্রেয়ীর স্মৃতি ইতিমধ্যেই ক্ষণিকের জন্য হলেও আমার বাসনা কামনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এই আবিষ্কার আমায় একাধারে খুশী করলো আবার বিচলিতও করলো। যন্ত্রচালিতের মত পাইপ পরিষ্কার করতে করতে আমি আমার ঘরে চলে গেলাম।

এইসব কথা আমার ডায়েরিতে আমি কিন্তু কিছুই লিখিনি। শুধু আমার সেই সব প্রাথমিক ধারণাগুলো পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। অর্থাৎ যে রাত্রে আমি

জুঁই ফুলের মালা উপহার পেয়েছিলাম মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে।

তখন আমি ভারতে সবেমাত্র আমার চাকরী-জীবন শুরু করেছি। কুসংস্কারাছন্ন মন নিয়েই এসেছি এদেশে। রোটারী ক্লাবের মেম্বার, আমার জাতীয়তাবোধ, পাশ্চাত্যে আমার জন্মের অহংকার ইত্যাদি সবই ছিল। আমার সে সময়ে পাঠ্য ছিল পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞানের বই। যদিও ছেলেবেলায় মিশনারী হবার স্বপ্ন দেখতাম আমি। আর যত্নের সঙ্গে লিখতাম আমার প্রিয় ডায়েরি।

এদেশে আমি এসেছিলাম Noel & Noel কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে। এখানে টেকনিক্যাল ড্রাফটস্ম্যান হিসাবে বদ্বীপে খাল খননের কাজে যোগ দিয়েছিলাম। এখানেই পরিচয় হোল এডিনবার্গের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত প্রথম ইঞ্জিনীয়ার এবং কলকাতার অন্যতম গণ্যমান্য ব্যক্তি, মৈত্রেয়ীর বাবা নরেন্দ্র সেনের সঙ্গে। আমার জীবনের পরিবর্তনের সূত্রপাতও ঠিক সেখান থেকেই। আমার আয় অল্প হলেও আমার কাজে আমি আনন্দ পেতাম। ক্লাইভ স্ট্রীটের অফিসের মধ্যে ছোট্ট উনুনে রান্না করা, অসংখ্য কাগজে সই করা অথবা তার পাঠোদ্ধার করা, গ্রীষ্মের প্রতি সন্ধ্যায় স্নায়বিক অবসাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মাতাল হওয়ার রুটিন জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। দু-তিন সপ্তাহ অন্তরই বাইরের কাজে যেতে হোত। তমলুকের নির্মাণকার্যের প্রাথমিক দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত ছিল। প্রতিবারই অফিস ছেড়ে নির্মাণ ক্ষেত্রে এসে যখন দেখতাম বাঁধগুলো আরও উঁচু হয়ে উঠেছে, আমার মন আনন্দে ভরে যেত।

সে সময়টা সত্যিই সুখের সময় ছিল। ভোরবেলা হাওড়া-মাদ্রাজ এক্সপ্রেস ধরে প্রাতঃরাশের আগেই কাজের জায়গায় পেঁাছে যেতাম। স্টেশনটা ছিল যেন প্রতীক্ষারত বন্ধুর মত। আর ভারতে প্রথমশ্রেণীতে ভ্রমণ যথেষ্টই আরামদায়ক। মেরুণ রঙের হেলমেটটা প্রায় চোখের ওপর নামিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতাম, বগলে গোটা পাঁচেক ইলাস্ট্রেটেড ম্যাগাজিন, হাতে দু-প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট আর পেছনে আমার চাকর। তমলুকে থাকাকালীন আমি বড্ড বেশী সিগারেট খেতাম। এমনকি প্ল্যাটফর্মের সিগারেট স্টলগুলোর সামনে দিয়ে যাবার সময় কেবলই মনে হোত সিগারেট বোধ হয় যথেষ্ট কিনিনি। একদিনের বিশ্রী অভিজ্ঞতা আমার মনে ছিল। যেদিন আমাকে সিগারেটের অভাবে মজুরদের কাছ থেকে খৈনী খেয়ে কাঁপতে হয়েছিল। আমি কখনই কামরায় সহযাত্রীদের

সঙ্গে কথা বলতাম না। আর আমার সহযাত্রী বলতে যারা ছিল, তারা অক্সফোর্ডের মাঝারি ধরণের ছাত্র আর এখানকার 'বড় সাহেব' যাদের পকেটে সর্বদাই ডিটেকটিভ উপন্যাস থাকতো, আর নয়তো এমনসব বড়লোক ভারতীয় যারা প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণে অভ্যস্ত হলেও তখনও কোট পরতে আর দাঁত মাজতে শেখেনি। তার থেকে আপন মনে জানালার বাইরে বাংলার সমভূমির সৌন্দর্য উপভোগ করা ছিল অনেক আনন্দের।

একমাত্র সাদা চামড়ার মানুষ বলেই আমার কর্মস্থলের ওপর ছিল আমার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। কয়েকজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অবশ্য ছিল যারা ব্রীজের কাজই মূলত দেখা শোনা করত, কিন্তু তারা কখনই আমার সমমর্যাদা পেতনা। তারা ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতো এবং ওখানকার রীতি অনুযায়ী খাকী রঙের ছোট হাফ প্যাণ্ট আর বড় বড় পকেটওয়ালা খাকী রঙের হাফসার্ট পরে বিশুদ্ধ হিন্দীতে মজুরদের গালাগালি করত। অপর পক্ষে আমার হিন্দী উচ্চারণ ছিল অত্যন্ত নীচু স্তরের আর ভাষাটাও বেরুত অশুদ্ধ। কিন্তু তাতে কিছু এসে যেত না। শ্রমিকদের ওপর আমার প্রভাব ছিল অন্য কারণে। কারণটা হলো আমি বিদেশী সুতরাং আমি অভ্রান্ত এবং শ্রেষ্ঠ, এটাই ছিল অবধারিত। সন্ধ্যায় ওদের সঙ্গে বক্‌বক্‌ করে তাঁবুতে ফিরে লেখালেখির কাজ সেরে শেষ পাইপটা ধরিয়ে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করা এইই ছিল আমার প্রাত্যহিক কর্ম। সমুদ্রের কাছে তালগাছ আর উগ্র গন্ধ যুক্ত ঝোপঝাড়ওয়ালা এই সমতল জায়গাটায় সাপের উপদ্রব যথেষ্ট থাকলেও আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। হট্টগোল কোলাহল থেকে দূরে নির্জন, স্তব্ধ এই জায়গাটা আমার মনে এনে দিয়েছিল এক প্রশান্তি। নীল আকাশের নিচে এই সবুজ পরিত্যক্ত সমতল ভূমি যেন ভ্রমণকারীদের জন্যে বিষণ্ণ প্রতীক্ষায় থাকতো। তখনকার দিনগুলো যেন ছিল অবকাশ যাপনের সময়। কাজে ছিল আনন্দ। কর্তৃত্ব করার কেউ ছিল না। ডাইনে বাঁয়ে হুকুম চালাতাম। শুধু অভাব ছিল একজন বুদ্ধিমান সঙ্গীর। তেমন সঙ্গী যদি কেউ তখন থাকতো তাহলে হয়ত তাকে আমি অনেক বিস্ময়কর কিছু শোনাতে পারতাম।

ঘটনাচক্রে একদিন 'লুসিয়া মেজ'-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আমি রোদে পুড়ে ক্ষিদে তেষ্টায় কাতর হয়ে প্ল্যাটফর্মের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছি আর আমার চাকর গেছে ট্যাক্সি ডাকতে, আর এদিকে তখন সবে বম্বে এক্সপ্রেস এসে পৌঁছেছে। তার ফলে প্রচণ্ড ভীড়। এর মধ্যে দেখা লুসিয়ার সঙ্গে।

লুসিয়্যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ বছর দুয়েক আগে এডেন বন্দরে। জাহাজ কয়েক ঘণ্টার জন্য থেমে ছিল। আমি যাবো ভারতবর্ষের পথে আর লুসিয়্যাঁ ইজিপ্টে যাবার জন্য একটা ইটালিয়ান জাহাজের অপেক্ষায়। যদিও একটু বেশী মাত্রায় দাম্ভিক তবু তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন, প্রতিভাবান এই সাংবাদিককে আমার ভাল লেগেছিল। জাহাজে বসেই সে তখন একটা অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লিখছিল, দেশের মূল্যতালিকা আর সেই বন্দরের মূল্যতালিকার তুলনামূলক পর্যালোচনা করে। লুসিয়্যাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। একঘণ্টা মাত্র একটা মোটরে ঘুরে, যে কোনও একটা শহর সম্পর্কে সে নিখুঁত বিবরণ লিখতে পারতো। যে সময়ে তার সঙ্গে আমার আলাপ তখন তার একাধিকবার ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, জাপান ঘোরা হয়ে গেছে। যারা মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনা করতো তাদের সঙ্গে সে ছিল একমত। তবে মহাত্মাজী যা করেছিলেন তার জন্য নয় উনি যা করতে পারতেন কিন্তু করেননি, সেই ব্যাপারে তার বক্তব্য ছিল যুক্তিসঙ্গত।

কিছুমাত্র অবাক না হয়ে লুসিয়্যাঁ চিৎকার করে উঠলো 'হ্যালো অ্যালেন! সেই ভারতেই রয়ে গেছিস? লোকটাকে বলে দেতো, আমার ইংরাজী না বোঝার ভান করে আমাকে কোন হোটেলে না তুলে সোজা Y. M. C. A,-তেই যেন নিয়ে যায়। ভারতের পটভূমিতে একটা বই লিখছি। বইটা সাকসেসফুল হবেই। ডিটেকটিভ উপন্যাসে রাজনীতির মশলা। শোনাবো তোকে।'

আধুনিক ভারতের ওপর লুসিয়্যাঁর একটা বই লেখার ইচ্ছে অনেক দিনের। কয়েকমাস ধরে বিভিন্ন লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। জেলখানাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছে। অনেক ছবিও তুলেছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তার এ্যালবাম দেখলাম। ভারতীয় নারীদের ব্যাপারটাই তাকে কিছুটা অসুবিধায় ফেলেছে তাও বুঝলাম। এ ব্যাপারে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। পর্দার অন্তরালে যাদের জীবন যাত্রা চলেছে তাদের সম্পর্কে লুসিয়্যাঁর ধারণা ছিল স্বাভাবিকভাবেই খুব অস্পষ্ট। তাদের নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে তার কিছুই জানা ছিলনা। বিশেষতঃ সে খুবই কৌতুহলী ছিল শিশু বিবাহ সম্পর্কে। অনেক বার সে আমাকে প্রশ্ন করেছে যে এদেশে আট বছরের মেয়েরও বিয়ে দেওয়া হয় কিনা। অস্বীকার করতে পারিনি, কারণ এ ঘটনার উল্লেখ আমি এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বইতে পড়েওছি, যিনি এখানে প্রায় তিরিশ বছর ধরে

ম্যাজিস্ট্রেটের মত দায়িত্বশীল পদে আসীন ছিলেন।

এসব ব্যাপার আলোচনা করতে করতে ফয়াবে বসে একটা সুন্দর সন্ধ্যা কাটল। কিন্তু তাকে এ সমস্ত বিষয়ে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কোন ধারণা বা জ্ঞান আমি দিতে পারলাম না। আমি নিজেও এদেশের নারীদের চিনতাম না। কদাচিৎ তাদের সিনেমা হলে অথবা সভা সমিতিতে দেখেছি। ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি এল, যদি নরেন্দ্র সেনকে অনুরোধ করি আমার বন্ধুকে চায়ের নিমন্ত্রণ করতে, তাহলে হয়ত তখন লুসিয়া তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পেলেও পেতে পারে। আর সেই সুবাদে আমিও মৈত্রেয়ীকে হয়ত কাছ থেকে দেখার একটা সুযোগ পেতে পারি। সেই অক্সফোর্ডের দোকানের সামনে প্রথম দেখা হয়েছিল, তার পরে তাকে আর আমি দেখিনি। মিঃ সেনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল আন্তরিকতার, যদিও তা সীমাবদ্ধ ছিল অফিসের কাজকর্ম এবং গাড়ীতে একসঙ্গে যাতায়াতের সময় কথাবার্ত্তার মধ্যে। অবশ্য এর মধ্যে দুবার তিনি আমায় চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন কিন্তু তখন আমার অবসর সময়ের পদার্থ বিদ্যা, গণিত বিদ্যার আকর্ষণ কাটিয়ে ওনার বাড়ী যেতে পারিনি। মিঃ সেনকে জানালাম লুসিয়া ভারতের ওপর একটা বই লিখছে যেটা প্যারিস থেকে প্রকাশিত হবে এবং এব্যাপারেই সে ওনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চায়। মিঃ সেন সানন্দে রাজী হলেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় আমাদের নিমন্ত্রণ জানালেন। আনন্দের সঙ্গে লুসিয়াকে খবরটা জানালাম। আর লুসিয়া কোন দিনই কোন সম্ভ্রান্ত ভারতীয়ের বাড়ীতে ঢোকেনি, তাই সে নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করলো একটা নিখুঁত বিবরণ নেওয়ার জন্য। লুসিয়া প্রশ্ন করল—মিঃ সেনের কি জাত ?

—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য তবে যতটা সম্ভব কম গোঁড়া। রোটারি ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য, ক্যালকাটা ক্লাবের সভ্য, চমৎকার টেনিস প্লেয়ার এবং নিজের গাড়ী অধিকাংশ সময় নিজেই চালিয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ হলেও মাছ মাংস খান ; বাড়ীতে অতিথি এলে এমন কি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হলেও স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। আমি নিশ্চিত মিঃ সেন কে তোর ভাল লাগবেই।

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করা উচিৎ যে আলিপুরের তাঁর বাড়ী আমি প্ল্যান নিতে যাওয়ার সময় গাড়ী থেকে দেখলেও, বাড়ীর অভ্যন্তরে যে জিনিস পত্র আমি দেখলাম তা আমাকে লুসিয়ার চেয়ে কম বিস্মিত করেনি। দরজায় স্বচ্ছ পর্দা, নরম কার্পেটে ঢাকা মেঝে ; কাশ্মিরী উলের কাপড় দিয়ে

ঢাকা সোফা। সোফার পাশে ছোট ছোট এক পায়া ওয়ালা টেবিল। টেবিলে চায়ের কাপ আর পিঠে জাতীয় খাবার রাখা। মিঃ সেন নিজেই খাবার পছন্দ করেছেন যাতে তাঁর অতিথিকে ভালভাবে স্থানীয় খাদ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে পারেন।

আমি অবাক হয়ে ঘরটা দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র ইওরোপ থেকে ভারতের মাটিতে পা দিলাম। দুটো বছর এদেশে কাটালেও আমার কখনও ইচ্ছা হয়নি একটা বাঙালী পরিবারের অন্দর মহলের জীবনটা জানতে, এমন কি আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা ছাড়া তাদের শিল্পকর্মগুলো সম্পর্কেও বুঝতে বা তাদের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে। এ যাবৎ ঔপনিবেশিক প্রভুর জীবনই যাপন করেছি অফিসে বা কোম্পানীর নির্মাণ ক্ষেত্রে। কাজ নিয়ে ব্যস্ততা, অবসরে বই পড়া অথবা সেই সব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে সময় কাটানো যা আমার নিজের দেশেও এমন কিছু দুর্লভ বস্তু ছিল না। সে দিন বিকেলেই আমার মনে এই সব প্রশ্ন ভীড় করে এলো। লুসিয়্যা অত্যন্ত উৎসাহভরে কোন কোন ব্যাপারে আমার মতামত চেয়ে নিজের অনুভূতি, পর্যবেক্ষণ মিলিয়ে নিচ্ছিল। মিঃ সেনের কথাবার্তা সে সঠিক বুঝতে পেরেছে কিনা যাচাই করছিল। আমি ক্রমশঃ চিন্তার ভীড়ে ডুবে যাচ্ছিলাম। সে সময়ের ডায়েরিতেও কিছু লিখিনি, তাই আজ বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারছিনা, সেদিনবিকেল-সন্ধ্যায় মৈত্রেয়ী আমার মনে কি ধরণের ছাপ ফেলেছিল। আজ খুবই অবাক লাগে সে দিন আমি কি করে এতটুকু সক্ষম হইনি সেই সব মানুষদের সম্পর্কে এতটুকু ধারণা করতে যারা তার অল্প কিছুকাল পরেই আমার জীবনধারা পাল্টে দেবে সম্পূর্ণভাবে।

ফিকে চা রঙের স্বচ্ছ শাড়ী, রুপোলী জরির কাজ করা চটি, গায়ে চেরী রঙের শালে তাকে যথেষ্ট সুন্দরী মনে হচ্ছিল। তার কুঞ্চিত কালো কেশ, গভীর কালো চোখ, অতি লাল ঠোঁট, যৌবনে উদ্বেলিত শরীর মনে হচ্ছিল স্বল্প বাস্তব। কৌতুহলী চোখ মেলে আমি তাকে দেখছিলাম। রেশমের মত লঘু তার অঙ্গ সঞ্চালন, লজ্জাজড়িত, ভয় মিশ্রিত মৃদু হাসি, নতুন নতুনধ্বনিতে বেজে ওঠা কণ্ঠস্বর, সব কিছু দেখে শুনে মনে হচ্ছিল এই সৃষ্টির মধ্যে কত যে রহস্য লুকিয়ে আছে! মৈত্রেয়ীর ইংরাজী ছিল বিশুদ্ধ কিন্তু স্কুল ঘেঁসা। কিন্তু যতবারই সে মুখ খুলছিল আমি আর লুসিয়্যা তার দিকে না তাকিয়ে পারছিলাম না।

চায়ের স্বাদ ছিল আশাতীতভাবে উপাদেয়। প্রত্যেকটা খাবার চেখে চেখে

লুসিয়্যা সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করে জ্ঞাতব্য তথ্য টুকে নিচ্ছিল। প্রশ্ন করছিল অশুদ্ধ ইংরাজীতে। মিঃ সেন অবশ্য বলেছিলেন যে তিনি ফরাসী বোঝেন, তাঁকে দুবার প্যারিসে কনফারেন্সে যোগদান করতে হয়েছে এবং তাঁর লাইব্রেরীতে কিছু ফরাসী উপন্যাসও আছে। লুসিয়্যা তাঁকে অত্যন্ত চলতি ফরাসীতে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেছিল। আর মিঃ সেন তার উত্তরে মৃদু হেসে 'তা বটে, তা বটে' গোছের উত্তর দিচ্ছিলেন আর আমাদের দিকে পরম সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন।

লুসিয়্যা, মৈত্রেয়ীর পোশাক আর অলংকার কাছ থেকে দেখতে চাইলো। মিঃ সেন সানন্দে রাজী হলেন কিন্তু মৈত্রেয়ী ভয় পেয়ে জানালার দিকে সরে গেল। ভয়ে তার ঠোঁটটা তখন কাঁপছিল। লুসিয়্যা অলংকারগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করে গভীর বিস্ময় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য প্রশ্নও করে চলেছিল আর উত্তরগুলো টুকে নিচ্ছিল। মৈত্রেয়ীর পা থেকে মাথা অবধি কাঁপছিল আর কোন্ দিকে যে সে তখন দৃষ্টি রাখবে তা বুঝতে পারছিল না। এক সময় তার চোখ আমার চোখের ওপর পড়লো। তার চোখে চোখ রেখে আমি মৃদু হেসে আশ্বস্ত করলাম। সে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ক্রমশঃ শান্ত হয়ে এল। মনে হোল যেন সে খুঁজে পেয়েছে তার বিশ্রামের বন্দর। কতক্ষণ সে তাকিয়ে ছিল বলতে পারবো না কিন্তু এটুকু বলতে পারি এ যাবৎ বিনিময় করা দৃষ্টির সঙ্গে এর কোন মিল ছিল না। লুসিয়্যার দেখা শেষ হোল। মৈত্রেয়ী তার জায়গায় ফিরে গেল কিন্তু পরস্পরের প্রতি তাকানো আমরা এড়িয়ে গেলাম। সেই মুহূর্ত হয়ে রইল অতি-গোপন আর উষ্ণ এক অভিজ্ঞতা।

মৈত্রেয়ীর দিকে দৃষ্টি এড়াতে আমি তার বাবার দিকে মনোযোগ দিলাম। তাঁকে বড্ড অসুন্দর আর ভাবলেশহীন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। কাছ থেকে তাঁকে আমি পর্যবেক্ষণ করলাম। প্রকাণ্ড একটা মুখে বড় বড় চোখ, কালো মাথাটা যেন একটা হাঁড়ির মত। নীচু কপাল, কালো কয়লার মত কোঁকড়ান চুল, ঝোলা কাঁধ, বেঢপ পেট, বেঁটে বেঁটে পা এই সব দেখে আমার একটা কোলা ব্যাঙের কথা মনে পড়ল। এই মানুষটার ভেতরেও যে স্নেহ, সহানুভূতির প্রাচুর্য আছে তা বোঝাই দুষ্কর ছিল। তবুও মানুষটাকে আমার সম্মোহক, বুদ্ধিমান, দক্ষ কর্মী, খোসমেজাজী, শান্ত আর সৎ মনে হোল।

এরকম সময় তাঁর স্ত্রী মিসেস সেন এলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হোল।

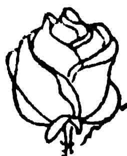
কিন্তু কেন জানিনা আমার মনে হোল মিসেস সেন যেন এক উষ্ণ ভয়ের আবহাওয়া নিয়ে এলেন। তাঁর পরনে ছিল নীল রঙের শাড়ী আর গায়ে ছিল সোনালী কাজ করা নীল শাল। তাঁর পায়ে কোন জুতো ছিলনা। পায়ের পাতা আর আঙুল ছিল আলতা-রঞ্জিত। তিনি ইংরাজী প্রায় জানতেন না আর বোধ হয় তাই কথার বদলে মৃদু হেসে প্রত্যুত্তর দিচ্ছিলেন। সেদিন বোধ হয় তিনি খুব পান খেয়ে ছিলেন তাই তাঁর ঠোঁট ছিল রক্তিম। এত কম বয়সী আর সজীব লাগছিল যে তাঁকে অনায়াসে মৈত্রেয়ীর মা না বলে বড় বোন হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যেত। তাঁর মেজ মেয়ে ছবি সেই সময় ঘরে এল। তার বয়স আন্দাজ দশ-এগার হবে। চুল ছোট করে ছাঁটা, ইওরোপীয়ান পোষাক গায়ে। কিন্তু পায়ে কোন জুতো ছিলনা।

তার নগ্ন পা, বাহু, সুন্দর কালচে মুখ, আমাদের দেশের বোহেমিয়ান মেয়েদের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল।

তারপরে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। ঘরের মধ্যে তিনটি মহিলা প্রায় গা ঘেঁসা ঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে, সবার মুখেই ভয়ার্তভাব আর মিঃ সেন তাদের স্বাভাবিক হতে আর কথা বলাবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। মিসেস সেন চা পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। হঠাৎই মত পাল্টে তিনি বড় মেয়েকে বললেন আমাদের চা দিতে। জানিনা কার দোষে ঘটল অঘটন। চায়ের পট উল্টে গিয়ে পড়ল লুসিয়্যার প্যান্টের ওপর। চায়ে ভিজে গেল তার প্যান্ট। তাকে সাহায্যের জন্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো। মিঃ সেন তাঁর শান্ত ভাব হারিয়ে চিৎকার করে বাংলায় সবাইকে প্রচণ্ড বকাবকি করতে শুরু করলেন। লুসিয়্যা ফরাসীতে সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা চালাতে লাগল। কিন্তু কে তার ভাষা বুঝছে বা কথা শুনছে। মিঃ সেন অশুদ্ধ ফরাসীতে লুসিয়্যার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে অন্য জায়গায় বসতে অনুরোধ করলেন। সোফার রেশমের ঢাকাটা বদলাবার জন্য মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মিঃ সেন ক্রমাগত তাদের বকেই যেতে লাগলেন। পক্ষান্তরে আমার আর লুসিয়্যার অবস্থা হোল শোচনীয়। সে মুহূর্তে আমাদের যে কি করণীয় আমরা বুঝতে পারছিলাম না। যদিও ফেরবার পথে লুসিয়্যা ঘটনাটা নিয়ে দারুণ হাসাহাসি করছিল কিন্তু তখন তার মুখ দেখবার মত হয়েছিল। সে সময়ে একমাত্র মিসেস সেনকেই দেখেছিলাম অচঞ্চল।

কথাবার্তা বেশীক্ষণ হয়নি। মিঃ সেন লুসিয়াকে তাঁর কাকার কথা বললেন। কাকা ছিলেন সংস্কৃতে পণ্ডিত। সরকারি স্বীকৃতিও তাঁর ছিল। কাকার সংগ্রহের প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি দেখালেন। আমরা ওনাদের পারিবারিক ছবির অ্যালবাম দেখলাম। পরে ওনার সংগ্রহের প্রাচীন কিছু শিল্প নিদর্শনও উনি দেখালেন। জানালার বাইরে বাড়ীর উঠোনটা দেখা যাচ্ছিল। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, ছোট ছোট পাতা বাহারি গাছ, লতানে গাছের ফুল। আরেক দিকে একটা তাল গাছ মাথা তুলে তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছিল। হাওয়ায় তার পাতা কম্পমান। এতদিন কলকাতায় আছি কিন্তু এই নিস্তব্ধ অন্দর মহলের অভ্যন্তরে কোথা দিয়ে যেন এক আনন্দ স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তা আমার সম্পূর্ণ অজানা ছিল। হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভেঙে ভেসে এল এক সম্মিলিত হাসির রোল। মহিলা-শিশু কণ্ঠের সেই হাসির আওয়াজ সরাসরি আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেল। শিহরণ এল শরীরে, মনে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্রায় বিবস্ত্র মৈত্রেয়ী উপুড় হয়ে পড়লো সিঁড়ির ধাপে। চুলগুলো মুখের ওপর, হাত দুটো বুকের কাছে। হাসির দমকে তার শরীর কাঁপছে। হাসতে হাসতে সে গোড়ালির এক ঝটকায় পায়ের চটি ছুড়ে ফেলে দিচ্ছিল সামনের দেওয়ালের দিকে। তাকে ওই অবস্থায় দেখে আমার আশ যেন মিটছিলনা। মনে হচ্ছিল সেই কয়েক মিনিট সময় অনন্তে পর্যবসিত হোক। তার হাসি, শৃঙ্খলমুক্ত দেহের বন্য আগুন এসব দেখা উচিত ছিল কিনা আমি জানিনা তবে সে জায়গা ছেড়ে যাবার শক্তিও যেন আমার ছিল না।

অনেক ঘর পার হয়েও সদর দরজা অবধি তার উদ্দাম হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।



তখন আমি অলুকে থাকতাম।

এর দুদিন আগে তখন জরিপের কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। ফলতঃ যা হয়, সারা রাত ধরে হৈ হল্লা চলেছে। নাচ, গান তৎসহ অফুরন্ত মদ। মেয়েরাও ছিল। তার পর অন্ধকার থাকতে থাকতেই লেকে বেড়াতে যাওয়া। গত মার্চ মাসের ঘটনাটা মনে পড়ল। এডি হিগারিং-এর সঙ্গে আমার তর্ক, তর্ক থেকে ঘুঁসোঘুঁসি অবধি তা গড়িয়েছিল। নরিনের সঙ্গে প্রেম পর্বও সে সময়কারই ঘটনা। উঠ্তি যৌবনের প্রেমের যে রকম গভীরতা হয়। যখন ইচ্ছে জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া এই অবধিই।

নদীর ধারে, এক হাতে পাইপ অপর হাতে ছড়ি নিয়ে ধীর পায়ে বেড়াচ্ছিলাম। সূর্য তখনও আকাশে আগুন ছড়ায়নি। বাতাসে ধুনো আর দারচিনির মিষ্টি গন্ধ; বড় বড় কাঠগোলাপ গাছের তলায় পাখীদের কিচির মিচির। বিস্তৃর্ণ তটভূমিতে কেউ কোথাও নেই। আমি একা। এই একাকীত্বই কি শাশ্বত! একাই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সে চিন্তা কিন্তু আমার মনে বিষাদ এনে দেয়নি। সেই সমতলভূমিরই মত আমার মন ছিল শান্ত। সে সময় আমায় কেউ যদি বলতো যে আমার আয়ু আর মাত্র এক ঘণ্টা, তাহলে আমি তখনই ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তাম মাথার তলায় হাত দুটো রেখে। মাথার ওপরে অনন্ত নীল সমুদ্রের দিকে অপলকে চেয়ে থাকতাম। উপভোগ করতাম প্রত্যেকটা মুহূর্ত।

জানিনা কোন্ বোধ আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। মনে হচ্ছিল আমি সব কিছুই করতে পারি। আমি সর্বশক্তিমান অথচ আমি সব কামনা থেকেই বিযুক্ত একটা অস্তিত্ব। সেই বিস্ময়কর জগতে আমার একাকীত্বের ক্ষুধা আমাকে একেবারে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল। ভাবছিলাম হারোও, নরিন ইত্যাদি মানুষদের কথা। কি করে এরা আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো! ওদের মতো গতানুগতিক আর প্রাণহীন জীবন তো আমার জীবন নয়

একাকীত্ব আর শান্তির তৃষ্ণা নিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে এলাম। ভাবতে ভাল লাগছিল যে আরও এক সপ্তাহ এই তাঁবুতেই থাকতে পারব; ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্ দেখতে হবেনা, পত্র পত্রিকার খবর আমার শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে এসে হাজির হবেনা। এমন সময়, আমার বেয়ারা এসে দেখা করলো, হাতে কলকাতা থেকে

আসা একটা টেলিগ্রাম। অফিসের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু নির্দেশ আন্দাজ করেই ওটা সঙ্গে সঙ্গে খোলার প্রয়োজন বোধ করিনি। কিছুক্ষণ বাদে অবসর পেয়ে যখন ওটা খুললাম এবং পড়লাম, তখন কিছুক্ষণের জন্যে আমার মাথা ফাঁকা হয়ে গেল. টেলিগ্রামের বক্তব্য ছিল, নরেন্দ্র সেন টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্র আমায় কলকাতা ফেরার নির্দেশ দিয়েছেন।

বাধ্য হয়ে সেই দিনই বিকেলের গাড়ীতে রওনা হতে হল। জানালা দিয়ে সরে যেতে লাগল দৃশ্যাবলী। আমার প্রিয় দৃশ্যাবলী—কুয়াশাচ্ছন্ন সমতল-ভূমিতে তখন পড়েছে শ্রেণীবদ্ধ তালগাছের নিভৃত স্বল্প ছায়া। মন ভারী হয়ে উঠছিল। সকালের কথা মনে পড়ছিল বার বার। এই প্রকৃতি, যে আমাকে আজই সাদর উষ্ণ আমন্ত্রণ করেছিল উদ্দেশ্যহীনতার উদ্দেশ্য। ভীষণ ইচ্ছে করছিল আবার ফিরে যাই কেরোসিনের আলোয় আলোকিত আমার সেই তাঁবুতে। আরো ইচ্ছে করছিল কান পেতে লক্ষ লক্ষ ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর লক্ষ লক্ষ পঙ্গপালের ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে।

দেখা হওয়ার পর মিঃ সেন বললেন—অ্যালেন, তোমার জন্য একটা ভাল খবর আছে। লামডিং—সাদিয়া রেল লাইন বসানোর কাজ চলছে। পাহাড়ী জমি ; কালভার্ট তৈরি, সঠিক বেনডিং এসব ব্যাপার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন দক্ষ লোকের প্রয়োজন। আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে আমি কাউন্সিলের কাছে তোমার নাম সুপারিশ করেছিলাম এবং সুখবর হচ্ছে এই যে তা গৃহীত হয়েছে। তোমার এখন কাজ হচ্ছে, পরবর্তী লোককে তোমার কাজ-কর্ম বুঝিয়ে দেওয়া আর তার মানে হচ্ছে এই যে তোমার জিনিস-পত্র গোছগাছ করার জন্য তুমি হাতে মাত্র তিন দিন সময় পাচ্ছ।

মিঃ সেনের মুখ স্নেহে উজ্জ্বল ছিল। আমি মহা অস্বস্তিতে পড়ছিলাম। পরে জেনেছিলাম, যে কোম্পানীর কাজে আমাকে যেতে হচ্ছিল তারা ছিল স্বরাজ্য পার্টির সমর্থক। তারা চেয়েছিল কোন ভারতীয়ই ওই পদের দায়িত্বে থাকুক। আর শ্বেতকায় হিসেবে আমায় সমর্থন করায় মিঃ সেনকে নাকি কাউ-ন্সিলে জোর লড়াই-এর মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

আমার নতুন পদটা ছিল আমার আগের পদের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং মাইনেও ছিল অনেক বেশী। ২৫০ টাকার বদলে এখন আমার মাইনে হল ৪00 টাকা যা Noel & Noel কোম্পানীর একজন প্রতিনিধির মাইনের চেয়েও বেশী। যদিও আমায় কাজ করতে হবে আসামের অস্বাস্থ্যকর অনুন্নত

এলাকায় তবু আমার প্রকৃতি প্রেমই শেষ পর্যন্ত জয়ী হোল। ভারতে এসেছিলাম যে-প্রকৃতির টানে তা বোধ হয় পূর্ণ হতে চলেছে, এই ভেবে আমি মিঃ সেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। মিঃ সেন আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—অ্যালেন আমি, আমার স্ত্রী, আমরা সবাই তোমাকে খুব ভালবাসি। তোমার কথা নিয়ে প্রায়ই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। তুমি বাংলা জানলে দারুণ ভাল হোত।

সেই সময় এসব বিষয়ে খুব একটা ভেবে দেখিনি। তবে নিজের কাছে একটা প্রশ্ন ছিলই, মিঃ সেন তার অসংখ্য পরিচিত ভারতীয়দের ছেড়ে আমার প্রতি এতটা পক্ষপাতিত্ব কেন করছেন? মনে মনে একটা উত্তরও খাড়া করে নিয়েছিলাম যে, হয়ত আমার গঠন মূলক মেজাজ, কর্মশক্তি, উদ্যম এবং সর্বোপরি একজন বিদেশী হিসাবে ভারতবর্ষের উন্নতিতে আমার শ্রম এবং সময় নিয়োগের ব্যাপারগুলোই ওনাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

যাইহোক, যথাসময়ে হ্যারোও খবরটা পেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমার পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি উপলক্ষে একটা পার্টির দাবী জানাল। স্বাভাবিকভাবেই কিছু যুবতীকেও রাখতে হল। দুটো গাড়ীতে ঠাসা ঠাসি করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। হৈ চৈ আর হাসি-ঠাট্টা করতে করতে আমাদের দল সশব্দে নিজেদের অস্তিত্ব খুব বেশী করে জানান দিতে দিতে ক্রমশঃ পার্ক স্ট্রীট থেকে চৌরঙ্গী রোডে এসে পড়ল। চৌরঙ্গী রোডে এসেই গাড়ী দুটো দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো। অবশ্য দোষ আমাদেরই। উভয় গাড়ীর যাত্রীরাই নিজেদের ড্রাইভারদের উত্তেজিত করছিল। আমি যে গাড়ীটায় ছিলাম তার ড্রাইভার আবার ফরাসী ভাষা জানে। যুদ্ধের সময় সে কিছু দিন ফ্রান্সে ছিল। আমার কোলের ওপর বসে ছিল গায়তি। গাড়ীর উন্মত্ত গতিতে গায়তি ভয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে বার বার বলছিল যে "পড়ে যাবো, পড়ে যাবো। আমি পড়ে যাবো। তোমার কিছু যায় আসেনা না আমি পড়লে?"

ধর্ম্মতলার মোড়ে এসে আমাদের গাড়ী থামতে বাধ্য হল কারণ একটি ট্রাম তখন রাস্তা জুড়ে চলেছে। অপর গাড়ীটা ট্রামটার আগেই বেরিয়ে গেছে। আর ঠিক সেই সময়েই অঘটনটি ঘটলো। মিঃ সেনের গাড়ী একেবারে আমাদের পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। নরেন্দ্র সেন তাঁর স্ত্রী এবং মৈত্রেয়ী সেই গাড়ীতে। খানিকটা ভয়, লজ্জা আর অস্বস্তিতে আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। আমি কোন রকমে তাঁকে নমস্কার জানালাম। মিঃ সেন প্রত্যুত্তরে ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে

মৃদু হাসলেন। মিসেস সেন যদিও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন কিন্তু তাঁর চোখে মুখে আতঙ্ক আর বিস্ময় যথেষ্ট প্রতীয়মান ছিল। একমাত্র মৈত্রেয়ীই মাথায় হাত ঠেকিয়ে আমায় নমস্কার জানালো। মনে হোল ও বেশ উপভোগ করছে ব্যাপারটা; আমার চার পাশের সঙ্গী সাথী আর কোলের ওপর বসা মেয়েটিকে দেখে। ওকে ভারতীয় কায়দায় প্রত্যাভিবাদন জানাবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু আমার হাস্যকর অবস্থার কথা বিবেচনা করে বিরত হলাম। যতক্ষণ না আমাদের গাড়ী পুনরায় যাত্রা শুরু করলো ততক্ষণ যে আমার কি অস্বস্তিতে কাটলো কি বলবো! ঘাড় উঁচু করে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম মৈত্রেয়ীর হালকা চা পাতা রঙের শাল বাতাসে উড়ছে।

একজন 'কালা আদমী' কে আমি শ্রদ্ধা জানালাম দেখে আমার প্রতি অন্যদের টিটকিরির বন্যা বয়ে গেল। একটা দুষ্টুমির খোঁচা মেরে গারতি বললো, "কাল থেকে হয়তো দেখবো অ্যালেন ভোর বেলা উঠে গঙ্গা-স্নান করছে।" হারোও জানতে চাইলো কি করে আমি একটা 'নিগ্রো' পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলছি!

কিন্তু আমাদের ড্রাইভারটা গোড়া থেকে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। এই ঘটনায় তার প্রচণ্ড আনন্দ হয়েছিল। হোটেলের সামনে যখন তার ভাড়া মেটাচ্ছিলাম সে ফরাসীতে আমায় বললো, "ভীষণ ভাল লাগল সাহেব। বাঙালী মেয়েটা আপনারই হবে। বহুৎ আচ্ছা।"

পরদিন সকালে নরেন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমায় খুবই স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কাল সঙ্গে কারা ছিল?

—আমার কয়েকজন বন্ধু স্যার।

—আর সুন্দরী মহিলাটি? তুমি কি ওকে ভালবাস?

—মিঃ সেন, ওই মেয়েরা ভালবাসার পক্ষে খুব সস্তা। আমার চাকরী উপলক্ষে আমি বন্ধুদের একটা 'পার্টি' দেবো বলেছিলাম। আমরা অনেক জন ছিলাম, তিনটে গাড়ী-ভাড়া করতে অনেক খরচা বেড়ে যেত তাই দুটো গাড়ীতেই আমরা ঠাসা ঠাসি করে…। স্যার কোন খারাপ উদ্দেশ্যে…বা…।

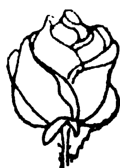
কথাবার্তায় আমার অতিরিক্ত সাবধানতা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন—অ্যালেন তোমার সামনে কিন্তু অন্য রাস্তা খোলা আছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মেসে থাকার ফলে তোমার রুচি এবং কৌলীন্য দুই-ই ক্ষুন্ন হচ্ছে। এই জীবন খুব মর্যাদার নয়। আর একটা

কথা, এই ভাবে, এদের সংগে জীবন কাটালে তুমি কিন্তু কোন দিনই ভারতকে ভালবাসতে পারবে না।

আমার ব্যক্তিগত জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে মিঃ সেনের আগ্রহ দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। তিনি যে এসব নিয়েও ভাবেন তা আমি কখনও বুঝিনি। এ যাবৎ তিনি আমার কাছে যা জানতে চেয়েছেন, অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছেন তা, আমি এখানকার খাদ্যে অভ্যস্থ হতে পারছি কি না, ভাল চাকর পেয়েছি কি না, এখানকার এত গরম বা শব্দে আমার কষ্ট হচ্ছে কি না অথবা আমি টেনিস কেমন খেলতে পারি ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

যাইহোক, আবার কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হোল। এক গাদা কাগজ পত্রে সই বাকী ছিল। যাবার আগে মিঃ সেন আমাকে রোটারী ক্লাবে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি নানা অজুহাতে নিমন্ত্রণ এড়ানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি কোন কথা শুনলেন না। নির্ধারিত দিনে, ক্লাবের একটা বিশেষ ঘরে আরও কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে মিঃ সেন আমার পরিচয় দিতে গিয়ে যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন তাতে আমার যথেষ্ট আনন্দ আর গর্ব হচ্ছিল।

সেই রাত্রেই আমি শিলং যাত্রা করলাম। স্টেশনে একমাত্র হারোওই ছিল আমাকে বিদায় জানাতে। সে আমাকে শেষ বারের মত সাপ, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া আর পেটের অসুখের হাত থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বিশেষজ্ঞের মতামত পুনরাবৃত্তি করল, 'জল খাবিনা, শুধু সোডা দিয়ে ব্র্যাণ্ডি বা হুইস্কি খাবি।' হারোও শুভযাত্রা কামনা করলো। আমি কলকাতা ছেড়ে চললাম।



আমি অনেকক্ষণ ধরে ডায়েরির পাতা ওল্টালাম। আমার আসামে থাকার দিনগুলোয় যা লিখেছিলাম আবার পড়লাম। দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গুলোকে পরম্পরানুযায়ী সাজিয়ে নিয়ে পরবর্তীকালে আমার পরিবর্তিত জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরিবেশনের জন্য এটা জরুরী ছিল।

কাজে যোগ দিয়েছিলাম অত্যন্ত উৎসাহ আর কৌতুহলী মন নিয়ে। আমি ছিলাম বাস্তবিকই বোধ হয় প্রথম পথপ্রদর্শক। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রেলপথ নির্মাণের কাজ আমার মনে হচ্ছিল, ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা বই লেখার চেয়ে অনেক জরুরী আর প্রয়োজনীয়। কিন্তু এটাও ঠিক, ওই অতি প্রাচীন, প্রায় সভ্যতার প্রথম যুগের অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের আধুনিক যন্ত্রপাতির সংঘাত মিলনের ঘটনা যে কোন ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু হতে পারত অনায়াসে। আমার কাজের মধ্যে দিয়ে আমি যে ভারতবর্ষকে চিনছিলাম তার সঙ্গে তখনও অবধি পড়া ভারতবর্ষের ওপর লেখা উপন্যাস বা খবরের কাগজের রিপোর্টের কোন মিল ছিল না। বিষাক্ত গাছপালা, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, মাথার যন্ত্রণার উদ্রেককারী তাপপ্রবাহ ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে আমি বাস করতাম যে আদিবাসীদের সঙ্গে তারা অনায়াসেই নৃতত্ত্ববিদদের বিষয়বস্তু হতে পারত। ঐ ফার্ণ লতাগুল্মে আচ্ছন্ন জায়গায় যারা থাকতো তারা ছিল একাধারে সরল এবং নিষ্ঠুর। চেষ্টা করতে কসুর করিনি ওদের মধ্যে সভ্যতার প্রাণ সঞ্চার করতে।

ওদের নীতিবোধ, শিল্পবোধ বোঝার চেষ্টা করলাম। সংগ্রহ করতে শুরু করলাম ওদের লোকগাথা, বংশ পরিচয়ের ইতিহাস। ছবিও তুললাম অসংখ্য। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার যতই আমি ওই প্রায় অসভ্য মানুষদের ভেতরে প্রবেশ করছিলাম ততই আমার মর্যাদাবোধ, অহংকার প্রখর হচ্ছিল। এতদিন এগুলো কোথায় ছিল? এমনকি আমার মনে এরকম কিছু থাকতে পারে বলেও আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু ওই জঙ্গলে সত্যি সত্যিই আমি ছিলাম সৎ আর অনেক বেশী সক্ষম আমার রিপু দমন করায়।

কিন্তু বৃষ্টি! রাতের পর রাত অনিদ্রার শিকার হয়ে আমি শুনতাম ছাদের ওপর বৃষ্টির অবিরাম ছন্দ। অবিস্মরণীয় সেই শব্দ। মুষলধারে সেই বৃষ্টি দিনের পর দিন চলতো। ছেদ পড়তো হয়ত মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। কিন্তু তখনও একটা কুয়াশার মত পরিবেশে ঝির ঝির করে তার রেশ চলতো। সেই

সূক্ষ্ম বৃষ্টির কণাগুলো ছিল বরফের মতো ঠাণ্ডা কনকনে, তার মধ্যে দিয়ে যখন আমি হেঁটে যেতাম অদ্ভুত এক তীব্র বুনো সৌগন্ধ মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে দিত :

বিকেলে হয় আমার বাংলোর বারান্দায় পায়চারি করতাম, নয়তো শুকনো, সজীব আমার শোবার ঘরে বসে স্যাঁত স্যাঁতে তামাক পাইপে পুরে ধূমপানের চেষ্টা করতাম।

মাঝে মাঝে এই জীবন অসহ্য মনে হোত। এক তীব্র অস্থিরতা শরীর মন জুড়ে বিদ্রোহ জানাত। ছটফট করতাম, ঘুঁসি পাকিয়ে বারান্দার থামে আঘাত করতাম। চিৎকার করে উঠতাম ; বৃষ্টির মধ্যেই নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়তাম কোন এক অজানা দেশের সন্ধানে, যেখানে আকাশ অনন্তকাল ধরে মুষলধারে বৃষ্টিপাত করে না, ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে উঁচু ঘাসের জঙ্গল নেই। ভীষণ মনে পড়তো অমলুকের কথা। সেই সমতল ভূমি, লবণাক্ত বাতাসের ঝাপটা, মরুভূমির মতো শুষ্ক বাতাস। এখানকার পরিবেশ, জঞ্জাল পচা গন্ধ আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল।

বাংলোয় আমি ছাড়া আর থাকত আমার তিনজন চাকর আর বাংলোর মালিক। কদাচিৎ কোন বিদেশী আসতো ; পাট চাষের পর্যবেক্ষক, মহকুমার কোন ইংরেজ সরকারী কর্মচারী অথবা চীন যাত্রী কোন চা ব্যবসায়ী। সে সময় আমরা এক সঙ্গে বসে হুইস্কি খেতাম। অন্যান্য দিন কাজ থেকে ফিরে এসে স্নানের পর আমি একাই মদ্যপান করতাম। মদ খেতে খেতে এমন একটা অবস্থায় পেঁছতাম যেখান থেকে আপন অস্তিত্বের কোন অনুভূতি আর আমার থাকত না। তখন আমার গায়ে আঁচড় কাটলেও আমি কোন কষ্ট অনুভব করতাম না। শ্বাস-প্রশ্বাসে একটা জ্বালা অনুভব করতাম। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেই মাথা ঘুরে যেত। আমার ইচ্ছাশক্তি লুপ্ত হোত। শূন্যে যে কতক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতাম তা কে জানে। সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যেত। লম্বা চেয়ারে গা এলিয়ে, নাইট স্যুট পরে বসতাম। ক্রমশঃ আমার চিবুক এসে ঠেকত বুকে। এইভাবে একটা সময় আমার মনে হোত ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে ভাব কেটে গিয়ে আমার শরীরের পরিচিত উত্তাপ ফিরে এসেছে। এক একদিন এর পর লাফিয়ে উঠে পোষাক পরে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়তাম। ধুলোর মতো জলকণা মিশ্রিত বাতাস আঘ্রাণ করতে করতে বিষণ্ণ চিত্তে আমি স্বপ্ন দেখতাম একটা সুখী, সাধারণ জীবনের। শহর বা শহরের উপকণ্ঠে একটা সাধারণ ছোট্ট বাড়ী,

শহরে দিনে অন্তত একবারও যাওয়া যায় এরকম একটা জায়গা হলেই চলবে। বৃষ্টির মধ্যে ভবঘুরের মতো ঘুরতে ঘুরতে এই সব ভাবতাম আমি। ঘুরে বেড়াতাম যতক্ষণ না অন্য কাজে প্রবৃত্তি আসত, অথবা ঘুম পেতো।

আসামে থাকাকালীন আমার ঘুম ছিল খুব গভীর। বিশেষ করে সেই তিন সপ্তাহ যখন আমি সাদিয়ার চল্লিশ মাইল দূরে কাজ করতাম। ওখান থেকে মাঝে মাঝে প্রায় মধ্যরাত্রে মোটরে বাংলোয় ফিরে আসতাম। পাহাড়ী রাস্তার খাদ এড়িয়ে অনেক ঘুর পথে ঘরে ফিরে এসে তখন আর জামা কাপড় ছাড়ার ইচ্ছে থাকতো না। প্রচুর রাম্ দিয়ে এক কাপ চা আর সঙ্গে কুইনাইন খেয়ে পোশাক পরেই শুয়ে পড়তাম। পরের দিন সকাল নয়টার মধ্যেই আবার ফিরে যেতে হোত কর্মক্ষেত্রে।

ক্রমশঃ আমার পোষাক-পরিচ্ছদে অবহেলা এল। আর প্রয়োজনই বা কি ছিল! কয়েক শো মাইলের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই শ্বেতকায় ছিল। তারা মৌসুমী আবহাওয়ার সময় পাহাড়ে থাকতোই না। আর ছিল কিছু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার। এদের বাড়ীতে আমি কয়েকবার থেকেছি যখন আমার মানসিক অবসাদ আর সহ্য করতে পারতাম না। ওই সব পরিবারে ইংরাজীতে কথাবার্তা আমাকে যেন কিছুটা স্বস্তির পরিবেশে ফিরিয়ে আনত। সকলে মিলে সন্ধ্যা থেকেই আমরা মদ খেতে শুরু করতাম।

রবিবার আমার চাকরেরা শিলং চলে যেত সারা সপ্তাহের রসদ আনতে। সেদিন আমি দুপুর অবধি ঘুমোতাম। জেগে উঠে দেখতাম মাথা ভারী হয়ে আছে আর মুখ ফুলে কিম্ভুত দর্শন হয়েছে। বিছানাতে শুয়ে শুয়েই ডায়েরি লিখতাম। খুঁটি-নাটি অনেক কিছু টুকে রাখতাম পরবর্তীকালে আসামে শ্বেতকায়দের জীবনযাত্রা নিয়ে যদি কখনও একটা বই লিখি এই ভেবে। এর জন্য আমার নিজেকে বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন হোত। আমার কর্মচাঞ্চল্যহীন স্নায়বিক অবসাদের দিনগুলো, আবার পাশাপাশি প্রথম পথপ্রদর্শক রূপে আমার ভূমিকা, যেখানে আমার মন গর্ব আর শক্তিতে ভরপুর এসবই তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতাম।

সারা জুলাই মাসে একবার মাত্র শিলং গিয়েছিলাম। অনেক অনেক দিন বাদে সূর্যের কিরণ গায়ে মাখলাম। সিনেমা দেখলাম আর আমার গ্রামোফোনটা সারিয়ে নিলাম। কয়েকটা ডিটেকটিভ উপন্যাস কিনলাম। আসামে যাওয়ার পর থেকে এ ছাড়া অন্য কিছু পড়ার মত মানসিক অবস্থা আমার

ছিল না।

আমি জানতে পেরেছিলাম হেড অফিসে আমার কাজের খুব প্রশংসা হচ্ছে। সেটা জেনেছিলাম আমি সরাসরি নরেন্দ্র সেনের কাছ থেকেই, আমাদের শিলং-এর প্রতিনিধি মারফৎ নয়। এই লোকটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারতাম না। প্রচণ্ড অহংকারী এই আইরিশ লোকটার সঙ্গে আমাকে একবার কথা বলার জন্য শিলং-এ যেতে হয়েছিল। শুধু তার দেখা পাবার জন্য আমাকে সে অপেক্ষা করিয়ে ছিল বেশ কিছুক্ষণ। অথচ সে সময় তার এতটুকুও ব্যস্ততা ছিল না।

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই মিঃ সেনের একটা করে ইংরাজীতে টাইপ করা কয়েক লাইনের চিঠি আসত। কাজ স্বাভাবিক গতিতেই এগোচ্ছিল। সাদিয়ার কাছে কঠিন গিরিপথগুলোর সংস্কারের কাজ আর পুরো রাস্তাটা পরিদর্শনের কাজ শেষ করে যদি রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলতে পারি, অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় যেতে পারব এরকম একটা সম্ভাবনাও দেখা দিল। কিন্তু প্রচণ্ড অবসাদের সময় যে ভয়টা আমার কেবলই হোত ঠিক তাই হোল। অগাস্ট মাসের গোড়ার দিকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার স্নায়ুর ওপর অত্যন্ত চাপ থাকার ফলে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ার আক্রমণ আরও জটিল আকার ধারণ করল।

একদিন বিকেলের আগেই বাংলোয় ফিরে এলাম। শরীর ভাল লাগছিল না। ঘরে এসে চা খেতে গিয়ে মনে হোল কোন স্বাদ পাচ্ছি না। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। হ্যারোওর পরামর্শ মনে পড়ল। তিন গ্লাস ব্র্যাণ্ডি খেয়ে আমি শুতে গেলাম। পরদিন আর ওঠার ক্ষমতা রইল না। ভুল বকতে শুরু করলাম। ফ্র্যাংক নামে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডাক্তার এলেন আমায় দেখতে। সব দেখে শুনে তিনি আমাকে সেদিনই সাদিয়া পাঠিয়ে দিলেন। তখন পড়ন্ত বিকেল, কিন্তু সূর্য বিস্ময়করভাবে উজ্জ্বল ছিল। ফুল, পাখী, প্রকৃতি দেখতে দেখতে আমি চললাম সাদিয়ার পথে। স্টেশনে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখে বিস্মিত হলাম। গত চারমাসে আমি কোন বিদেশী মহিলা দেখিনি।

তারপর কি হয়েছিল আমার স্পষ্ট কিছু মনে নেই। শুধু বুঝতে পারছিলাম আমায় শিলং-এ আনা হয়েছে এবং আমাকে ইওরোপীয়ানদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কলকাতায় টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। আমার জায়গায় বদলী লোক আসার আগেই নরেন্দ্র সেন আমায় দেখতে এলেন। এর পাঁচ দিন বাদে ট্রেনের একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমাকে কলকাতা

পাঠিয়ে দেওয়া হোল। সঙ্গে রইল দুজন নার্স এবং হ্যারোও। কলকাতায় পৌঁছে আমাকে সোজা তোলা হল ট্রপিকাল হাসপাতালে।

একদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম আমার ঘরের দেওয়ালগুলো সাদা রঙের। ঘরে ক্যারামেল এবং অ্যামোনিয়কের গন্ধ। জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে এক ভদ্রমহিলা কিছু একটা পড়ছেন। মাথার ওপর চলমান পাখার একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। মনে হচ্ছিল আমার আধা ঘুম-জাগরণের মধ্যে কেউ যেন জোসেফ কনরাডের বই 'লর্ড জিম' সম্পর্কে কিছু বলছিল। বিছানায় সোজা হয়ে বসে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল যে উপন্যাসটা নেহাৎই মাঝারি ধরণের। এর চেয়ে অনেক ভাল উপন্যাস কনরাডের যৌবনে লেখা 'আলমেয়ারস্ ফলি'।

আমি ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্যে বললাম—যে 'আলমেয়ারস্ ফলি' পড়েনি সে কনরাডের প্রতিভা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়।

ভদ্রমহিলা আমার বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন—যাক্, ভগবানকে ধন্যবাদ আপনি তাহলে কালা হয়ে যান নি।

তারপর প্রশ্ন করলেন—আপনার কিছু লাগবে?

আমার ঠাণ্ডা, রুগ্ন খোঁচা খোঁচা গালে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম—আমি দাড়ি কামাতে চাই।

আরো বললাম—এই রকম অভদ্র চেহারায় আপনার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইছি আমি।

ভদ্রমহিলা হাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর বললেন—যাক আপনার জ্ঞান ফিরে এসেছে। আমরা তো বলতে গেলে ক্রমশঃ হতাশই হয়ে পড়ছিলাম। এখন মিঃ হ্যারোও কার কে টেলিফোন করতে হবে। উনি রোজ আপনার খবর নিতে আসেন।

হ্যারোওর যে আমার প্রতি এতখানি টান, জানতে পেরে আবেগে আমার চোখে জল এসে গেল। এই অপরিচিত, বান্ধবহীন অবস্থায় নিজেকে ভীষণ একা আর অসহায় মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কত দূরে আমার দেশ, প্রায় পাঁচ সপ্তাহের পথ আর আমি এখানে একা মৃত্যুপথ যাত্রী।

ভদ্রমহিলা স্নিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করলেন—কি হোল আপনার?

বললাম—কিছু না। আপনি যদি একটু আমার দাড়িটা কামাবার ব্যবস্থা করে দেন……

আমার চোখের জল বাঁধ মানছিল না। মৃদু স্বরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম—আপনার কি মনে হয় আমি ভালো হবো ? আমি আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারবো ? আবার দেখতে পাবো নিউইয়র্ক, প্যারিস ?

তাঁর উত্তরটা আমার মনে পড়ছে না। কিন্তু সেই দিনটা আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। এর পরই আমায় দেখতে এলেন কয়েকজন ইওরোপিয়ান ডাক্তার। তাঁরা চলে যাবার কয়েক মিনিট পরেই হারোও এসে আমার করমর্দন করলো। তারপর অনর্গল বকে যেতে লাগলো, কলকাতার নানারকম খবরাখবর দিয়ে ঃ গারতির এখন প্রেমের খেলা চলছে মিডল ব্যাঙ্কের এক ম্যানেজারের সঙ্গে। গারতি এখন সিনেমা যায় সাড়ে তিন টাকার টিকিটে। বিয়ের পর নরিনকে দেখতে কুৎসিত হয়ে গেছে। আমার শোবার ঘরে এখন একটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার বাস করছে। আর হারোও নিজে যুবকই আছে। বিকেলের দিকে স্কুলের মেয়েদের ধরে নিজের ঘরেই নিয়ে আসে আর আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর সামনেই নোংরামো করে। স্ত্রীর চিৎকার চেঁচামেচি সে কানেই তোলে না… ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা যখন এই ধরণের বাজে কথাবার্তায় মগ্ন ছিলাম তখন মিঃ সেন ঘরে ঢুকলেন। তিনি পরম আন্তরিকতায় আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন এবং আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি ওনাকে হারোওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। হারোও যে ভাষায় মিঃ সেনকে সম্ভাষণ করলো তা খুব ভদ্র ও মার্জিত ছিল না। বুঝতে পারছিলাম মিঃ সেন হারোওর উপস্থিতিতে বিব্রত বোধ করছিলেন। মিঃ সেন বললেন—অ্যালেন, তুমি অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলেই অসুস্থ হয়ে পড়েছো। চিন্তা কোরনা, ভাল হয়ে যাবে। অন্যান্য সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।

পরের দিন অফিস ছুটির পর তিনি আবার আসবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিঃ সেন বিদায় নিলেন।

মিঃ সেন বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই হারোও আমাকে বললো,—এই জাতীয় লোক সম্পর্কে খুব সাবধান থাকবি অ্যালেন। উনি তোর প্রতি এত সহানুভূতি দেখাতে শুরু করলেন কেন ? তোর সঙ্গে ওনার মেয়ের বিয়ে দেবেন না কি ?

লজ্জায় লাল হয়ে কপট রাগ দেখিয়ে আমি বললাম—উল্টো পাল্টা অযৌক্তিক কথা বলিস নি।

অনেক দিন পর, মৈত্রেয়ীর মুখটা আবার আমার চোখের সামনে ভেসে

উঠলো। কিন্তু এ এক অন্য মৈত্রেয়ী! মিসেস সেনের মুখের সঙ্গে যেন এ মুখের সাদৃশ্য অনেক বেশি। পানের রসে লাল টুকটুকে ঠোঁট, ঘাড়ের ওপর কালো চুলের খোঁপা, মুখে মৃদু হাসিতে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ নিয়ে আরও সজীব। বেশ কিছুক্ষণ ওর রূপের ধ্যান করলাম আমি। মৈত্রেয়ীকে অনেক দিন না দেখতে পাওয়ার বেদনা, শীঘ্রই আবার তাকে দেখতে পাওয়ার আনন্দ, আবার কথা বলার সময় যে অস্বস্তি হবে এসবের মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমার মন ছুঁয়ে গেল। এই সময়ে হারোওর উপস্থিতি আমার শুধু বিরক্তিকর নয়, অসহ্য মনে হচ্ছিল। জানিনা কি করে সেই আশ্চর্য অনুভূতির ব্যাখ্যা করবো। মৈত্রেয়ীর প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা বা ভালবাসা কিছুই ছিল না। আমি তাকে দেখেছিলাম খুবই সাধারণ একজন অহঙ্কারী বাঙালী মেয়ে হিসেবেই। সে ছিল এমন অদ্ভুত প্রকৃতির এক নারী যে একাধারে শ্বেতকায়দের ঘৃণা করতো আবার তাদের প্রতি আকৃষ্টও হতো।

হারোও আমাকে যা বলে গিয়েছিল, সে সব শুনে আমার আনন্দ হবার মত কিছু ছিল না। সে চলে যাক এটাই আমি চাইছিলাম। এক দিনে পর পর অনেক কিছুই ঘটে গেল। অনেক কিছুই জানলাম আর অনুভব করলাম। একটু সুস্থ হওয়া আমার শরীর এবং মনে মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব সেই মুহূর্তে আমায় যেন কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলছিল। বুঝতে পারছিলাম তার বাস্তব উপস্থিতি নতুন কোন সমস্যার সৃষ্টি করলেও করতে পারে।

ভারতবর্ষে আসার পর আমি কখনো অসুস্থ হইনি, আর এত দীর্ঘকালীন অসুস্থতার স্মৃতিও আমার নেই। ইচ্ছে করত বিছানার চাদর থেকে নেমে, জামা-কাপড় পরে কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। শহরের আলো আমার স্মৃতি আর বেদনা নতুন করে জাগিয়ে তুলছিল। ইচ্ছে করত চায়না টাউনে গিয়ে 'চিয়াও' খাই, 'চিয়াও'-এর পিঁয়াজ, নুডলস্, ডিমের কুসুম, বাগদা চিংড়ির গন্ধ, সব আমি অনুভব করতে পারছিলাম। ইচ্ছে করছিল ফেরার পথে 'ফিরপো'-এ নেমে জাজ্ শুনতে শুনতে একটা ককটেল্ খাই। হাসপাতালের বিস্বাদ খাবার আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল। ধূমপান করাও নিষেধ ছিল।

পরদিন আমাকে দেখতে এল আমার দুই বান্ধবী গারতি আর ক্লারা। ওরা আমার জন্য প্রচুর চকোলেট, সিগারেট আর ফল নিয়ে এসেছিল। আমি কেবল ওদের বলছিলাম এখান থেকে পালাতে চাই, স্বাধীনতা চাই। এমন সময় হারোও এসে পড়ল। সে আমার যেদিন ছুটি হবে সেরাত্রে পার্টি দেবার পরিকল্পনা

শুরু করে দিল। শুধু পার্টিই হবে না, সঙ্গে থাকবে লেকভ্রমণ। অনুষ্ঠানে যাতে কোন খুঁত না থাকে তার জন্য গারতি তখনই কাগজ পেনসিল জোগাড় করে নিমন্ত্রিতদের তালিকা তৈরী করতে লেগে গেল। তালিকা থেকে দুই সিম্পসন্ বাদ যাবে এটাও ওরা ঠিক করে ফেলল। কারণ নরিনের বাগদান অনুষ্ঠানের সময় গারতি দেখতে পেয়ে গিয়েছিল যে ইশাক ঘরের কোণে লুকিয়ে লুকিয়ে 'র' হুইস্কি খায় আর জেরাল্ড সিগারেট চুরি করে—ক্যাথারিনকে অবশ্য নিমন্ত্রণ করতেই হবে কারণ সে নাকি আমার অসুখের কথা শুনে দারুণ দুঃখ প্রকাশ করেছে আর মাঝে মাঝে আমার খবর নিয়েছে। হুবার ভাইরা আর সুন্দরী ইভির ব্যাপারে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এরকমই ঠিক করা হোল। বাদ বাকী নিমন্ত্রিতদের ব্যাপারে সবাই একমত হোল।

গারতিই বেশী কথা বলছিল এবং আমার হয়েই সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। তার কথা শুনে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না। আমার মন এখানে ছিল না। গারতির মুখ থেকে আমার দৃষ্টি সরে গিয়ে প্রায়ই শূন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছিল।

নার্স এসে খবর দিল যে মিঃ সেন আসছেন। আমি পড়লাম মহা ঝঞ্ঝাটে। যখন কোন সম্মানীয় ভারতীয়কে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবক যুবতীদের সামনে দেখা করতে হোত তখন একটা অস্বস্তি আমি অনুভব করতামই। গারতি আর ক্লারা কৌতুহলী চোখ নিয়ে দরজার দিকে তাকালো। প্রথমে ঘরে প্রবেশ করলেন নরেন্দ্র সেন মুখে স্মিত হাসি নিয়ে। তার পরেই এল মৈত্রেয়ী। লঘু এবং ক্ষিপ্র ছিল তার পদক্ষেপ। আমার মনে হল আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। মনে পড়ল যে আজ আমি দাড়ি কামাইনি, যে নাইট গাউনটা পরে আছি তা আমার নয় এবং ওটা আমাকে একেবারেই মানাচ্ছে না। নিজেকে হাস্যকর একটা জীব বলে মনে হচ্ছিল। মিঃ সেনের সঙ্গে করমর্দন করলাম একটু কষ্টের ভান করে যাতে নিজের অপ্রতিভতা একটু ঢাকতে পারি। তারপর আমি মৈত্রেয়ীকে নমস্কার জানাবার জন্য কপালে হাত ঠেকালাম। এই কপট গাম্ভীর্য আনতে গিয়ে আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কি ভাল লেগেছিল যখন মৈত্রেয়ীকে আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবার পর সে অত্যন্ত স্বাভাবিক সপ্রতিভতার সঙ্গে তাদের সঙ্গে করমর্দন করল এবং জিজ্ঞাসা করল, "How do you do ?" মিঃ সেন হাসতে হাসতে বললেন আমার মেয়ে দুটো পাশ্চাত্য রীতিতে ভব্যতা প্রকাশ করার ধারাটা ভালই রপ্ত করেছে। তিনি সর্বক্ষণ

গারতিকে লক্ষ্য করছিলেন এবং বিশেষ করে খেয়াল করছিলেন তাঁর সূক্ষ্ম মতামতের সময় গারতির প্রতিক্রিয়া।

আমি এক আগ্নেয়গিরির ওপরে বসেছিলাম। একদিকে আমার দুই বান্ধবী আর হারোও নিজেদের মধ্যে বকবক করে চলেছিল অপর দিকে ঘরে উপস্থিত মিঃ সেন তাঁর দুই মেয়েকে বাংলায় কিছু বলছিলেন। মৈত্রেয়ী আগ্রহভরে চারদিকে দেখছিল কিন্তু তার দৃষ্টিতে ছিল তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গ। যতবারই মৈত্রেয়ী কোন আলোচনায় যোগ দিচ্ছিল, ততবারই তার ঠোঁটে ছিল একটা মৃদু হাসি যাতে ব্যঙ্গ আর বন্য পরিহাস মিশে ছিল। আমি মৈত্রেয়ীর মতো কোন সরল মেয়ের মুখে এ জিনিষ আশা করিনি। অসুন্দর চেহারার জন্য নিজের ওপর আমার রাগ হচ্ছিল। একসঙ্গে গারতি, ক্লারা, হারোও আর মিঃ সেনদের উপস্থিতি আমার যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মৈত্রেয়ীর মধ্যে মুগ্ধ হবার মতো কিছুই ছিল না। তাকে ভালবাসতে পারা তো দূরে থাক। বড়জোর মাঝে মাঝে হয়তো দু-একবার দেখা হতে পারে তবুও উদ্বেগটা আমার যাচ্ছিল না।

মৈত্রেয়ী বললো—মঁসিয়ে অ্যালেন, আমাদের বাড়ী কবে যাচ্ছেন ?

মৈত্রেয়ীর কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত সুর ছিল যার ফলে আমার তিন বন্ধুই একসঙ্গে ঘুরে তার দিকে তাকালো।

আমি বললাম—যেদিনই ভাল হবো সেই দিনই যাবো। কথা বলতে আমি ইতস্ততঃ করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না কি বলে তাকে সম্বোধন করব। 'মিস্' শব্দটা ঠিক মানায় না, আর তাকে 'দেবী' বলে সম্বোধন করতেও আমার সাহস হচ্ছিল না। আমার এই হতবুদ্ধি ভাব লজ্জায় আমাকে লাল করে তুলেছিল তাই ক্ষমা চাইতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

বললাম—কিছু মনে করবেন না। ঘরটা গুছোন নেই, দাড়ি কামাতে পারিনি আজকে, সারাদিন খুব ক্লান্ত লাগছে।

আমি তীব্র ক্লান্তির ভান করতে থাকলাম আর মনে মনে কামনা করতে লাগলাম, সবাই যেন চলে যায়। কারণ একসঙ্গে সকলের এই উপস্থিতিতে আমার দারুণ অস্বস্তি হচ্ছিল।

নরেন্দ্র সেন বললেন—অ্যালেন তুমি কি জান যে আমরা ঠিক করেছি এর পর থেকে তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকবে! এটা আমার স্ত্রীর প্রস্তাব আর আমরা সবাই এটাতে একমত হয়েছি। তুমি এখানকার রান্না খাবারে অভ্যস্থ নও

এবং এর পর যদি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ো তখন তার ফল মারাত্মক হতে পারে। এছাড়া আর একটা দিকও আছে, আমাদের ওখানে থাকলে তোমার টাকা পয়সার খরচও কম হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সেই জমানো টাকা নিয়ে তুমি বছরে একবার হলেও দেশে যেতে পারবে, নিজের লোকজন আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। আর আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চই বুঝতে পার তোমার উপস্থিতি আমরা······

নরেন্দ্র সেন তাঁর বাক্য সম্পূর্ণ করলেন না, শুধু মৃদু হাসিতে তা শেষ করলেন। মৈত্রেয়ী সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে আমায় কিছু বললো না, শুধু আমার উত্তরের অপেক্ষায় রইল। তাঁরা চলে যাবার পরই কেন ডায়েরিতে লিখে রাখিনি ঠিক সেই মুহূর্তে মানসিক অবস্থা কী রকম ছিল সেই কথা ভেবে আজ আমার বড় অনুশোচনা হয়। একথা বলছি এই কারণে নয় যে ঘটনাগুলো বহু পুরোনো। আসলে পরবর্তীকালে যে মারাত্মক ভাবাবেগ এবং বিদ্রোহী মনোভাব আমার মধ্যে এসেছিল তা আমাকে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন করে দিয়েছিল এবং ফলতঃ সেই সময়কার আমার অনুভূতিগুলোও নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তা সত্বেও আজও স্পষ্ট মনে পড়ে আমার মানসিকতা তখন দ্বিধা-বিভক্ত।

একদিকে একটা এমন জীবন যাপনের হাতছানি যা আগে কখন কোন শ্বেতাঙ্গের কপালে জোটেনি এবং যে জীবন লুসিয়্যাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। আর মৈত্রেয়ীর প্রতি আকর্ষণ বা পরবর্তীকালে মৈত্রেয়ীর তরফে এক রহস্যময় ঐতিহাসিক খামখেয়ালিপনা বলেও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অন্য দিকে আমার স্বাধীনতাপ্রিয় মন বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল। মনে হচ্ছিল এই জীবনে আমার সমস্ত স্বাধীনতা খর্ব হবে, আমার উধর্বতনের প্রচ্ছন্ন অদৃশ্য শাসনে আমার যৌবনের সমস্ত সাধ আহ্লাদ এমন কি মদ্যপানও বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে। আর সিনেমা দেখার ব্যাপারেও বোধহয় তা সপ্তাহে একটাতে নেমে আসবে। এই দুটো বোধই আমাকে এত তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল যে কোনটাকে প্রাধান্য দেবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু উত্তর তো একটা সময় দিতে হবেই, তাই আমি বলে ফেললাম—মিঃ সেন, আপনার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। আমার ভয় হচ্ছে আমি না আপনাকে অসুবিধায় ফেলি।

বলতে গিয়ে কথাগুলো আমার মুখে একটু জড়িয়ে যাচ্ছিল। দেখছিলাম সেই দুই মেয়ের মুখের দিকে। বুঝতে পারছিলাম যে তারা আমাকে

তাদের খাঁচায় পোরার ব্যবস্থার প্রস্তাবটা বেশ আরাম করে উপভোগ করছিল। মিঃ সেন আর মৈত্রেয়ী আমার বিছানার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। অন্যরা ছিল জানালার কাছে। নরেন্দ্র সেন হেসে বললেন—বোকার মতো কথা বোল না। আমার বাড়ির এক তলায় লাইব্রেরির পাশেই কয়েকটা ঘর খালি পড়ে রয়েছে। অসুবিধে আবার কি হবে! তুমি থাকলে, আমার পরিবারের মধ্যে কিছুটা ইওরোপীয়ান সভ্যতাও তো ঢুকবে।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম শেষ কথাগুলো কি মিঃ সেন ঠাট্টা করে বললেন? কিন্তু গারতি আমার চিন্তা সূত্র ছিন্ন করে দিল। আগেই আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম যে মিঃ সেন বা তার সুন্দরী মেয়েরা যদি কোন বিপদে ফেলেন তখন গারতি আমায় জিজ্ঞাসা করবে, 'অ্যালেন, তোমার প্রেমিকার খবর কি?' নরিন, ইসাবেল বা লিলিয়ান যারই নাম প্রথমে মাথায় আসবে তারই নাম করে জিজ্ঞাসা করলেই হবে। মিঃ সেনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গারতির সঙ্গে আমার চুক্তির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু গারতির মনে পড়লো এবং ঠিক সময়েই সে সেই প্রশ্নটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

মিঃ সেন প্রশ্নটা শুনেই কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। মৈত্রেয়ী প্রশ্নকর্ত্রীকে দেখার জন্য মাথা ঘোরাল। উত্তরের অপেক্ষা না করে গারতি বলেই চলল—যাও যাও অত সাধু সাজার কি আছে? বাড়ী ছাড়ার আগে তোমাকে ওর মতামত নিতে হবে তো? কি মিঃ সেন, ঠিক বলিনি?

মিঃ সেন গম্ভীর মুখে বললেন—হ্যাঁ তা তো বটেই।

মৈত্রেয়ী দারুণ অবাক হয়ে গারতিকে দেখছিল। তারপর সে সোজা তার বাবার চোখে চোখ রাখল। ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য মিঃ সেন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—অ্যালেন, তোমার পড়ার জন্য বই এনেছি। আমার মেয়ে পছন্দ করেছে Out of the East। বইটা ওর খুব ইচ্ছে ছিল তোমাকে পড়ে শোনাবে। কিন্তু আজ তো অনেক দেরী হয়ে গেল……।

মৈত্রেয়ী বললো—বাবা, আমি তো ভাল ইংরাজী পড়তে পারি না। এদিকে গারতি তার প্রথম প্রচেষ্টা বিফলে গেছে দেখে বলে উঠলো—কিন্তু অ্যালেন তোমার প্রেমিকার ব্যাপারে কিছু বললে না তো?

তাকে থামাবার জন্য আমি চিৎকার করে বললাম—আমার কোন প্রেমিকা নেই।

শুনে গারতি নীচু গলায় মিঃ সেনের কানে কানে বলে চললো—ও মিথ্যে

কথা বলছে। আসলে ও একটা পাক্কা লম্পট।

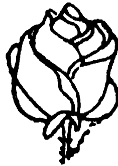
সে একটা চমকপ্রদ দৃশ্যের সৃষ্টি হোল বটে। হতভম্ব, লজ্জিত মিঃ সেন মৈত্রেয়ীর দিকে তাকালেন। হারোওদের হাব-ভাব দেখে মনে হল তারা ভাবছে তারা জিতে গেছে। জানালার পাশ থেকে সে তাই আমায় বিজয় সংকেত করছিল। ঐ রকম একটা পরিস্থিতিতে আমার অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। আর আমি তখন মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম যেন একটা অলৌকিক কিছু ঘটুক যাতে সব কিছু মিটমাট হয়ে যায়। নিজেকে আড়াল করার জন্য যন্ত্রণার ভান করে দু'হাত দিয়ে কপাল ঘসতে থাকলাম। মিঃ সেন বললেন—আমরা চলি। অ্যালেন, তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া উচিৎ।

মিঃ সেন আমার করমর্দন করলেন। আমিও চললাম, বলে হারোও মিঃ সেন এবং তাঁর কন্যার কাছ থেকে বিদায় নিল কোন সৌজন্য প্রকাশ না করেই।

হারোও এবং মিঃ সেনেরা বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই গারতি আর ক্লারা হাসিতে ফেটে পড়লো। গারতি বললো—অ্যালেন, দেখলে কেমন হারিয়ে দিলাম!

ক্লারা মন্তব্য করলো—ও কিন্তু দেখতে খারাপ নয়। শুধু নিগ্রোদের মত, এই যা। ও মাথার চুলে ওগুলো কি পরেছে অ্যালেন?

পুনরায় আমার পুরনো মানসিকতা চাড়া দিয়ে উঠল। বিশ্বাস না থাকলেও মন্তব্যগুলো আনন্দ সহকারেই শুনতে লাগলাম। এমন কি মিঃ সেনদের বিরুদ্ধে মন্তব্যে আমিও যোগ দিলাম। গারতি পুরনো কথায় ফিরে গেল। বললো—নাও তালিকাটা শেষ বারের মত দেখে নেওয়া যাক। আমার মনে হয় হুবার ভাইদেরও নিমন্ত্রণ করলে ভাল হয়। বড় ভাই ডেভিডের গাড়ীটা তাহলে পাওয়া যেতে পারে। আর অ্যালেন, আমার উপস্থিত বুদ্ধির একটু প্রশংসা করো—কিরকম বাঁচিয়ে দিলাম তোমাকে, বলো?



তখন রোজ সকালে আমার ঘুম ভাঙতো এক একটা নতুন অনুভূতি নিয়ে। শোবার খাটটা ছিল দরজার পাশে। শুয়ে শুয়েই দেখতাম আমার অনুজ্জ্বল ঘরটাকে। এক দিকে উঁচুতে গ্রীল দেওয়া একটা জানালা। সবুজ রঙের দেওয়াল। কাজের টেবিলের পাশে দুটো টুল আর বিরাট একটা আরাম কেদারা। বই-এর তাকের ডান দিকে দেওয়ালে ঝুলছে কয়েকটা ছবি। প্রত্যেক দিনই জীবন শক্তি ফিরে পেতে আমার বেশ কয়েক মিনিট লেগে যেত। খোলা জানালা দিয়ে দালানের দিক থেকে যে সমস্ত শব্দ আসতো সেগুলোর উৎস, আর আমি কোথায় আছি—এইটে বুঝতে বুঝতেই বেশ কিছুটা সময় কেটে যেত। খাটের ওপর বসে থাকত রক্ত ফোলা তুলে তুলে কিছু মশা। সেগুলোকে সরিয়ে লোহার রড্ দিয়ে বন্ধ করা দরজা খুলে বেরিয়ে মুখ ধুতে যেতাম উঠোনের মাঝ খানে একটা টিনের চালের ঘরে। সেই ঘরের মধ্যে ছিল একটা সিমেন্টের চৌবাচ্চা যার মধ্যে বিকেলে বাড়ীর চাকরেরা ডজন ডজন বালতি জল ঢেলে রাখতৃ। ঘড়ায় জল ভরে আমি গায়ে ঢেলে স্নান করতাম। তখন ছিল শীতকাল, বাইরে উঠোনটা ছিল টালি পাতা আর ভীষণ ঠাণ্ডা। শীতে আমার পা থেকে মাথা অবধি কাঁপতো। বাড়ীর অন্য লোকেরা স্নানের সময় এক বালতি করে গরম জল সঙ্গে আনত। তারা যখন শুনতো যে আমি ওই ঠাণ্ডা জলেই রোজ স্নান সারি তখন তারা এত বিস্মিত হতো যে তা বলার নয়। কয়েক দিন ধরে সারা বাড়িতে আমার স্নান নিয়েই আলোচনা চলতো। মনে মনে আশা ছিল মৈত্রেয়ী নিশ্চই এক দিন আমার স্নানের প্রশংসা করবে। রোজ সকালে তাকে আমি দেখতাম একটা অত্যন্ত সাধারণ শাড়ি পরে খালি পায়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে। একদিন সে আমায় বললো—আপনাদের দেশে নিশ্চই দারুণ ঠাণ্ডা! সেই জন্যই আপনারা এত ফর্সা।

ওই 'ফর্সা' শব্দটা সে উচ্চারণ করেছিল চা-এর টেবিলের ওপর রাখা আমার নগ্ন বাহুর দিকে তাকিয়ে। তার ওই ঈর্ষা আমাকে অবাক করেছিল। তাদের বাড়িতে আসার পর বলতে গেলে তার সঙ্গে সেই প্রথম কথাবার্তা কিন্তু আমাদের সে-কথাবার্তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হোল না, কারণ মিঃ সেন আমার সঙ্গে তখন কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

অন্য লোকের অসাক্ষাতে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুব কমই হোত। তাকে দেখতে পেতাম বারান্দা পার হয়ে যেতে। শুনতে পেতাম তার গান। জানতাম দিনের অধিকাংশ সময়টা সে কাটায় হয় শোবার ঘরে, আর নয়তো টেরাসে। ক্রমশঃ কৌতুহলী হয়ে উঠছিলাম এই নারীর প্রতি যে একই সঙ্গে এত কাছের এবং এত দূরের।

মনে হতো সর্বদাই সে যেন আমাকে নজরে রেখেছে সন্দেহক্রমে নয়, পাছে আমার কোন অসুবিধা হয় এই ভেবে। একা একা থাকার ফলে কি না জানিনা এ বাড়ীর অনেক ব্যাপারই অদ্ভূত আর অবোধ্য ঠেকতো আর বুঝতে না পারার ফলেই হাস্যকর মনে হোত। প্রায়ই খালি গায়ে একটি চাকর আমার কাছে আসতো। সে সঙ্গে করে নিয়ে আসতো ফল, দুধ, নারকেলের শাঁস আর ঘরে তৈরি মিষ্টি। লক্ষ্য করতাম দরজার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে সে তীব্র কৌতুহল নিয়ে আমার ব্যবহারের জিনিসপত্রগুলো দেখতো আর অনর্গল আমায় প্রশ্ন করে চলতো, আমার বিছানাটা পছন্দসই কি না, মশারি ঠিক মতো লাগানো হয় কি না, আমার ক্ষীর খেতে ভাল লাগে কিনা, আমার কতজন ভাই বোন আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর সঙ্গেই আমি কয়েকটা কথা হিন্দীতে চালাতে পারতাম, আর আমি জানতাম আমার প্রতিটি উত্তর দো-তলায় মিসেস সেন এবং অন্যান্য মহিলারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মৈত্রেয়ীকে আমার একটু বেশি মাত্রায় অহংকারী মনে হোত। খাবার টেবিলে খাওয়ার সময়ও তার মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি লেগেই থাকত। টেবিল থেকে সর্বদাই সে সবার আগে উঠে পড়তো এবং পাশের ঘরে যেত পান খেতে। সেখান থেকে তার বাংলা ভাষায় কথাবার্তা আর গলা ফাটিয়ে হাসির শব্দ ভেসে আসত। অন্য লোকের উপস্থিতিতে কখনই সে আমার সঙ্গে কথা বলতো না আর আমরা যখন দুজনে আলাদা থাকতাম তখন তাকে কিছু বলতে আমি সাহস পেতাম না। এই রকম অদ্ভুত আচার ব্যবহারের রীতি-নীতি ভঙ্গ করার সাহস আমার ছিল না কেন না মনে হোত একজন ভারতীয়ের পক্ষে এটাই নিশ্চয় ভদ্রতা আর সদাচারের লক্ষণ। তার চেয়ে এগুলো লক্ষ্য না করে নিজের ঘরে ফিরে যাওয়াই আমার শ্রেয় বলে মনে হোত।

কখনো কখনো পাইপ খেতে খেতে তার কথা আমি চিন্তা করতাম। ভাবতাম, আমার সম্পর্কে মৈত্রেয়ীর কি রকম ধারণা, কি ভাবে ও আমার সম্পর্কে! ওর পরিবর্তনশীল মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় ছিল না। এক এক দিন ওকে

এত সুন্দরী লাগতো যে দেখে দেখে আশা মিটতো না। সে কি নির্বোধ ছিল? না প্রকৃতই সরল ছিল? নাকি আদিম যুগের ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে আমি যে রকম ভাবতাম সেই তাদের মত? কতগুলো বাজে ভাবনা মাথায় ঘুর-ঘুর করছে ভেবে পাইপের ছাই ঝাড়ার মতো সেগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতাম এবং পুনরায় বই-এর পাতাতে ডুবে যাবার চেষ্টা করতাম।

মিঃ সেনের লাইব্রেরীটি ছিল একতলার দুটো ঘর জুড়ে। তাই নিত্য নতুন পড়ার বই এর অভাব আমার ছিল না।

একদিন, আলিপুরে আসার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে বারান্দার নিচে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মত আমি হাত কপালে তুলে আমার টুপি খুলে তাকে নমস্কার জানালাম। ওকে কোনভাবে অসম্মান না করে ফেলি এই ভয়েই আমি অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে কাজটা করেছিলাম। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলো—কে আপনাকে আমাদের নমস্কার করবার নিয়ম শিখিয়েছে?

সেদিন তার মুখে ছিল এক আশ্চর্য বন্ধুত্বপূর্ণ মৃদু হাসি।

আমি উত্তর দিলাম—আপনিই।

মোটর গাড়ীতে আমাদের মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা আমার মনে পড়লো। সে সময়ে তার মুখে যে অস্বস্তি বা অস্থিরতা দেখেছিলাম সহসা তা যেন মৈত্রেয়ীর মুখে ফুটে উঠল। সে আর কথা না বাড়িয়ে দৌড়ে অন্দর মহলের দিকে চলে গেল। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে আমি আমার ঘরে ফিরে গেলাম। ভেবে ছিলাম ঘটনাটা মিঃ সেনকে জানাবো। কিন্তু কি ভাবে যেন আর জানানো হয়ে ওঠেনি।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর একদিন অফিস থেকে ফিরে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় মৈত্রেয়ী এসে দরজায় টোকা দিল। দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে সে ভয়ে ভয়ে বললো—আমার বাবা কখন ফিরবেন আপনি জানেন?

আমার দরজায় মৈত্রেয়ীকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আজ স্বীকার করছি সেই মুহূর্তে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত ছিল তা সেদিন ঠিক বুঝতে পারিনি। তাকে ঘরের ভেতরে আসতে বলার বা বসতে বলার সাহস আমার হোলনা। তার কথার উত্তর দিতে গিয়ে এত অসংলগ্ন কথা বলছিলাম যা আজ মনে পড়লে হাসি পায়। সে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে

বললো—আমার মা-ই আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন। আপনি সারা দিন পরিশ্রমের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা একা এই ঘরে কাটান। আমাদের বাড়ীতে আনন্দ করার মতও কিছু নেই। সন্ধ্যের পরও যদি আপনি এইরকম ভাবে কাটান, তাহলে আপনি তো আবার অসুখে পড়বেন।

—এ-ছাড়া আমি আর কি করতে পারি?

—আপনি যদি চান তাহলে আমার সঙ্গে গল্প করতে পারেন অথবা বাইরে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসতে পারি আমরা।

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি বললাম—আমার তো কোন চেনা লোক নেই এখানে, তাছাড়া এমন কোন বন্ধুও নেই যার বাড়ীতে গিয়ে আমি গল্প করতে পারি।

ও মৃদু হেসে উত্তর দিল—সেই ওয়েলেসলী স্ট্রীটে বুঝি এরকম ছিলনা না?

তারপর হঠাৎ কি মনে করে বারান্দার দিকে চলে গেল, বলে গেল—দেখে আসি চিঠি পত্র কিছু এসেছে কিনা।

দরজায় ঠেস দিয়ে আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সে গুন গুন করে একটা গানের সুর ভাঁজছিল। সুরটা শ্রুতিমধুর ছিল না। এ ধরণের সুর তার দোতলার শোবার ঘর থেকে প্রায়ই আমার কানে ভেসে আসত। তার শোবার ঘরের একটা জানালা ছিল রাস্তার দিকে। আর দরজাটা ছিল বাড়ীর ভেতরের দিকের বারান্দায়। সেই বারান্দায় উঠে গিয়েছিল একটা লাল ফুলের লতানে গাছ। প্রায়ই তাকে গান গাইতে অথবা ছোট বোনের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে শোনা যেত। মাঝে মাঝে তাকে হঠাৎই খুব কাছের মানুষ বলে মনে হোত যখন সে বারান্দা থেকে ঝুঁকে নিচের কারো ডাকের জবাবে মাথা নিচু করে ছোট্ট একটা চীৎকার করে বলতো 'যাচ্ছি'।

মৈত্রেয়ী কিছু চিঠি পত্র হাতে নিয়ে ফিরে এলো। আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির কোনে চাবি বাঁধার চেষ্টা করছিল। সে খুব অহংকারের সুরে বললো—চিঠির বাক্সের চাবি আমিই রাখি।

তারপর চিঠির ওপরের নামগুলো দেখতে দেখতে একটু দুঃখের সঙ্গেই বললো—কিন্তু আমাকে কেউ চিঠি লেখেনা।

—আপনাকে কে চিঠি লিখবে?

—কেন, যে কেউ লিখতে পারে।

তার কথা বুঝতে না পেরে তার দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। সেও এক-

মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

—মনে হচ্ছে আমি ব্যাকরণে ভুল করলাম।

—না, আপনি তো কোন ভুল করেননি।

—তাহলে আপনি আমার দিকে ওইভাবে তাকিয়ে রইলেন কেন?

—না না সেজন্য নয়। আমি বুঝতে পারছিলাম না অচেনা কোনও লোক আপনাকে চিঠি লিখবে কেন?

—সত্যিই অসম্ভব, না? বাবাও একই কথা বলেন। বাবা কিন্তু আপনাকে খুব বুদ্ধিমান ভাবেন। সত্যি নাকি?

আমি ঠাট্টা করে উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেলাম। প্রত্যুত্তরে বোকার মত হাসলাম। কিন্তু সে বলতে লাগল—আপনি আমাদের বারান্দাটা দেখবেন?

আমি সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম। আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল ছাদের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে আকাশ দেখতে। সূর্যের আলো গায়ে মাখতে। পার্ক আর বাংলোওয়ালা পাড়াটাকে ভাল করে ওপর থেকে দেখতে। প্রথম প্রথম যে পাড়ায় এসে আমি প্রায়ই পথ হারাতাম।

—আমি কি এই পোষাকেই যেতে পারি?

আমার প্রশ্নে মৈত্রেয়ী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দেখে বললাম—দেখুন আমার গায়ে কোট নেই, টাই নেই। পায়ে টেনিস খেলার জুতো—তাও আবার মোজা হীন।

সে আমাকে লক্ষ্য করতেই থাকলো এবং হঠাৎই প্রশ্ন করল—আপনাদের বাড়ীতে লোকে বারান্দায় যেতে গেলে কি করে?

—আমাদের বাড়ীতে বারান্দা নেই।

—সত্যি? একদম নেই?

—না. একটাও নেই।

—খুবই দুঃখের কথা। তাহলে আপনাদের বাড়ীর লোকেরা আকাশ, সূর্য কি ভাবে দেখেন?

—কেন? যেখানে খুশী, রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে যেখানে ইচ্ছে গিয়ে দেখে।

সে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো, তারপর বললো—এই জন্য আপনারা এত ফর্সা আর সুন্দর। জানেন আমারও ভীষণ ফর্সা হতে ইচ্ছে করে। তা সম্ভব নয়, না?

—আমি জানিনা···পাউডার মাখলে হয়···।

মৈত্রেয়ী রেগে গেল। বলল—পাউডার ধুয়ে যায়। আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন কি আপনাকে পাউডার মাখিয়ে ফর্সা করা হয়েছিল ?

—না, তা ঠিক নয়।

—আপনাকে পাউডার মাখালে আপনি আর সুস্থ থাকতেন না। তলস্তয় বলেছেন।

আমি আবার অবাক হলাম। তার মুখটা এখন পাল্টে গেছে। খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে বললো—আপনি তলস্তয়কে চেনেন না ? বিখ্যাত রুশ লেখক। জানেন প্রথম জীবনে তিনি খুব ঐশ্বর্যের মধ্যে জীবন কাটিয়েও শেষ বয়সে সব ছেড়ে বাণ-প্রস্থ নিয়েছিলেন, ঠিক ভারতীয়দের মতো। চলুন বারান্দায় যাবেন তো ?

আমরা দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। আমার একটু ভয় ভয় করছিল যখন দোতলায় মেয়েদের ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে ইচ্ছে করেই জোরে জোরে কথা বলছিল যাতে সবাই আমার উপস্থিতি টের পায়। বিশেষ করে বোধ হয় তার মাকে জানানোর জন্যই।

বারান্দায় এসে আমার মনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। বাড়ীর ওপর থেকে পাড়াটাকে একেবারে অন্যরকম মনে হচ্ছিল। অনেক শান্ত আর সবুজ। রাস্তার ধারে গাছগুলো আমি লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তারা যে সংখ্যায় এত ভাবতে পারিনি। রেলিং-এ হেলান দিয়ে নিচের উঠোনটা দেখলাম। মনে পড়ে গেল সেই সিঁড়ির ধাপে মৈত্রেয়ীর হাসিতে ফেটে পড়া চেহারাটা। মনে হচ্ছিল সেই দিনটা কত তাড়াতাড়ি পুরনো হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন ইতিমধ্যে কতদিন পার হয়ে গেছে, মৈত্রেয়ী এসে আমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছে তার বাবা কখন ফিরবেন।

আমি ওকে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল তার মধ্যে রয়েছে এক আদিম শিশু। তার কথাবার্তা আমায় আকর্ষণ করতো। তার অসংলগ্ন চিন্তাধারা, সরলতা আমায় মুগ্ধ করতো। নিজেকে এক সভ্য স্বাভাবিক মানুষ মনে হোত যে কি না একজন প্রায় অসভ্য মানবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে।

—আমার বোন ভাল ইংরাজী বলতে পারে না কিন্তু জানেন ও সব বুঝতে পারে।

মৈত্রেয়ী নিজের বোনকে বারান্দায় এনে বললো।

—ও আপনাকে একটা গল্প বলতে বলছে। আমিও গল্প শুনতে খুব ভালবাসি।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন। অনেক দিন বাদে সুন্দর আকাশের নিচে আমি। প্রকৃতির পটপরিবর্তন হচ্ছে। সামনে দুটি মেয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে। পুরো ব্যাপারটা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। যেন হঠাৎই পর্দা সরে গিয়ে নতুন ভালোলাগা একটা দৃশ্য উন্মোচিত হয়েছে। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর আমি বললাম—অনেক কাল গল্প পড়িনি। তাছাড়া আর একটা অসুবিধাও আছে, তা হোল আমি ভাল গল্প বলতে পারিনা। ভাল করে গল্প বলতে পারার জন্য প্রতিভা থাকা দরকার। সকলের তা থাকে না।

ওরা খুব দুঃখিত হোল। ওদের দুঃখ এত সরল আর স্বতঃস্ফূর্ত ছিল যে আমার ভীষণ খারাপ লাগল। ভাল হোক খারাপ হোক, ছোটবেলায় পড়া যা হোক কিছু মনে করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই মনে আসছিল না। নিজেকে এত বোকা আর অসহায় লাগছিল! পেরো, গ্রিম্, অ্যাণ্ডারসন, হার্ণ এদের লালটুপি পরা ছেলে, ঘুমন্ত অরণ্যের সুন্দরী, ম্যাজিক ঐশ্বর্য এই সব গল্পগুলোর কথা মনে পড়লো। কিন্তু ওই গল্পগুলো এত খেলো মনে হোল যে, যদি শোনাতে গিয়ে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাই বাদ দিলাম। ইচ্ছে করছিল ওদের এমন কিছু বলি যার মধ্যে দুঃসাহসিকতা, ঘটনার জটিলতা, এসব আছে। মনে হচ্ছিল এক কথায় এমন কিছু বলি যা একজন বুদ্ধিমান কালচার্ড সপ্রতিভ যুবকের বলার পক্ষে উপযুক্ত আর যা ওদের মনে প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থাৎ যা মৈত্রেয়ীকেও আনন্দ দিতে পারে, কৌতুহলী করতে পারে। দুঃখের বিষয় এইরকম কিছু আমার মনে পড়লো না।

—আমাদের গাছের একটা গল্প বলুন। ছোট বোন ছবি বললো। আমার মনে হোল যা হোক কিছু বানিয়ে বলি। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলতে শুরু করলাম :

—অনেক অনেক দিন আগে এক দেশে একটা গাছ ছিল যার শিকড়ের নিচে ছিল গুপ্তধন। একদিন এক নাইট—। ছবি জিজ্ঞাসা করলো—নাইট কি?

মৈত্রেয়ী তাকে বাংলায় বোঝাতে লাগল 'নাইট' কাদের বলে আর সেই সুযোগে আমি গল্পের বাকী অংশ ভাবতে শুরু করলাম।

—এক রাত্রে নাইট স্বপ্ন দেখলো যে এক পরী তাকে ওই ধন রত্নের জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছে।

ওই রকম বোকা বোকা একটা গল্প বলতে গিয়ে এত লজ্জা হচ্ছিল, যে আমার আর ওদের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না, তাই অকারণে জুতোর ফিতে

বাঁধতে শ্রু করলাম। যাই হোক এক সময় গল্প আবার শ্রু করতেই হোল ;

—একটা ম্যাজিক আয়নার সাহায্যে নাইট সেই সব ধন-রত্ন উম্ধার করতে গেল।

গল্পটা আর বাড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল মৈত্রেয়ী সবই ব্ঝতে পারছে। কিন্তু চোখ তুলে দেখলাম, সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার গল্প শ্নছে…।

—কিন্তু নাইট দার্ণ বিস্ময়ে দেখলো ধন রত্নের ওপর একটা জ্যান্ত ড্রাগন বসে পাহারা দিচ্ছে ; তার ম্খ দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগ্ন…। এই জায়গাটা বলতে গিয়ে লজ্জায় আমার ম্খ লাল হয়ে গেল।

—তখন…

হঠাৎ ছবি বাধা দিয়ে বললো—কিন্তু গাছটা ? গাছটা কি বললো ?

—গাছটা তো এমনি সাধারণ গাছ, যাদ্ গাছ নয় তাই সে কথা বলতে পারত না।

—কিন্তু কথা বলার জন্য তাকে যাদ্ গাছই বা হতে হবে কেন ?

আমি মহা বেকায়দায় পড়লাম। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম।

—যাইহোক গল্পটা এরকমই। এই গাছটা কথা বলতে পারতো না। ওর প্রাণ ছিলনা।

ছবি মহা উত্তেজিত হয়ে দিদিকে কিছ্ বলতে শ্রু করলো। এই প্রথম বাংলা না জানার জন্য আমার প্রচণ্ড দ্ঃখ হোল। স্রেলা, মিষ্টি গলায় ছবি কিছ্ বলছিল।

—ও কি বলছে ?

—ও জিজ্ঞাসা করছে যে ওর গাছেরও প্রাণ আছে কিনা ? আমি বললাম সব গাছেরই প্রাণ আছে।

—ওর একটা গাছ আছে নাকি ?

—বড় গাছ নয়। উদ্যানের ধারে হয়েছে একটা চারা গাছ যার ডালপালা গ্লো দেখবেন রেলিং অবধি উঠে এসেছে—ছবি রোজ গাছকে খেতে দেয়—নিজে যা যা খায় সব।

যাক কথাবার্তা অন্য দিকে ঘ্রে যেতে প্রাণে বাঁচলাম।

—ভাল ছবি, কিন্তু তোমার গাছ তো পিঠে খায়না।

ছবি আমার মন্তব্য শ্নে বললো—

ও, হ্যাঁ, ওটা আমিই খাই।

পাইপ খাবার ভান করে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিলাম। কাঠের হুড়কো দিয়ে দরজা বন্ধ করে ডায়েরিতে পুরো ঘটনাটা টুকে রাখতে শুরু করলাম আমার সঙ্গে মৈত্রেয়ীর কথাগুলো। তার চিন্তার রূপ। বারান্দায় আমার গল্প বলার কণ্টকর অভিজ্ঞতা। ছবির মানসিকতা—যে নিজের সঙ্গে জড় পদার্থের অনুভূতির পার্থক্য করে না, যেমন সে গাছকে পিঠে খেতে দেয় কারণ সে নিজে পিঠে খায়, যদিও সে ভালভাবেই জানে গাছটা পিঠে খায় না। ভারী মজা লাগছিল আমার।

একদিন সন্ধ্যাবেলা অফিসের কাজ শেষ হয়েছে। মিঃ সেন আমাকে ছেড়ে দেবার সময় কাঁধে হাত রেখে বললেন,—অ্যালেন আমার স্ত্রী তোমার প্রতি বাস্তবিকই সহানুভূতিশীলা। তুমি আমাদের বাড়ীকে নিজের বাড়ী বলেই মনে করবে। তুমি যখন যে ঘরে ইচ্ছে যেতে পার। আমরা গোঁড়া নই আর বাড়ীতে পর্দাপ্রথাও নেই। তোমার যখন যা দরকার আমার স্ত্রীকে বলবে অথবা মৈত্রেয়ীকে বলবে—আশা করি মৈত্রেয়ী তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পেরেছে। তাঁর কথায় আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। মিঃ সেন বললেন—কিছু মনে কোরনা। বিদেশী তুমি, ভারতীয় যুবতীরা এখনো সেকেলে রক্ষণশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই ওদের ব্যবহারে কিছু মনে কোর না।

এরপর তিনি মৈত্রেয়ীর ব্যাপারে দুটো সত্য ঘটনা শোনালেন। একদিন তাদের ইটালীয়ান কনসুলেটে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। তখন বৃষ্টি পড়ছিল। কনসুলেট থেকে বেরিয়ে আসার সময় গাড়ীতে ওঠার জন্য কন্‌সাল তাদের সাহায্য করছিলেন। একটাই মাত্র ছাতা ছিল, মৈত্রেয়ী যাতে ভিজে না যায়, তাকে ভালভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য কন্‌সাল ছাতার তলায় তার হাতটা ধরলেন। মৈত্রেয়ী এত ভয় পেয়ে গেল যে ছাতা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে মোটরে উঠল। আর সেই যে কান্না তার শুরু হোল, আলিপুরের বাড়ীতে মা'র কোলে আশ্রয় নেবার আগে আর তা থামল না। ঘটনাটা বছর খানেক আগেকার। তখন মৈত্রেয়ীর প্রায় বছর পনের বয়স, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করে বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

আর একটি ঘটনা হোল, একটি ইওরোপীয় পরিবারের নিমন্ত্রণে তারা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। অন্ধকারে বক্সে, একটি ফুলবাবু তার হাত ধরার চেষ্টা করায় মৈত্রেয়ী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বেশ জোরেই বলেছিল,

যাতে আশেপাশের সবাই শুনতে পায়, "আপনার মুখে জুতোর বাড়ী মারব।" সমস্ত বক্সের লোকেরা উঠে দাঁড়াল। এক মহিলা (কলকাতার সবাই তাঁকে চেনে বলে নামটা গোপন রাখা হোল) মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন. মৈত্রেয়ী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমার কি ইংরাজী ব্যাকরণে ভুল হয়েছে ?"

কাহিনী দুটো শুনে আমার খুব হাসি পেয়েছিল। কিন্তু নিজের মনে একটা প্রশ্ন আমি এড়িয়ে যেতে পারিনি। প্রশ্ন এই যে, মৈত্রেয়ী বাস্তবিকই কি অত সরল, না কি রসিকতা দিয়ে তার স্বভাব ঢাকতে চেষ্টা করছে আর আমাদের নিয়ে খেলা করছে! এই ধারণা আমাকে তাড়া করে ফিরত যখনই বাড়ীতে আশপাশের ঘর থেকে তার জোরে কথা বলার আওয়াজ বা উচ্চস্বরে হাসির শব্দ ভেসে আসত।

মিঃ সেন একদিন বলেছিলেন—জান অ্যালেন, ও কবিতা লেখে ?

—আমার কেমন সন্দেহ ছিল……

এই ঘটনা জানার পর মৈত্রেয়ীর প্রতি আমার কিছুটা বিরাগ এল। এদেশের সব মেয়েরাই কবিতা লেখে, সব প্রতিভাবান সন্তানরা কবিতা চর্চা করেন আর মিঃ সেন তাঁর মেয়েকে প্রতিভাময়ী বলে মনে করেন—এ চিন্তাগুলো আমার বিরক্তি উৎপাদন করত। যতবার তিনি আমাকে বলতেন : "ওর প্রতিভা আছে!" সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রেয়ীকে আমার সম্পূর্ণ নির্বোধ মনে হোত।

মিঃ সেন আমাকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখে আরো বলতেন—হ্যাঁ ও দার্শনিক কবিতা লেখে। ওর কবিতার প্রশংসা করেছেন অনেকেই।

আমি নিরাসক্তভাবে মন্তব্য করলাম—তাই নাকি!

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে সন্ধ্যাবেলা মৈত্রেয়ীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলাম। ও লাইব্রেরী থেকে একটা বই হাতে করে বেরোচ্ছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহাসের সুরে বললাম– জানতাম না আপনি কবি।

সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল এবং দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

—যাই হোক কবিতা লেখা কোন দোষের জিনিস নয়। তবে দেখতে হবে সে কবিতা যেন সুন্দর হয়—

—আপনি কি করে জানলেন আমার কবিতা সুন্দর নয় ?

—সৌন্দর্য সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। তবে কবিতায় দর্শন—জীবনকে জানার অভিজ্ঞতা আপনার যথেষ্ট আছে কি ?

সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর হাসিতে ফেটে পড়ল। তার হাসিতে

ছিল এক অদ্ভুত আন্তরিকতা। লজ্জা জড়ানো এক আশ্চর্য ভঙ্গিতে সে তার হাত দুটো রেখেছিল নিজের বুকের উপর।

—হাসছেন কেন?

হঠাৎ সে থেমে গেল।

—কেন, হাসতে বারণ আছে?

—না তা নয়, যার যা ভাল লাগবে সে তাই করবে। কিন্তু শুধু আপনার হাসির কারণটা যদি বলে দেন……

—বাবা আপনাকে খুব বুদ্ধিমান বলে মনে করেন…

আমি অধৈর্য হবার ভঙ্গি করলাম।

—ভয় হয় ভুল করে আপনার রাগের কারণ না হই।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রেয়ীর মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল, যা দেখে আমার আনন্দ হোল।

—আমি রাগ করলে আপনার ভয় হবার কারণ কি?

—কারণ আপনি আমাদের অতিথি। ভগবানই অতিথিকে পাঠিয়ে দেন।

—আর অতিথি যদি খারাপ লোক হয়?

যেমন ভাবে মানুষ একটা শিশুকে প্রশ্ন করে সেইভাবেই তাকে প্রশ্ন করছিলাম। যদিও তার মুখ ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে উঠছিল।

—ভগবান তাকে ডেকে নেন—

—কোন ভগবান?

—তার ভগবান।

—কেমন করে? প্রত্যেকটা লোকেরই আলাদা ভগবান আছে?

শেষ কথাগুলোর ওপর আমি বেশ জোর দিয়েছিলাম। সে আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তারপর চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবল। এই চোখ ছিল কোমল, স্নেহময় নতুন অভিব্যক্তি পূর্ণ।

—আমার কি কিছু ভুল হোল?

—আমি কি করে জানব? আমি তো আপনার মতো দার্শনিক নই।

—দেখুন আমি ভালবাসি স্বপ্ন দেখতে, চিন্তা করতে, কবিতা লিখতে……

"এই হোল দর্শন শাস্ত্র!" আমি নিজের মনে ভাবলাম এবং হাসলাম।

—আমি অনেকদিন বাঁচতে চাই। আমি রবি ঠাকুরের মতো বৃদ্ধ হতে চাই। যখন মানুষ বুড়ো হয় তখন সে বেশী ভালবাসতে পারে আর কম দুঃখ পায়।

এইভাবে কথা বলার জন্য লজ্জায় সে লাল হয়ে গেল। চলে যাবার জন্য উদ্যত হোল। কিন্তু কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে বোধ হয় বুঝতে পারছিল যে তার কথাগুলো আমি কি ভাবে নেব এটা খুবই অনিশ্চিত। সে বিষয়ান্তরে গেল। বলল—মা খুব চিন্তা করছেন। তিনি একটা বইতে পড়েছেন যে ইওরোপে রোজ লোকে সূপ খায়। আমাদের বাড়ীতে তো সূপ হয় না, সেজন্য আপনি রোগা হয়ে যাচ্ছেন।

তাকে শান্ত করার জন্য বললাম—আমি সূপ ভালবাসি না। শুনে মৈত্রেয়ীর চোখ আনন্দে চক্‌চক্‌ করে উঠল।

—কিন্তু আপনারা এত ভাবছেন কেন? এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা?

—মা ভাবছেন, তাই—

সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মত পাল্টালো। তার এই অকস্মাৎ নীরবতা আমাকে খুব বেকায়দায় ফেলল। মনে হোল আমি কি তার মনে আঘাত দিয়ে ফেললাম!

—যদি কোনো অন্যায় করে থাকি ক্ষমা করবেন। আপনাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় তা আমার এখনো ভাল করে রপ্ত হয়নি।

সে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঘুরে দাঁড়াল। যে ভাবে আমার দিকে তাকাল, সে দৃষ্টির অর্থ আমি বোঝাতে পারব না। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

—কেন আমার কাছে ক্ষমা চাইছেন? আমায় কষ্ট দিতে চান?

আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললাম—না না সেরকম কোন ব্যাপার না। আমি ভাবছিলাম আপনি রেগে গেছেন, তাই······

—কি করে একজন পুরুষমানুষ একটা মেয়ের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে?

—যখন সে ভুল করে······এটাই আমার অভ্যাস।

—একজন যুবতী মেয়ের কাছে?

—এমনকি একটা শিশুর কাছেও। এটা ঠিক যে······

—সব ইওরোপীয়ানরাই কি এরকম?

আমি ইতস্ততঃ করছিলাম।

—প্রকৃত সভ্য ইওরোপীয়ানরা······

চোখ বন্ধ করে গভীর ভাবে সে কিছু চিন্তা করল তারপরে শব্দ করে হেসে উঠল আর সেই আগেকার ভঙ্গীতেই তার দুহাত বুকের কাছে চেপে ধরল।

—বোধহয় বিদেশীরা নিজেদের মধ্যেই ক্ষমা ভিক্ষা করে থাকেন। কিন্তু

আমার কাছেও কেউ ক্ষমা চাইতে পারে……!

—নিশ্চয় পারে।

—ছবির কাছে ?

—নিশ্চয়।

—ছবি তো আমার চাইতেও কালো।

—এটা সত্য কথা না।

মৈত্রেয়ীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

না সত্যি কথাই। আমি আর মা, ছবি আর বাবার চাইতে ফর্সা। আপনি লক্ষ্য করেন নি ?

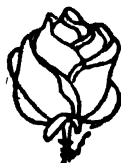
—তাই না হয় হোল। তাতে কি যায় আসে ?

—কেন ? দুটো একই মনে করেন ? যেহেতু ছবি বেশী কালো আপনি জানেন না, ছবির বিয়ে দিতে খুবই অসুবিধে হবে এবং অনেক টাকা লাগবে।

এই কথাগুলো বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। লজ্জায় সে লাল হয়ে গিয়েছিল। আমি নিজেও খুব বিচলিত বোধ করছিলাম। হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য আমি লুসিয়্যার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম একজন যুবতী মেয়ের পক্ষে ওই জাতীয় বেচাকেনার গল্প করতে কতখানি খারাপ লাগতে পারে। দুজনের পক্ষেই সৌভাগ্য বশতঃ মিসেস সেন সেই সময় তাকে ওপর থেকে ডাকলেন। মৈত্রেয়ী বইটা বগলে করে চেঁচিয়ে "যাচ্ছি" বলে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে গেল।

আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। আজকের অভিজ্ঞতা মুগ্ধ হয়ে ভাবছিলাম। রাতের খাবার সময় এগিয়ে আসছিল। আমি হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। বাঙালীদের রীতি অনুযায়ী রাতের খাওয়া হোত খুব দেরীতে, রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে। তারপরে-আমরা শুতে যেতাম।

ডায়েরিতে কিছু লেখার জন্য সেটা খুললাম। ফাউণ্টেন পেনটি শূন্যে ধরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর ডায়েরিটা বন্ধ করতে করতে মনে মনে বললাম—"বোকামো।"



একথা স্পষ্ট ভাবেই স্বীকার করতে চাই, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রথম দিকে আমি কখনোই ভালবাসার কথা চিন্তা করিনি। বরং বলা চলে তার রহস্যময় প্রকৃতির প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ছিলাম। অবসরে তার কথা চিন্তা করতাম ডায়েরিতে একগাদা ঘটনা ও আলোচনা লিপিবদ্ধ করতাম। মাঝে মাঝে যে অসুবিধায় পড়তাম না, তা নয়—তার চোখ দুটির অদ্ভুত সৌন্দর্য, অবোধ্য তার উত্তরগুলো, তার বাঁধভাঙা হাসি। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে ঐ যুবতীর প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিল না। তার চলাফেরার মধ্যেই এক মোহিনী আহ্বানের শক্তি লুকিয়ে ছিল। আলিপুরে থাকাকালীন দিনগুলো আমার কেমন অলৌকিক আর অবাস্তব বলে মনে হত। এত তাড়াতাড়ি এবং এত স্বাধীনতা নিয়ে একটা বিদেশী পরিবারের মধ্যে আমি প্রবেশ করতে পেরেছিলাম যা বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। কোন কোন দিন, মনে মনে আমার প্রকৃত জীবনে, অর্থাৎ আমাদের নিজের জীবনে যখন ফিরে যেতাম তখন এই ভারতীয় স্বপ্নের জগৎ যে অলৌকিক বলে মনে হোত, তাতে সন্দেহ নেই। আশ্চর্য পরিবর্তন আমার! পুরোন জগতের কিছুই আর ভাল লাগতো না। না জীবন ধারা না বন্ধু বান্ধব। এখন আর পদার্থবিদ্যা, গণিতবিদ্যা আমাকে আকর্ষণ করে না। পলিটিকাল ইকনমি, ইতিহাস, আর কিছু রোমান্টিক উপন্যাস এগুলোর মধ্যেই আমি ডুব দিয়ে ছিলাম।

একদিন মৈত্রেয়ী এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি বাঙলা শিখতে চাই কি না। তাহলে সে রাজী আছে আমার শিক্ষক হতে। এর আগে চলতি কথপোকথনের দু একটা বই আমি পড়েছিলাম। মৈত্রেয়ী যখন চিৎকার করে কিছু বলে অথবা যখন রেগে যায় তখনকার ভাষা—এসব বোঝবার জন্যে গোপনে গোপনে এই বই আমি পড়তাম। আমি জানতাম 'যাচ্ছি' মানে 'আমি যাইতেছি' এবং আর একটা শব্দ যা প্রায়ই শুনতাম, 'কি ভীষণ' যার অর্থ হোল 'ইহা অস্বাভাবিক'। আমার ছোট্ট বই এর বেশী কিছু আমাকে শেখাতে পারেনি তাই মৈত্রেয়ী যখন আমাকে বাঙলা শেখাবার প্রস্তাব দিল আমি রাজী হয়ে গেলাম। শর্ত ছিল, পরিবর্তে তাকে ফরাসী শেখাতে হবে।

সেইদিন থেকেই দুপুরে খাবারের অব্যবহিত পরেই আমার শোবার ঘরে আমাদের পাঠ শুরু হোল। প্রথমে আমি বলেছিলাম লাইব্রেরীতেই বসব কিন্তু

মিঃ সেন নিজেই আমার শোবার ঘরে আমাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে বললেন যাতে আরো নিরুপদ্রবে পড়াশোনা হয়। নরেন্দ্র সেনের তার মেয়ের সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব স্থাপন এবং মিসেস সেনের এই উদার মনোভাব আমি ভাল চোখে দেখিনি। কখনো কখনো এরকম সন্দেহ যে মনে বাসা বাঁধেনি তা নয় যে আমার আশ্রয়দাতারা আমার সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছেন না তো! যদিও এটা ছিল, অসম্ভব, কারণ এতে তাদের সবাইকেই জাত খোয়াতে হোত।

প্রথম প্রথম টেবিলে মৈত্রেয়ীর থেকে অনেক দূরে বসতাম আমি। সে আমার অসুবিধাগুলো শান্ত ভাবে বোঝবার চেষ্টা করতো কিন্তু ভাল বুঝতে না পারার ফলে কয়েকদিন পর থেকে সে আমার কাছ ঘেঁষে বসতে শুরু করল। কিন্তু এত নিবিষ্টমনে আমাকে লক্ষ্য করত যে আমি পাঠে মন দিতে পারতাম না। 'হ্যাঁ', 'না' ছোট ছোট মন্তব্যে পাঠের দায় সেরে তাকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করতাম। আর সমর্পন করতাম আমার নিজস্ব দৃষ্টির কাছে। এক তরল ইচ্ছাশক্তি চোখ দিয়ে নির্গত হোত যার সঙ্গে প্রকৃত দৃষ্টির কোন সম্পর্ক নেই। আমি নিবিষ্ট মনে তার মুখ দেখতাম যা ছাঁচে ঢালা সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে একটি মৌলিক বিদ্রোহ। মৈত্রেয়ীর তিনটে ছবি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু সেগুলোর মধ্যে মৈত্রেয়ীকে চিনতে পারতাম না।

তারপরে আমাদের চুক্তি অনুযায়ী ফরাসী ভাষার পাঠ আরম্ভ হোল। আমি তাকে বর্ণমালা ও বিভিন্ন সর্বনাম সম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল—আমি একটি যুবতী মেয়ে: এটা ফরাসীতে কি হবে? আমি লিখিয়ে দিলাম। সে খুব খুশী হয়ে বারবার বলতে লাগল, "জ্য সুই য়ুন্ জ্যেন ফিই।"

আশ্চর্যজনক ভাবে সঠিক উচ্চারণ করছিল। কিন্তু তাকে শেখানো আমার মাঠে মারা গেল। পড়াতে গেলেই সে আমায় থামিয়ে দিত এবং বিভিন্ন শব্দের ফরাসী বলার জন্য অনুরোধ করত। যে গুলোর মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই।

—আপনি অনুবাদ করে দিন আমি বার বার বলে অভ্যেস করে নিই।

এই প্রস্তাব সে করল।

ভাষা শেখার এক সুন্দর পদ্ধতি সে আবিষ্কার করল। আমাদের মধ্যে কৌতূহলী কথাবার্তার বিনিময় শুরু হোল। মৈত্রেয়ী বারবারই আমায় জিজ্ঞাসা

করত আমি বিশ্বস্তভাবে অনুবাদ করছি কি না।

কিছুদিন যাবার পর সে আমার দিকে ওই অদ্ভুতভাবে তাকান বন্ধ করলো। কথা প্রধানতঃ আমিই বলতাম। আর সেই সময় সে তার নোট বুকে হিজি বিজি কেটে চলতো। একদিন আমি যখন পড়াচ্ছিলাম, সে তার নোট বুকে অন্তত বার দশেক রবীন্দ্রনাথের নাম সই করল তারপর একটা ফুল আঁকতে শুরু করলো। ফুল আঁকা শেষ হলে সে লিখতে শুরু করলো 'কালকুতা' 'জরেগ্রেত', 'পুরকোয়া'; তারপর আবার বাংলায় বানিয়ে বানিয়ে কবিতা লিখতে লাগল। আমার মনে হচ্ছিল একটা অপরিচিত লোকের সামনে বসে আছি। বিরক্তি হচ্ছিল কিন্তু তাকে থামাতে আমার সাহস হোল না। এই রকম চলছিল। হঠাৎই একদিন আমায় প্রশ্ন করলো—যখন আপনি পড়ান তখন যে আমি লিখি, এটা আপনি পছন্দ করেননা না? একথাটা বলতে এত ইতস্ততঃ করছেন কেন?

তাড়াতাড়ি করে কি উত্তর দিয়েছিলাম তা আর আজ মনে নেই, তবে আমি যে একটু রেগে গিয়েছিলাম তা আমি স্বীকার করছি। আমি পড়ান চালিয়ে গেলাম। এবং যথারীতি সেও লিখে চললো, 'ইল্ এ তার', 'ইল্ এ ত্রো তার', 'ম্যা ইল্ নে পা ত্র্যা তার্'। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—এগুলোর মানে কি?

—এই একটু মজা করছিলাম। বলে সে প্রত্যেক শব্দ মুছে ফেলে সেই জায়গায় একটা করে ফুল আঁকতে শুরু করলো। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল, বললাম—তুমি ছবিকে ফরাসী শেখাও না!

বলেই আমি হেসে ফেললাম। আমার হাসিতে সেও মজা পেল।

—আপনার মনে হচ্ছে আমি পারবো না? আমি আপনার চাইতে অনেক ভাল পড়াতে পারবো।

সে গম্ভীর হয়ে এই কথাগুলো বললো আর তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় দেখতে লাগল। আমি মৈত্রেয়ীর এই চেহারা কখনও দেখিনি। এক আশ্চর্য আনন্দে আমি কেঁপে উঠছিলাম। সেদিন তাকে পরিপূর্ণভাবে একটা নারী বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ও একান্ত আপনার। এই সময়গুলোতে আমি ওকে যতটুকু বুঝতে পারতাম যত গভীরভাবে বুঝতে পারতাম, যখন ও অন্যের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকত সে সময়গুলোতে ওকে ততখানিই অবোধ্য মনে হোত।

আমি ফরাসীতে কি উত্তর দিয়েছিলাম মনে নেই। অনুবাদ করে তার

গুরুত্ব কমাতেও আমার ইচ্ছে হয়নি কিন্তু ও লজ্জায় লাল হয়ে গেল এবং আমায় অনুরোধ করলো বাক্যটা আবার উচ্চারণ করতে। বাক্যটার প্রতিটি শব্দ ও মুখস্থ করে নিয়ে টেবিল থেকে অভিধান নিয়ে সেই রহস্যময় বাক্যের অর্থ উদ্ধারে প্রবৃত্ত হোল। কিছুই বুঝতে না পেরে সে প্রচণ্ড রেগে গেল।

—তুমি মজা করতে জাননা?

—পড়ানোব সময় মজা করতে আমি ভালবাসি না।

যতখানি রাগের ভান এবং উচ্চারণে রুক্ষতা আনার দরকার ছিল ততখানি বোধহয় হয়নি। ও কি বুঝল তা ওই জানে। খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে কি ভাবল। ভাবার সময় ওর অভ্যেসই ছিল চোখ বন্ধ করা। আমি দেখলাম সারা মুখের তুলনায় চোখের পাতাগুলো একটু ফর্সা তার ওপর হাল্কা একটা বেগুনি আভা। হঠাৎই সে উঠে পড়ে বললো—দেখি কিছু চিঠি পত্র এলো কিনা।

আমি ওর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভাবছিলাম ও কি কিছুই শিখবে না বলে মনস্থ করেছে। মিঃ সেনের কাছে আমি কি কৈফিয়ৎ দেবো! মৈত্রেয়ী তাড়াতাড়িই ফিরে এলো হাতে চিঠির বদলে দু গুচ্ছ ফুল। বারান্দার লতানে গাছেরই ফুল বলে মনে হোল।

—পড়া কি আবার শুরু করবো? 'জে সুই য়ুন্ জ্যেন ফিই'।

—ভাল হয়েছে। এ বাক্যটা তুমি আগেই শিখেছ। তারপর?

—'জাপ্‌প্রাঁ ল' ফ্রাঁসে'।

—কিন্তু এগুলো তো গত সপ্তাহে পড়ানো শেষ হয়ে গেছে।

—সেই গাড়ীতে যে মেয়েটাকে দেখেছিলাম, ওকেও কি ফরাসী শেখান? হঠাৎই সে প্রশ্ন করে বসলো একটু ভয়ে ভয়ে।

—আরে দূর! ও একটা গবেট। ওকে পাঁচ বছর ধরে পড়ালেও···

—পাঁচ বছর পরে আপনার বয়স কত হবে?

—তিরিশ একত্রিশ হবে।

—অর্দ্ধেকেরও কম বয়স। যেন সে তার নিজের জন্যই বললো।

সে তার খাতার ওপর ঝুঁকে আবার লিখতে শুরু করলো রবীন্দ্রনাথের নাম বাংলায় এবং ফরাসীতে। বাস্তবিকই আমার রাগ হচ্ছিল। একজন সত্তর-বছরের বৃদ্ধের জন্য তার আদিখ্যেতা দেখে। এক সময় গারতির কথা বলেছিলাম যাতে ও একটু ঈর্ষান্বিতা হয়। কিন্তু এখন ও গারতিকে ভুলেই গেছে···আমার

মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ও আসলে যতটা সরল তার চাইতে বেশী সরল সেজে ও আমাকেই পরিহাস করতে চাইছে। একটা বছর 'ষোল'র বাচ্চা মেয়ে আমাকে ঠাট্টা করছে এটা ভেবে আমার অসহ্য লাগছিল বিশেষ করে যার প্রতি আমার এতটুকু দুর্বলতা ছিল না।

আমি ওর উপস্থিতিতে আনন্দ পেতাম নিশ্চয়ই কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। বিভিন্ন ব্যাপারে ও আমার ভুল ধরার চেষ্টা করতো, বিচিত্র হাস্যকর জীব রূপে প্রতিপন্ন করতে চাইতো। এসব ছেলেমানুষীর জন্য ওর উপস্থিতির অন্যরকম কোন গুরুত্ব আমার কাছে ছিলনা। আমিই ছিলাম প্রথম যুবক যাকে মৈত্রেয়ী অত কাছ থেকে দেখার, চেনার সুযোগ পেয়েছিল। আমাকে মোহিত করার জন্য ওর চেষ্টার কোন ঘাটতি ছিল না। এই শেষের ব্যাপারটাই আমাকে মজা দিত খুব। আমি জানতাম এই খেলার ব্যাপারটা খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বেশী দূর গড়ানো থেকে নিজেকে বিরত রাখার, উর্ধে রাখার প্রতিরোধ ক্ষমতা আমার আছে। সমকালীন ডায়েরির পাতা গুলো থেকে এ তথ্যই আমি পাচ্ছি যে, নিজের মানসিকতার ওপর তীক্ষ্ণ নজরও আমি রেখেছিলাম। অবশ্যই আমার নজর ছিল মৈত্রেয়ীর কলা কৌশলেরও ওপর। যেদিন থেকে সে তার প্রাথমিক ভীরুতা কাটিয়ে উঠে স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে বক্‌বক্‌ করতে আরম্ভ করলো তখন থেকেই মনে হোত ও একটা নাটক করছে।

সে উঠে পড়ল। বই গুছিয়ে হাতে নিয়ে দু গুচ্ছ ফুলের একটা টেবিলে রেখে অপরটি হাতে নিয়ে যেতে উদ্যত হোল। যে ফুলের গুচ্ছটা টেবিলে পড়ে ছিল সেটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম—একটা পড়ে রইল যে।

মৈত্রেয়ী ফিরে এসে অপর ফুলের গুচ্ছটাও হাতে নিল এবং পড়ানোর জন্য আমায় ধন্যবাদ জানালো এবং দরজার দিকে রওনা দিল। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সে ফিরে তাকাল, ঘরে দাঁড়িয়ে ফুলের গুচ্ছটা আমার টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল। অপর গুচ্ছটা নিজের মাথার চুলে পরে নিতে নিতে সে দৌড়ে পালাল। ঘরে বসে বসে শুনতে পাচ্ছিলাম সে এক সঙ্গে দুটো করে সিঁড়ির ধাপ লাফ দিতে দিতে দোতলায় উঠে যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ লেগে গেল ঘটনাটাকে কি ভাবে গ্রহণ করবো এই ভাবতে ভাবতে। এটা কি 'প্রেমের' প্রস্তাব! ডায়েরি খুলে একটা 'নির্বোধ মন্তব্যের সঙ্গে পুরো ঘটনাটা লিপিবদ্ধ করলাম।

পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে মৈত্রেয়ী জানতে চাইল ফুলটা নিয়ে আমি

কি করলাম ?

—ফুলটা শুখনো করতে দিয়েছি।

কথাটা বানিয়ে বললাম। আমি চাইছিলাম যে ও মনে করুক আমার হৃদয়ে প্রেমের কবিতা লেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। সে দুঃখের সঙ্গে বললো যে তার নিজের ফুলটা দোতলায় ওঠার সময় সিঁড়িতে পড়ে গেছে।

অফিসে সারা দিন ধরে এই অবাস্তব, অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক ঘটনার জের চলল। একটা আশ্চর্য স্বপ্নময় অনুভূতি আমায় ঘিরে রইল। বাড়ি ফিরে এসে আয়নায় মুখ দেখে জীবনে প্রথম নিজেকে সুন্দর দেখতে না হওয়ার জন্য দুঃখ হোল। হঠাৎই আমার সেই পুরনো অনমনায় মনোভাব ফিরে এল এবং অভিনেতাদের মতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁদরামো করার জন্য প্রচণ্ড হাসি পেল। হাসতে হাসতে আমি বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ভাবতে ভাল লাগছিল যে আমার এখনও কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যায়নি। ঠিক সেই সময় মৈত্রেয়ী বইপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল।

—আজ আমার পড়া আছে কি ?

আমি বাংলায় উত্তর দিলাম এবং আমরা বাংলায়ই কথা বলতে শুরু করলাম। বাংলা আমি দ্রুত শিখে নিচ্ছিলাম। এর আর একটা কারণও অবশ্য ছিল। প্রতিদিন বিকেলে আমি ছবির সঙ্গে লেখা পড়া করতাম। মৈত্রেয়ী আমায় অনুবাদের জন্য একটা বাক্য দিল। বাক্যটা যখন লিখে দিচ্ছিলাম তখন সে জিজ্ঞাসা করলো—ফুলটা কোথায় রেখেছেন ?

—শুখোবার জন্য চাপা দিয়ে রেখেছি।

—দেখি একবার।

কি উত্তর দেবো ভেবে পেলাম না। কারণ আসলে ফুলটা আমি জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম। আমি রহস্য মাখিয়ে বললাম—সেটা পাচ্ছি না।

—কেন, খুব গোপন জায়গায় রেখেছেন বুঝি ?

মনে হচ্ছিল ধরা পড়ে গেছি। চুপ করে রইলাম যাতে ওর বিভ্রান্তি না কাটে। আমাদের লেখা পড়া শেষ হোল। মৈত্রেয়ী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি উঠে গিয়ে বারান্দা থেকে এক গোছা ফুল তুলে নিয়ে এলাম। ফুলটাকে পাইপের গরম ছাই দিয়ে শুখিয়ে নিয়ে কাগজ চাপা দিয়ে রেখে দিলাম। তখন ফুলটাকে দেখে আর বোঝা যাচ্ছিলনা যে সেটা সদ্য তোলা। খাবার টেবিলে আবার দেখা ওর সঙ্গে। ওর চোখ গুলোয় আশ্চর্য উজ্জ্বলতা ছিল। অনবরত

হাসছিল মৈত্রেয়ী।

—মা বলছেন আমরা ছেলেমানুষী করছি।

ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। মিসেস সেনের দিকে তাকালাম। উনি শান্ত ভাবে হাসলেন। হঠাৎই আমার খুব খারাপ লাগলো। আমাদের ভাবপ্রবণ ছেলেমানুষী গুলোও উৎসাহিত করা হচ্ছে দেখে মনে হোল যেন কোন ষড়যন্ত্র চলছে আমার বিরুদ্ধে যাতে আমি মৈত্রেয়ীর প্রেমে পড়ি।

এখন যেন বুঝতে পারছি কেন মৈত্রেয়ীকে আমার ঘরে পড়তে পাঠান হয়েছিল, কেন মিঃ সেন ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়বার ছল করে সব সময় শোবার ঘরের দিকে রওনা দিতেন, কেন দোতলার কোন লোক আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে নিচে নামতো না। আমায় মনে—হচ্ছিল আমি তক্ষুনি ওই বাড়ি ছেড়ে পালাই।

খাবার টেবিলে আমরা তিনজন। মিঃ সেনের বন্ধুর বাড়ী ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে। মাথা নিচু করে আমি খেয়ে যেতে থাকলাম। মৈত্রেয়ী অনর্গল বকে যেতে থাকল। লক্ষ্য করতাম তার মুখ তার বাবা বা অন্য কোন অপরিচিত লোকের সামনেই শুধু বন্ধ হোত। বাড়ির সকলের সামনেই সে বকে যেত। আমায় বললো—মা বলছিলেন আপনার শরীরের কোন উন্নতি হচ্ছেনা। সন্ধ্যাবেলা একটু বেড়ালে ভাল হোত।

জানিনা কি নিরাসক্তি আর অবজ্ঞা নিয়ে উত্তর দিয়েছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস সেন যেন সেটা বুঝতে পারলেন। তিনি বাংলায় মেয়েকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সঠিক বুঝতে পারলাম না। মৈত্রেয়ী মুখ গম্ভীর করে কি উত্তর দিল আর টেবিলের তলায় পা দিয়ে আমার পায়ের পাতায় চাপ দিল। আমি কিছুই না দেখা, না বোঝার ভান করে বসে রইলাম। কিন্তু সত্যিই খুব খারাপ লাগছিল মিসেস সেনকে ক্ষুন্ন হতে দেখে। ওনাকে আমি আপন মায়ের মত দেখতাম। খাওয়ার পর মৈত্রেয়ী বারান্দার শেষ অবধি আমার সঙ্গে এল। রাত্রে আমার শোবার ঘরের কাছে কখনও সে আসেনি।

—দয়া করে আমার ফুলটা ফেরৎ দিন।

আমি বুঝতে পারছিলাম সে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ব্যাকরণেও একটা ভুল করলো। আমি ওকে ঘরে ঢুকতে বলার সাহস পাইনি কিন্তু ওই-ই চৌকাঠ পেরিয়ে প্রথম সুযোগেই ঘরে চলে এল। আমি ওকে শুখনো ফুলটা দেখালাম।

—এই যে ফুলটা। আমার কাছে রাখি? আমি চাই ওটা আমার কাছেই

থাকুক।

হয়ত বাক্যগুলো হুবহু এরকমই ছিলনা। রহস্যময় অস্পষ্ট এক অনুভূতি তখন আমায় আচ্ছন্ন করে ছিল। সে ফুলটা হাতে তুলে নিল, দেখলো তারপর দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হেসে ফেললো। হাসতে হাসতেই বললো,

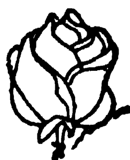
—এটা সেই ফুলটা নয়।

—কেন?

আমার ধরা পড়া ফ্যাকাশে মুখ সে বিজয়িনীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলো।

—ওটাতে আমার একটা চুল জড়ানো ছিল।

সে দিন মধ্যরাত্রিতে ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পাচ্ছিলাম মৈত্রেয়ীর ঘর থেকে গুন গুন করে গানের সুর ভেসে আসছে।



একদিন নরেন্দ্র সেন আমার দরজায় টোকা দিলেন। দরজা খুলে দেখি তিনি তাঁর মেয়ের সঙ্গে কোথাও বেরোচ্ছেন। মৈত্রেয়ীর পরণে ছিল কফি রঙের একটা শাড়ী, গায়ে মেরুণ রঙের শাল আর জরির কাজ করা চটি ছিল পায়ে। মিঃ সেন জানালেন মৈত্রেয়ী সৌন্দর্যের মূল সূত্রের ওপর বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে। আমি প্রশংসা করার ভঙ্গী নিয়ে হাসলাম। মৈত্রেয়ী উদাসীনভাবে তার শাল নিয়ে পাকাচ্ছিল। তার হাতে কাগজে পাকান তার বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি। সে এত সুন্দর করে চুল বেঁধে ছিল যে তার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রচণ্ড উগ্র সুগন্ধ ব্যবহার করেছিল সে। সেই গন্ধে আমার সারা ঘর ভরে গেল। আমি তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালাম আর বললাম সে যেন একদম ঘাবড়িয়ে না যায়। নরেন্দ্র সেন একটু গর্ব করেই বললেন,—ও এই প্রথম বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে না। দুঃখের বিষয় তুমি যথেষ্ট ভাল বাংলা জাননা, নইলে তুমিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারতে……।

আমি ঘরে ফিরে এলাম। কি রকম একটা অস্থিরতা আমায় গ্রাস করছিল। মৈত্রেয়ীর রচিত আপন রূপই আমাকে আবিষ্ট করে তুলছিল। কোনদিন ভাবতেও পারিনি ওই বাচ্চা মেয়েটা আমাকে এইরকম অস্থিরতার মধ্যে ফেলতে পারে। বার বার বিড় বিড় করছিলাম আপন মনে সৌন্দর্যের মূল সূত্র, মূল উপাদান।

ঘণ্টা দুয়েক পরে বাইরে তাদের গাড়ী থামবার আওয়াজ পেলাম। মৈত্রেয়ীকে সম্বর্ধনা দেবো বলে আমি এগিয়ে গিয়ে বারান্দায় চলে এলাম। মৈত্রেয়ীকে যেন একটু বিষণ্ণ মনে হোল।

—কেমন হোল বক্তৃতা ?

—সবাই ঠিক বুঝতে পারেনি। আসলে ব্যাপারটা নিয়ে ও এত গভীর ভাবে ভেবেছে যে··। সৃষ্টি অনুভূতি, সৌন্দর্যের গভীরে প্রবেশ—এসব সাধারণ মানের শ্রোতারা বোধহয় ঠিক বুঝতে পারেনি।

আমার মনে হচ্ছিল মৈত্রেয়ী বোধহয় একটু দাঁড়াতে চায়। আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়। কিন্তু সে কোন কথা না বলে সোজা দোতলায় উঠে গেল। তার শোবার ঘরের জানালা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি আর আমার ঘরে থাকতে পারলাম না। পার্ক থেকে একটু ঘুরে আসবো ভেবে

বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। হঠাৎই দোতলার বারান্দা থেকে আমাকে উদ্দেশ করে ডাক শুনলাম—কোথায় যাচ্ছেন?

মৈত্রেয়ী বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। পরণে বাড়ীতে পরার ধবধবে পরিস্কার শাড়ী, কাঁধের ওপর খোলা চুল, নগ্ন বাহু। উত্তর দিলাম—একটু বেরোচ্ছি, তামাক কিনে ফিরব।

—আপনি একটা চাকর পাঠিয়ে দিতে পারেন।

—আর আমি? আমি কি করব?

—আপনি যদি চান ওপরে চলে আসুন। আমরা দুজনে গল্প করবো, আমার ঘরে বসে। এই আহ্বান আমাকে উত্তেজিত করলো। আমি স্বচ্ছন্দে সব ঘরেই যাতায়াত করতাম, কিন্তু কখনই মৈত্রেয়ীর শোবার ঘরে ঢুকিনি। এক নিমেষে আমি তার ঘরে পেঁাছে গেলাম। সে দরজায় দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার মুখ ছিল ক্লান্ত, দৃষ্টি অনুনয় মাখান আর তার ঠোঁট দুটো ছিল অসম্ভব লাল। পরে জেনেছিলাম বাঙালী মেয়েরা তাদের সৌন্দর্য চর্চার রীতি হিসেবেই, কোথাও বাইরে যাবার আগে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে নেয়।

—দয়া করে জুতো খুলুন।

ঘরের সংলগ্ন বারান্দার কাছে নিচু মোড়ার ওপর সে আমায় বসতে বললো। ঘরটা আয়তনে আমার ঘরের মতই বড়। সংলগ্ন ঘেরা বারান্দায় একটা লেখার টেবিল। ঘরে একটা খাট, একটা চেয়ার আর দুটো মোড়া ছিল। দেওয়ালে কোন ছবি নেই, কোন আলমারী বা আয়নাও ছিল না ঘরে।

—এই খাটে ছবি শোয়।

—আর আপনি?

—ঐ মাদুরে।

খাটের তলায় গোটান একটা পাতলা মাদুর সে আমায় দেখাল। আমি অবাক হয়ে গেলাম। সেই মুহূর্তে তাকে আমার মানুষ নয় দেবী মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন কোন সন্ন্যাসিনীর সামনে বসে রয়েছি। হাসতে হাসতে সে বললো—প্রায়ই ওই বারান্দায় গিয়েও শুই। দারুণ হাওয়া দেয় আর নিচের রাস্তার শব্দ শোনা যায়।

সেটা এমনই একটা রাস্তা যেখান দিয়ে রাত আটটার পর লোক চলাচল করেনা। সেটাকে ঠিক রাস্তা বলা চলে না, বরং পার্কের একটা কোণের দিক

বললে ঠিক বলা হয়।

—ওই রাস্তার শব্দ শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। কোথায় গেছে ওই রাস্তা কে জানে।

আমি মজা করে বললাম—ক্লাইভ স্ট্রীটে।

—আর ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে?

—গঙ্গায়।

—তারপর?

—তারপর সমুদ্রে।

সে যেন একটু কেঁপে উঠলো। আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো—আমি যখন ছোট ছিলাম, ছবির চাইতেও ছোট, তখন আমরা প্রতি গ্রীষ্মকালে পুরী যেতাম। ওখানে আমার ঠাকুরদার একটা হোটেল ছিল। পুরীর সমুদ্রের মতো বড় বড় ঢেউ আর কোথাও নেই। এই বাড়ির মত উঁচু উঁচু ঢেউ।

আমি কল্পনা করছিলাম দৈত্যের মত সেই বিশাল বিশাল ঢেউ এর দিবে মুখ করে দাঁড়িয়ে মৈত্রেয়ী সৌন্দর্যের মূল সূত্র সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছে। আমি হাসি চাপতে পারলাম না।

—হাসছেন কেন?

—বাড়ির মত বড় ঢেউ? একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

—এই জন্য? আমার ঠাকুরদা হলে আরও বাড়িয়ে বলতেন। জানেন ওনার এগারটা সন্তান ছিল! আমার দিক থেকে সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তাবে কোনভাবে আঘাত দিয়ে ফেলেছি মনে করে আমি ক্ষমা চাইলাম।

—প্রয়োজন নেই। প্রথমবারই আপনি এত ভাল করে ক্ষমা চেয়ে রেখেছেন আর প্রয়োজন নেই। নিজের ওপর ভরসা নেই? আচ্ছা আপনার সুইনবার্ণবে কেমন লাগে?

আমি তার অনর্গল কথা বলার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। উত্তরে বললাঃ সুইনবার্ণ পড়তে আমার ভাল লাগত। টেবিলের ওপর থেকে একটা পুরনো ব: নিয়ে এল সে। পেনসিলে দাগ দেওয়া Anactoria-র একটি অংশ দেখা: আমায়। আমি জোরে জোরে সেই অংশটা পাঠ করলাম। কবিতার কয়ে: লাইন পড়ার পর আমার হাত থেকে বইটা সে কেড়ে নিল।

—সম্ভবতঃ সুইনবার্ণকে বাদ দিয়ে অন্য কবিদের ভাল লাগে আপনার।

লজ্জিত হয়ে স্বীকার করলাম এবং আমার পছন্দে গুরুত্ব দেবার জন্য বললাম যে, সমস্ত Neo-romantic কবিতা ভ্যালেরির যে কোন একটা সাধারণ কবিতার কাছে তুচ্ছ। সে খুব মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শুনছিল আর এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু যেই সে দেখল আমি দার্শনিক কবিতার সমালোচনা করছি এবং যে সমস্ত কবিতা আলোচনার বিষয়বস্তু হতে চলেছে সেগুলো দুটো পৃথক ভাষারও বটে সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—আপনি চা খাবেন ?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে করিডর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নিচে রান্না ঘরে কিছু নির্দেশ পাঠাল।

—আশা করি আমার প্যান্টের ওপর চা ওল্টাবেন না। যে দশা করে ছিলেন গত বছর লুসিয়্যাঁর।

আমার মনে হোল সে হেসে উঠবে এখুনি। কিন্তু তা না করে সে বাংলায় বিস্ময়সূচক কোন শব্দ উচ্চারণ করে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। তার পায়ের শব্দ থেকে বুঝতে পারছিলাম সে তার বাবার অফিস ঘরে গেছে। আবার দৌড়েই সে ফিরে এল। হাতে দুখানা বই।

—এ দুটো আজ সকালেই ফ্রান্স থেকে এসেছে। সারা দিন আমার বক্তৃতা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে ভুলেই গিয়েছিলাম।

বই দুটো ছিল লুসিয়্যাঁর **'L' Inde avec les Anglais'** এর দুটো কপি। কাকে পাঠিয়েছে কিছুই লেখা ছিল না।

—একটা বই আপনার। মৈত্রেয়ী আমায় বললো।

—এখন আমরা কি করব আন্দাজ করতে পারছেন ? আমার বইটা আমি আপনাকে উপহার দেবো আর আপনারটা আপনি আমায় দেবেন।

মৈত্রেয়ী আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। সে ধৈর্য রাখতে পারছিল না। দৌড়ে কালি কলম আনতে ছুটলো। আমি কি লিখছি দেখার আগ্রহ তার চোখে মুখে উজ্জ্বল হয়ে ছিল। আমি লিখলাম 'আমার বান্ধবী মৈত্রেয়ী দেবীকে একজন ছাত্র ও শিক্ষক'। আমার লেখা দেখে সে আদৌ সন্তুষ্ট হোল না। তার হাতের বইটাতে সে লিখল "আমার বন্ধুকে"।

—যদি এই বইটা কেউ চুরি করে নেয় তখন ?

—কি আসে যায় ? সেই চোর হয়ত পরে আমার বন্ধুও হতে পারে।

হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে সে বসলো মাদুরে। বসে বসে আমার চা খাওয়া

দেখতে থাকলো।

ক্রমশঃ রাত হয়ে এল। রাস্তার আলোয় তালগাছের নীল ছায়া ঘরের মধ্যে পড়েছিল। মনে মনে ভাবছিলাম বাড়ির অন্য বাসিন্দারা সব গেল কোথায়? কারো কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছিলাম না। এটা কি ষড়যন্ত্র? মৈত্রেয়ীর শোবার ঘরে আমাদের একদম একলা ছেড়ে দেওয়া? ঘরে আলো বলতে ছিল রাস্তার ল্যাম্পের আলো যেটুকু এসে পড়েছে।

—আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম। খুব মিষ্টি গলায় বললো সে।

—আজ থেকে কেন? আমরা তো অনেক দিন আগে থেকেই বন্ধু হয়েছি।

সে বললো যদি আমরা বন্ধু হয়ে থাকি নিশ্চই সে আমাকে তার দুঃখের কথা জানাতে পারবে। আমি তার সব কিছুই আমাকে বলতে বললাম। কিন্তু মৈত্রেয়ী চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমিও নীরবে তাকে দেখতে থাকলাম।

—আজকের কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ আসেন নি।

কথাটা শুনে খারাপ লাগল। ইচ্ছে করছিল ওকে একটু অপমান করে রাগিয়ে দিতে। বলতে ইচ্ছে করছিল আমাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা ওর উচিৎ হয়নি।

রাগাবার জন্যই বললাম—আপনি রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসেন?

হঠাৎই মৈত্রেয়ী পাল্টে গেল। আমার দিকে ফিরে তিক্ত কণ্ঠে বললো—আপনি অন্ধকারে যুবতী মেয়েদের সঙ্গে একলা বসে থাকতে ভালবাসেন তাই না?

—এই ঘটনা এই প্রথম ঘটলো। কিছু না ভেবেই আমি উত্তর দিলাম। হঠাৎই সে খুব ক্লান্তির ভঙ্গিতে পা ছড়িয়ে বসলো।

—আমি এখন একলা থাকতে চাই।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে জুতো পরলাম। নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিরক্তিতে মনটা ভরে গেল।

নিচের সমস্ত আলোগুলো জ্বালা হয়ে গিয়েছে তখন। সেই সময়কার ডায়েরির কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি:

"ওকে যে আমার প্রত্যেক দিনই সুন্দর লাগে তা নয়। ওর সৌন্দর্য ক্ল্যাসিকাল সংগীতের মত। ওর মুখ দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় যে কোন মুহূর্তে ও বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। ভাষার যাদুতে ও মুগ্ধ হয় সবচেয়ে বেশী। মনে পড়ে কতদিন সারারাত্রি ওর কথা ভেবেছি। একটা ছায়াচিত্রের মত ওর

শরীর নীল রেশমের শাড়ীতে। ওর মাথার চুল। পারস্যবাসীরা সাহিত্যে মেয়েদের মাথার চুলের সঙ্গে সাপের তুলনা করে।

আমি জানি না কি ঘটতে যাচ্ছে। আমি কি ভুলে যাবো!

"হে ভগবান কবে শান্তি পাবো?"

"ছবি একটা গল্প লিখেছে। মৈত্রেয়ী ছাদে বসে সেটা অনুবাদ করে আমায় শোনাল। গল্প বলতে বলতে ও খুব হাসছিল। গল্পটা এই রকম: এক রাজার একটা ছেলে ছিল। তার নাম ছিল ফুল। একদিন ফুল ঘোড়ায় চেপে অরণ্যে প্রবেশ করলো। সে বনে প্রবেশ করা মাত্র সেখানকার সব কিছু ফুলে পরিণত হোল। শুধু রাজপুত্র আর তার ঘোড়া যেমন ছিল তেমনই রইল। প্রাসাদে ফিরে সে তার বাবাকে এই আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করলো। রাজা এই ঘটনা বিশ্বাস করলেন না। রাজপুত্রকে মিথ্যা কথা বলার জন্য প্রচণ্ড বকলেন। তিনি রাজপণ্ডিতদের বললেন শাস্ত্রে মিথ্যা কথা বললে কি হয় সে সব পড়ে শোনাতে আর মিথ্যা কথা বললে কি শাস্তি হয় সে সবের কিংবদন্তী শোনাতে। রাজপুত্র দৃঢ়তার সঙ্গে বললো যে সে সত্য কথাই বলছে। রাজা সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজপুত্রের কথা যাচাই করার জন্য সেই অরণ্যে গেলেন। সেখানে যাওয়া মাত্র সকলেই ফুল হয়ে গেল। একটা দিন কেটে গেল। তারপর রাজপুত্র সমস্ত শাস্ত্রের বই এনে তার পাতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিতে লাগল। সেই টুকরো পাতার স্পর্শে রাজা এবং তাঁর সৈন্যদল পুনরায় বেঁচে উঠলো।

"নরেন্দ্র সেনের চরিত্রের খারাপ দিক গুলো হোল তিনি অকারণ গর্বে অহংকারী। নিজেকে উনি প্রতিভাবান বলে মনে করেন। সে দিন রাত্রে ছাদে গিয়ে এক পাশে আমায় ডেকে নিয়ে প্যারিসের বারবণিতাদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে চাইলেন। শুনলাম তিনি রক্তচাপ আর চোখের চিকিৎসার জন্য ফ্রান্সে যাচ্ছেন কয়েক মাসের জন্য।

"মিঃ সেনের মামাতো ভাই শিবু দিল্লী থেকে এখানে এসেছে। ওখানে সে একটা সেকেণ্ডারি স্কুলের শিক্ষক। গভর্নমেণ্ট কমার্শিয়াল স্কুলে লেকচারারের একটা চাকরী পেয়েছে। ছোটোখাটো রোগা ছেলেটির বয়স আন্দাজ তিরিশ হবে। সেই শিবু থাকে আমার পাশের ঘরটায়। খুব তাড়াতাড়িই আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। সে বললো ইচ্ছে করেই সে কলকাতায় চাকরী নিয়েছে বিয়ে করার জন্য। তার নিজের বিয়ের ইচ্ছে নেই কিন্তু মিঃ সেন নাছোড়বান্দা।

শিবুর খুব ভয় করছে। চোখ বন্ধ করে ইংরাজী বলে শিবু আর খুব হাসতে পারে।

"চারদিন ধরে শিবুর বিয়ের উৎসব আজ শেষ হোল। কনের নাম রমু (কালো, সাধারণ দেখতে একটা মেয়ে কিন্তু মনে হয় খুব সহানুভূতিশীলা হবে)। কনের বাড়ি আর এখানে খুব বিরাট ভোজ হোল। বাস্তবিকই যাবতীয় আয়োজন মিঃ সেনই করলেন। আমার কাছে তিনি আবার অভিযোগও করলেন যে শিবু বড্ড অস্থিরমতি, যে কোন সিদ্ধান্ত তাড়াহুড়ো করে নেয় ইত্যাদি। শিবু তাঁকে এত ভক্তি করে যে সে তার নববিবাহিত বধুর কৌমার্য'ও দান করতে প্রস্তুত। ভারতে নাকি এরকম প্রথা এখনও কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে যে শিষ্য তার বিয়ের প্রথম রাতটা গুরুকে নিবেদন করে। শিবু আমাকে বহুবার বলেছে যে মিঃ সেন তার শুধু মামাতো ভাইই নন, তিনি ওর গুরু'ও।

"আমি 'দু' জায়গাতেই গিয়েছিলাম। সর্বদা প্রথম সারিতে আমায় জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। রেশমের ভারতীয় পোশাক পরেছিলাম। আমায় চমৎকার দেখাচ্ছিল একথা বলতেই হবে। অনুষ্ঠানে নিজে থেকে আমার উদ্যোগ, পরিশ্রম এবং সবার সঙ্গে বাংলায় কথা বলার প্রচেষ্টার জন্যে আমি সবারই প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, এখানকার সামাজিক আচার অনুষ্ঠান আমাকে মোহিত করেছে। কোন কিছুতেই ভারতীয়দের বন্ধুত্বের প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়। মিসেস সেনের স্নেহ, মায়া, মমতা এত প্রগাঢ় আর এত পবিত্র যে তার তুলনা হয় না। সবাই ওনাকে মা সম্বোধন করে কথা বলছিল। আমি নিঃসন্দেহ যে ভারতবর্ষ ছাড়া মাতৃ হৃদয়ের এই তীব্র আবেগ অন্য কোথাও নেই।

"মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে এই রকম কল্পনা আমায় ভীষণ আনন্দ দিত। যতদিন উৎসব চলছিল, আমি সর্বদা ওর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতাম। বাগদত্তা···প্রেমিকা! কিন্তু কখনই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম ওকে যতটা সুন্দরী ভাবছি আসলে ও অতটা সুন্দরী নয়। ওর কোমর শরীরের তুলনায় বেশী ভারী ইত্যাদি খুঁত ধরে নিজেকে ওর চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এইভাবে আরও বেশী করে ওর চিন্তায় ডুবতাম।

আমাকে নিয়ে যে সমস্ত বক্রোক্তি আমার কানে আসছিল সেগুলো ঠাট্টা না সত্যি বুঝতে পারছিলাম না; একটা প্রায় অসম্ভব এবং গুরুত্বপূর্ণ বিবাহের

প্রস্তাবই ছিল এটার কারণ। প্রস্তাবটা মিঃ সেনেরই এবং একদিন খাবার টেবিলে শ্ুনলাম মিসেস সেনও তা সমর্থন করেছেন। এটাকে ষড়যন্ত্র বলা যাবে কি? বিয়েকে এঁরা পবিত্র, সামাজিক, ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। আমাকেও এঁরা আন্তরিকভাবে গভীর স্নেহ করেন ভালবাসেন। মৈত্রেয়ীও এখন উচ্চ বাঙালী সমাজে যথেষ্ট পরিচিতা। অনায়াসে আমার চাইতে অনেক ভাল স্বামী সে পেতে পারে।

"মৈত্রেয়ীকে বিয়ে করলে আমার কি হবে? এটা কি সম্ভব যে আমি আমার বিবেচনাবোধ, স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি সব হারাবো এবং ফাঁদে পড়ে সম্মতি জানাব? সন্দেহ নেই এযাবৎ যে কজন যুবতীকে আমি দেখেছি তাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী সব দিক থেকেই আকর্ষণীয়া। কিন্তু এটাও স্থির নিশ্চিত যে আমি ওকে বিয়ে করতে পারিনা।

কি করব আমি? এক পরাধীন জীবন যাপন করবো অতঃপর? জীবন স্থির হয়ে যাবে এক বৃত্তে! আমার দেশভ্রমণ···বাকি আর সব!

"এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। এক স্বপ্নের রাজ্যে কিছুক্ষণ বিচরণ। গত রাত্রে বাসর ঘরে যুবতী মেয়েরা গান গাইছিল। ফুলে ফুলে ঢাকা সেই ঘর। মৈত্রেয়ী এই উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে রচিত তার কবিতা পাঠ করলো।

"এখানে যে কথা বলবো অর্থাৎ যে মানসিক অবস্থার কথা বলবো সেই অবস্থা আমাকে মারাত্মকভাবে বিব্রত করছিল। যদি কোনভাবে বুঝতে পারতাম বা সন্দেহ করতাম যে লোকে আমার সম্ভাব্য বিয়ে নিয়ে আলোচনা করছে, সঙ্গে সঙ্গেই এক পাশবিক আবেগে আমি মথিত হতাম। ইন্দ্রিয়গুলো শরীর মন উভয়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতো। আমার ভবিষ্যত সম্পর্কে ভয় করছে। বিপদও কি আমাকে উত্তেজিত করছে? আমি বিয়ে করবো না এটা স্পষ্ট করে বলতে আমার সাহস হচ্ছে না; আবার এ জায়গা ছেড়ে চলেও যেতে পারছি না, সেটা অশালীনতা হবে বলে।

"একটা নৈতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলার চেষ্টা করছি, যদিও আমার রিপু আমায় উত্তেজিত করছে।

"আজ শিবু মেয়ে মহলে আমার কথা ফাস করে দিয়েছে। আমি ওকে বিশ্বাস করে বলেছিলাম যে আমি বিয়ে করতে চাইনা, আর কোন দিন বিয়ে করবও না। মনে হলো একথা শুনে মৈত্রেয়ী দারুণ রেগে গেছে আর এক অদ্ভুত

ক্রোধের দৃষ্টি নিয়ে আমায় দেখছে। আমার কাছে আর পড়তে আসছে না। কাজ থেকে আমি ফিরে আসার পর রোজ যেমন আমার সঙ্গে গল্প করতো তাও বন্ধ করে দিয়েছে। মিসেস সেনও কেমন যেন হয়ে গেছেন! আমার প্রতি যে উষ্ণ স্নেহ ও'র ছিল তাতে যেন ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। ওদের এই হঠাৎ পরিবর্তন আমাকে অস্থির করে তুলছে।

আজ বিকেলে যখন ঘরে বসে লিখছি তখন মৈত্রেয়ীর প্রচণ্ড হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। বাচ্চুর কোন ঠাট্টা ইয়ার্কিতে বোধহয় সে হাসছে। আমার প্রচণ্ড ঈর্ষা হোল। বাচ্চু মৈত্রেয়ীদের একজন গরীব আত্মীয়। এই যুবকটি শিবুর বিয়ে উপলক্ষ্যে আলিপুরের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। এখানে তার ভূমিকা ছিল প্রায় বাড়ীর জঞ্জালের মতো। বারান্দার সামনের দিকে একটা ঘরে সে থাকতো। মৈত্রেয়ীর হাসির শব্দে ঈর্ষায়, রাগে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হোল। আমার লজ্জা হোল আপন অবস্থা উপলব্ধি করে।

"মৈত্রেয়ী আমার মধ্যে কোন স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে পারেনি একথা সত্য। অপর দিকে তার বাড়ীর লোকজনদের স্নেহ-ভালবাসা আমি উপলব্ধি করেছিলাম। ভয় আমার হয়েছিল যখন বিয়ের ফাঁদ পাতার পূর্বাভাস পেয়েছিলাম, আর আজ যখন আমি ঘোষণা করে দিলাম যে আমি বিয়ে করবো না অবিবাহিত থাকব তখন অবস্থাটা আর আগের মত রইল না। মৈত্রেয়ীর নিস্পৃহতা আমার মধ্যে ভালবাসা জাগিয়ে তুলল। আজ আমি ঈর্ষাপরায়ণ আবার ভবিষ্যত সম্পর্কেও ভীত। আমার একাকীত্ব আমায় কষ্ট দিচ্ছে।

"কি অদ্ভুত পরিবর্তন! এখন আমি খেতে বসি শিবু আর মিঃ সেনের সঙ্গে। মেয়েরা পরে খায়। মৈত্রেয়ীর অভাবে খাবার টেবিল থেকে সব আনন্দ চলে গেছে। অফিসের কাজ পরিদর্শনের জন্য দক্ষিণ বঙ্গে চলে যেতে চাইলাম। ফেরার পর বাড়ী পাল্টাবার একটা অজুহাত খাড়া করবো। এখানে যা অভিজ্ঞতা হোল আমার তার এখন চূড়ান্ত পর্যায় চলেছে। অভিজ্ঞতার পর্বটা অত্যন্ত দীর্ঘ।

"দুদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে অবিশ্রান্ত। আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। চারদিক জলে ভেসে গেছে। জলে ডোবা রাস্তাগুলো দেখার জন্য আমি বারান্দায় গেলাম। মৈত্রেয়ীকে দেখলাম। দারুণ জমকালো পোশাক—চেরী রঙের ভেলভেট, কালো রঙের সিল্ক। সেও একই দৃশ্য দেখছিল। জানতাম ও বৃষ্টি নিয়েও কবিতা লেখে। হয়ত আজও আমার শোবার ঘরের ওপরে ওর শোবার ঘরে বসে একটা কবিতা লিখেই ও বাইরে এসেছে। খুবই নিস্পৃহ আর ঠাণ্ডা ছিল ওর চাউনি।

অল্প দু একটা কথা হোল।

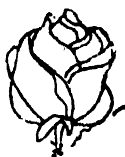
"এ বাড়িতে নিজেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। এইখানেই আমি পেয়েছিলাম সবচেয়ে বেশী স্নেহ, মায়া, মমতা! পেয়েছিলাম আন্তরিকতা যা ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসারী। মনে হচ্ছিল এক জমাট শীতলতা আমাকে ঘিরে ধরছে চারপাশ থেকে। আমার সব স্বতস্ফূর্ততা চলে গেছে। খাবার টেবিলে আমি নীরব; শোবার ঘরে নিজেকে মনে হোত অসুস্থ। মাঝে মধ্যে নিজেই এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারতাম। এক অদ্ভুত উপলব্ধিতে পেঁছিতাম যা এ যাবৎ আমি অনুভব করিনি।

"গতকাল থেকে সম্পর্কটা আবার একটু ভালর পথে। অফিস থেকে ফেরার পথে গাড়ীতে আমি নরেন্দ্র সেনের কাছে শিবুর মন্তব্যের সমালোচনা করেছিলাম। বিয়ে সম্পর্কে আমার ধারণা শিবু যে সঠিক অনুধাবন করতে পারেনি এটাই বলার চেষ্টা করছিলাম। আমি ঠিক জায়গাটাতেই ঘা দিয়েছিলাম। শিবু আমার কথার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিল যে আমি বিবাহ নামক প্রথাটাকেই ঘৃণা করি। তাই আমার চারপাশের লোকেরা যাঁরা এটাকে পবিত্র এবং আবশ্যকীয় সামাজিক কর্ম বলে মনে করেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ বা এটাকে অসমর্থন না জানিয়ে থাকতে পারেন নি। আমার কথাবার্তার পরে বেশ বুঝতে পারছিলাম, যে শীতলতার সৃষ্টি হয়েছিল তা অনেক খানিই কেটে গেল।

"গতকাল আমি মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বললাম স্বাভাবিকভাবে। অনেক দিন বাদে আমরা হাসলাম। লাইব্রেরীতে আজ অনেকক্ষণ গল্প করলাম দুজনে। কার্পেটে বসে শকুন্তলা পড়া হোল। ওর গৃহশিক্ষক এসেছিলেন আর আমি আগে থেকেই পড়ার সময় উপস্থিত থাকার অনুমতি চেয়ে রেখেছিলাম।

"রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে ও একটা কবিতা আবৃত্তি করলো। তারপর নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেল। যাবার আগে বিষণ্ণ সুরে বলে গেল, কবিতাই হচ্ছে তার দিনের শেষ কথা।

"আমি কি মৈত্রেয়ীকে ভালবাসি?



পরবর্তী মাসগুলোর ডায়েরির সংক্ষিপ্তসার :—

"আমরা দুজনে পৌরুষ নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

আলোচ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ওয়াল্ট হুইটম্যান, প্যাপিনি এবং অন্যান্যরা। মৈত্রেয়ীর পড়াশোনা বিশেষ ছিল না কিন্তু ওর আগ্রহ এবং মনোযোগ সে অভাব পূরণ করে দিচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম আমাকে ওর ভাল লাগে। একথা ও স্বীকারও করে ছিল। ও বললো ও আত্মসমর্পন করতে চায় কবির-কল্পনায় আঁকা কোন নায়িকার মতো সমুদ্র সৈকতে, প্রচণ্ড ঝড়ের প্রারম্ভে। সাহিত্য!

মৈত্রেয়ীর প্রতি আমার আসক্তি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল। গ্রাম্য কবিতার মত সরলতা, সহযোগীর আন্তরিকতা এবং এও স্বীকার্য যে এক শারীরিক টানেরও সংমিশ্রণ ছিল সেটা। কার্পেটে বসে পড়াশোনা করার সময় কখনো কখনো আলতো স্পর্শই ভীষণ বিচলিত করতো। অনুভব করতে পারতাম ওর মধ্যেও এক চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ছে। সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে আমরা পরস্পরকে অনেক কথাই বলতে পারতাম। সাহিত্য সাহায্য করছিল আমাদের মনের ভাব প্রকাশে, সরাসরি কোন কথা না বলেই। কখনো কখনো মনে হোত আমরা দুজনেই পরস্পরকে চাই।

পরবর্তী সময়ে যুক্ত টীকা :—

"আমার ধারণা ঠিক নয়। সে সময় মৈত্রেয়ীর প্রেমের গভীরতা সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। খেলার ছলে, মেলামেশার অবাধ স্বাধীনতায় ও মোহ-গ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। দেহজ প্রেম সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না।

ডায়েরির পরবর্তী অধ্যায় :—

"সেদিনটা ছিল আমার প্রথম রাত্রি। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি এগারটা অবধি আমি মৈত্রেয়ীর শোবার ঘরে। আমরা কিছু অনুবাদ করছিলাম এবং কাব্য আলোচনা করছিলাম। রাত্রিতে মিঃ সেন একটা ডিনার পার্টি থেকে ফিরে হঠাৎই আমাদের এ ঘরে এলেন। আমি শান্ত ভাবেই কথা বলতে থাকলাম কিন্তু মৈত্রেয়ীর মুখ চোখ পাল্টে গেল। সে আমার হাত থেকে বইটা তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে মুখের সামনে খুলে ধরলো।

—আমরা বাংলা পড়ছি…

"এই ভাবেই কি ওর মিথ্যা বলা শুরু হয়েছিল?

পরবর্তীকালে যুক্ত টীকা ঃ—

"ব্যাপারটা এরকম ছিল না। আমি ওকে কত ভুল বুঝেছি। ও মিথ্যা বলেনি। কবিতা অনুবাদের জন্য আমি তার ঘরে রয়ে গেছি একথা সে অন্য কেউ হলে হয়ত অনায়াসেই বলতে পারত কিন্তু সহসা বাবাকে দেখে কি করবে, কি বলবে বুঝতে না পেরে আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে নিয়েছিল।

ডায়েরির পরবর্তী অধ্যায় ঃ—

"আজ আমি ওর জন্য পদ্মফুল এনে ছিলাম। তোড়াটা বিরাট ছিল। তোড়াটা হাতে নিতে ওর মুখ ফুলে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আমার হাত ধরে ও আমায় ধন্যবাদ জানাল। স্থির বিশ্বাস হোল যে ও আমায় ভালবাসে। সারাদিন ধরে ও আমার জন্য কবিতা লেখে। আমায় আবৃত্তি করে তা শোনায়। কিন্তু আমি ওকে ভালবাসিনা। খানিকটা বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দ হয় মাত্র। ওর দেহ আর মন আমাকে বিচলিত করে সত্য। ওর চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হোল ঃ আমি রমুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। রমুকে সাবধান করে দিলাম যে, যে সমস্ত কথা আমায় বললো সেগুলো যেন শিবুকে আবার না বলে।

—ও আমার কি করবে?

—আমি ওসব জানিনা। পারিবারিক ঝগড়া সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।

'শিবু ওকে শাস্তি দেবেই, যে ভাবেই হোক', মৈত্রেয়ী জানাল, 'যে ভাবেই হোক' শব্দগুলোর ওপর বিশেষ জোর দিয়ে।

"অতএব, ও জানে? পরে সে বলছিল যে ভালোবাসা আর আবেগপ্রবণ কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে কোন পাগলামি না করে বসে। আমাকে ও অনেক অবিশ্বাস্য গোপন কথা বলছিল। সে সব কথা বন্ধুত্বের প্রাথমিক স্তরেই কি করে বলা সম্ভব বুঝতে পারছিলাম না।

পরবর্তীকালে সংযুক্ত টীকা ঃ—

"মৈত্রেয়ী বাস্তবিকই খেলা করছে। রমু ওকে দাম্পত্য প্রেম কাকে বলে বোঝাচ্ছিল। কতটুকু ও বুঝতে পারছিল জানিনা তবে সফল দাম্পত্য প্রেমের সূত্র গুলো বলতে খুব মজা পেত।

ডায়েরির পরবর্তী অধ্যায় ঃ—

"রমু, শিবু, মৈত্রেয়ী আর আমি পাড়ার একটা সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে

গিয়েছিলাম। হিমাংশু রায়এর একটা ভারতীয় ছবি দেখান হচ্ছিল। মৈত্রেয়ী আর আমি পাশাপাশি বসে ছিলাম। কথা বলছিলাম আর হাসছিলাম আমরা। কিন্তু ছবির পরেই সে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল। অন্ধকার বন্ধ ঘর, ছবির বিষয় না আমার সান্নিধ্য কি যে দায়ী বুঝতে পারলাম না। আমি জানি যে, সে সম্পূর্ণ শুদ্ধ হলেও ভীষণ রকমের ইন্দ্রিয়পরায়ণা। আমার ভারতীয় বন্ধুরা, ভারতীয় নারীদের এই বিস্ময়কর দিক সম্পর্কে জানিয়ে ছিল। একজন অসূর্যম্পশ্যা যুবতী কুমারী মেয়ে তার ফুলশয্যার রাত্রেই নিজেকে এক নিখুঁত দক্ষ প্রেমিকা এবং নিপুণ দেহশিল্পীরূপে প্রকাশ করতে পারে।

"মৈত্রেয়ী ওর প্রথম প্রেমের কথা আমার কাছে প্রকাশ করলো। একটি বাঙালী যুবক, এখন সে ইংল্যাণ্ডে পড়াশোনা করছে। এ থেকে কি এটাই বুঝব যে ও খুবই সাধারণ মাপের ভাবপ্রবণ ব্যক্তিত্ব?

পরবর্তীকালে সংযুক্ত টীকা :—

"ওই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে ও এটাই ব্যক্ত করতে চাইছিল যে ওই ঘটনা ছিল আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগের ঘটনা, যা ও ভুলে যেতে চায়।

ডায়েরির পরবর্তী অধ্যায় :—

"আবার ওর জন্য ফুল এনেছিলাম। ও খুব রেগে গেছে আমার ওপর। কারণ ফুল শুধু ওর জন্যই আনিনা, মিসেস সেন এবং অন্যান্যদেরও দিই। মনে হচ্ছে শিবু কিছু সন্দেহ করছে। যখনই আমরা একা হলাম সঙ্গে সঙ্গে শিবু আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়াল। আমাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে বলা সত্ত্বেও শিবু ওখানে থাকার জন্য জেদ করতে লাগলো।

"মিঃ সেন আর আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে ও'র ফ্রান্স যাওয়া পিছিয়ে গেছে। এটা কি আমার ভুল না উনি সত্যিই মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ভাবছেন? ফেরবার পথে যখন গাড়ীতে বসে আমি আদৌ মৈত্রেয়ীকে ভালোবাসি কি না ভাবছি, তখনও আমাদের ফুলশয্যার ছবি আমার চিন্তা ভাবনাকে এলোমেলো করে দিল। নিজের ওপর বিরক্তি আসছিল।

"একটা কৌশল অবলম্বন করলাম। ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এড়িয়ে চললাম। যেন আমার ভয় করছে, কি হবে; যেন আমি ওর প্রেমে পাগল এবং ভীত। আজ সকালে ও আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রায় জোর করে আমার ঘরে এসে ছিল। একজন ভারতীয় যুবতীর এ হেন আচরণ বোধ হয় এই

প্রশ্রয়। জানিনা কোথায় এর শেষ হবে! ও আমাকে বিচলিত করে, মোহগ্রস্থ করে কিন্তু তবু ওকে আমি ভালবাসতে পারলাম না। শুধুই খেলা করে যাচ্ছি।

"অদ্ভুত ওলট পালট করা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। বেশী দূরে যাওয়া আমার ভুল হয়েছে। সরলতার ভান করা আরও বেশী করে ভুল। ভেবেছিলাম ভারতীয় নারীর হৃদয় জয় করার সঠিক রাস্তাটাই ধরেছি। কিন্তু ও কেবলমাত্র এক ভারতীয় নারীই নয় ওর মধ্যে রয়েছে এক সহজাত বোধশক্তি যা কাজে পর্যবসিত করার জন্য ওর ছিল অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি। পুরুষ নারীর পূজো করবে এটা ও একেবারেই পছন্দ করতো না। এটাকে সে অমার্জিত এবং কুরুচির পরিচায়ক বলে মনে করতো। ভীষণ বিদ্রূপ করতো ও এ ধরণের ঘটনার কথা শুনলে। সে স্বপ্ন দেখতো একজন পুরুষের যে নিম্নস্তরের ভাবপ্রবণতা দমন করতে সমর্থ। আমার অবস্থান কি ওকে হতাশ করছিল···!

"বাঃ বেশ ভাল। এই যদি হয় তো আমিও আমার কৌশল পাল্টাব। আমাদের আগের কথাবার্তাতেই এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে আমি উন্মুক্তভাবেই সব কথা বলতে পারি। ও কখন আসবে, আবার কখন আমার ঘরে বসে দুজনে গল্প করতে পারব এই সব ভেবে পাগলের মত অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। আমার ব্যবহারে ওর প্রতিক্রিয়াগুলো আমি নজর করবো। আমি প্রথমেই জানাবো যে ভালবাসা পাবার কোন আগ্রহই আমার নেই। আমি জানি ও আমাকে ভালবাসে। ও ওটা লুকোতে পারেনা। আমি জানি ও ক্রমশঃ আমার কাছে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে! চব্বিশ ঘণ্টা যদি আমরা একলা থাকতে পারি, আমি নিঃসন্দেহ যে ও আমার কাছে আত্মসমর্পন করবে।

"হায় ভগবান, ও কেন আমায় অপমান করে! কেন ও বললো যে গতানুগতিক প্রেমকে ও ঘৃণা করে।

"অন্য কোন নারী আমাকে এতখানি বিচলিত কোন দিন করতে পারেনি। এই গরমের মাস গুলোতে কাজের চাপের পর আমার ইন্দ্রিয়দমন আমায় পীড়া দেয়। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা আমায় ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয়। এই বিয়ে হতে চলেছে, এটা আমি জানি। প্রতিদিন নতুন নতুন প্রমাণ আমার কাছে এসে হাজির হয়! মিসেস সেন নিজের ছেলের মত আমায় স্নেহ-মমতা দিয়ে আগলে রাখেন। মিঃ সেন আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন "আমার ছেলে।"

"গতকাল রাত্রিতে খাবার টেবিলে মিসেস সেন আমায় বকলেন—তাঁকে এখনও 'মাদাম' বলে সম্বোধন করার জন্য! এখনও ভারতীয় রীতি অনুযায়ী তাঁকে 'মা' বলে ডাকতে পারছি না কেন জিজ্ঞাসা করলেন। তার সন্ন্যাসিনীর মতো প্রশান্তভাব আমাকে প্রভাবিত করে। তাঁর সরলতা আমায় মুগ্ধ করে। আমি তাঁকে ভালোবাসি।

ঠাট্টা দিয়ে আমায় আক্রমণ করা হোল। শিবু চায় আমি ওকে 'মামা' আর রমুকে 'মামী' বলে ডাকি, যদিও রমুর বয়স এখন সতেরোও হয়নি। খুব মজা পেলাম।

"মৈত্রেয়ীকে নিয়ে সমস্যা: সামান্য কারণেই আমরা রেগে যাই। এই জাতীয় ঝগড়া দিনে অন্ততঃ দুবার হবেই। সে আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করে যে সমস্ত উপায়ে সেগুলোর সঙ্গে সহানুভূতি মমতা ছাড়া শারীরিক ছোঁয়াও থাকে! বাকী সময় আমার কাটে কাজ নিয়ে বিরক্তিতে। আশা করি একদিন আমাদের এই আবেগ সর্বস্ব গোপন বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হোলনা। রাগ ভেঙে যায় বন্ধুত্ব জোড়া দেবার জন্য আমি ওকে খুঁজি। আবার ওই আগে থেকে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আমাদের খেলা আবার শুরু হয়। মনে হচ্ছে নিজেকে বেশী দিন আর শাসনে রাখতে পারব না।

আজ ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছিলাম। আমার শোবার ঘরে আমরা একাই ছিলাম। ওকে একবার জড়িয়ে ধরার প্রচণ্ড ইচ্ছে করছিল। উভয়েই আমরা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। অনেক কষ্টে ইচ্ছা দমন করে ওর হাতে শুধু একটা আলতো করে কামড় দিলাম। আমি নিজের কাছে নিজেই একটা ভয়ের বস্তু হয়ে উঠছি।

পরবর্তী কালে সংযুক্ত টীকা:—

"আমিই ভুল করেছিলাম। মৈত্রেয়ী এতটুকুও উত্তেজিত হয়নি। ও আমার মনোভাব বুঝেই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। ও শুধুই মজা করতে চেয়েছিল তার বেশী কিছু নয়। আমিই উল্টোপাল্টা ভেবে নিয়েছিলাম।

ডায়েরির পরবর্তী অধ্যায়:—

মৈত্রেয়ীর মতো এই রকম অসাধারণ মেয়ে খুব কমই হয়। বিয়ের পর কি ও আর পাঁচজনের মত সাধারণ হয়ে পড়বে না?

"একদিন বিকেলে মৈত্রেয়ী আমার ঘরে এল। ওর গায়ে ছিল রাজপুতানার একটা পোষাক। সেই পোষাকে ওকে প্রায় নগ্ন দেখাচ্ছিল। স্বচ্ছ কাপড়ের

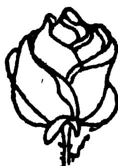
নিচে ওর বাদামী রঙের বুকের অল্প দেখা যাচ্ছিল। ওর গায়ের রঙের চেয়ে ওই অংশ ঈষৎ ফর্সা। আমি ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল নিশ্চয় মিঃ সেন বাইরে গেছেন আর ও এই সুযোগে ইচ্ছে করেই এইরকম উত্তেজক পোষাক পরে আমার ঘরে এসেছে। মিঃ সেন থাকলে ওই রকম পোশাক পরতে ওর সাহস হোতনা।

"কারণে অকারণে আমার ঘরে ও হাজির হয়। অকারণে ঝগড়ার প্ররোচনা দেয়। আবেগে ও দীপ্তিময়ী হয়ে উঠছে। ওর দেহ ভীষণ প্রলোভন জাগায়।

"আপন রিপু দমন করার জন্য আমি ওকে কুৎসিত, মোটা, দুর্গন্ধে ভরা মহিলা রূপে ভাবার চেষ্টা করলাম। একটা ছবি ভেবে নিয়ে তার ধ্যান করতে শুরু করলাম। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। মিছিমিছি স্নায়ু উত্তেজিত করা। কিছুই বুঝতে পারছিনা ও আমায় কোথায় নিয়ে যাবে!

"আজ সকালে ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হোল। আমার কতকগুলো বোকামোর জন্য ও রেগে গেল এবং আমাকে ভয় দেখাল যে এক সপ্তাহ আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আমি জানিয়ে দিলাম ও যা খুশী করতে পারে আমার কিছুই যায় আসে না। এই কথাগুলো বলতে পেরে আমার হালকা লাগছিল। এখন ভালভাবে নিজের কাজে মন দিতে পেরেছি। রমু দূত হয়ে এসে আমায় জানাল যে মহিলা কবি চুপসে গেছে। উত্তরে আমি জানালাম যে আমি একটুও রাগ করিনি তবে মৈত্রেয়ী যা চালাতে চাইছে তা চালিয়ে যেতে পারে।

"তাহলে ধরে নিতে হবে যে সব মেয়েরাই এক! সর্বত্র একই সুর, ইওরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, বুদ্ধিমতী-বোকা, সৎ-নষ্ট চরিত্র যা কিছু হোক! খাবার টেবিলে মৈত্রেয়ী আমার পাশে এসে বসলো। প্রায় একশো বছরের পুরনো একটা দারুণ জমকালো শাড়ী পরে এসে ছিল সে। মৈত্রেয়ী কাঁদছিল। কোন কথা বললো না, সামান্য কিছু খেলো। 'মা' সবই বুঝতে পারলেন! খাওয়ার পর আমাদের মধ্যে একটু বোঝাপড়া হোল। মৈত্রেয়ী আমাকে ভর্ৎসনা করলো ওকে বিনা দোষে অভিযুক্ত করার জন্য, বিনা দোষে ওকে ভুল বোঝার জন্য বলল—ও যে প্রেম, সমবেদনা ইত্যাদি বিশ্বাস করেনা একথা সত্য নয়।



"লড়াইটা চলেছিল প্রায় মিনিট পনের ধরে। ওর হাত দুটো আমার হাতের মধ্যে ধরে আমি চাপে প্রায় গুঁড়িয়ে ফেলার জোগাড় করেছিলাম। ও যখন হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছিল, কাঁদছিল, মুখ বিকৃত করছিল, ওকে অপূর্ব লাগছিল দেখতে। মনে মনে নিশ্চই রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রার্থনা করছিল। অবশেষে ও হার স্বীকার করলো। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম ওর মধ্যে এক অদ্ভুত ধরণের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছিল। যে আনন্দ ছিল বেদনা, শারীরিক সান্নিধ্যের উষ্ণতা আর ওর ওপরে আমার জোর খাটানোর অধিকারবোধের সংমিশ্রণ।

"আমি ওকে ওর শোবার ঘরের দিকে নিয়ে গেলাম।'

—আমার হাত দুটো একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন।'

"আমি ওর হাত দুটো পরম স্নেহ ভরে তুলে নিলাম। হাত বুলিয়ে দিয়ে ওর হাত দুটো চুম্বনে ভরিয়ে দিলাম। ভারতে এটা একটা অচিন্ত্যনীয় কাজ। যদি কেউ জানতে পারত তাহলে মৈত্রেয়ীকে খুন করে ফেলতো।

"কিছুক্ষণ পরে ও নিঃশব্দে ঘরে এক গুচ্ছ ফুল ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

"মৈত্রেয়ী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সিনেমার ঘটনা : ও নিজে যেচেই আমার পাশে বসেছিল। অন্ধকার হল্-এ ও আমায় বললো যে আমাদের নিজেদের ব্যাপারে একটা আলোচনা করা দরকার। আমি ওকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম যে এখন সেটা সময় নয়, কারণ এখন আনন্দ করতে এসেছি এবং আমার ওইসব ভাবপ্রবণ আলোচনায় যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই। মৈত্রেয়ীর শান্তভাব চলে গেল এবং সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। কিন্তু আমার মনে তার জন্য একটুও চাঞ্চল্য আমি বোধ করিনি।

"সিনেমা হল্ থেকে বেরিয়েও সে একইভাবে কেঁদে চললো। আমি থাকতে না পেরে বেশ চেঁচিয়েই বললাম 'মৈত্রেয়ী'! ওই দিনই সন্ধ্যাবেলা ও আবার আমার শোবার ঘরে এসে শালে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। কেন কাঁদছে, এ প্রশ্নেরও কোন জবাব দিল না। একটু পরেই অন্যান্যরা আমার ঘরে যখন উপস্থিত হোল তখন আবার হাসিতে ফেটে পড়লো।

"মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে কোন কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আজ দেখলাম অনেকটাই শক্ত হয়ে উঠেছে। একবার মাত্র কান্নাকাটি হোল আজ।

আজ আমারই কিন্তু খারাপ লাগছিল বেশী। আজকের কথাবার্তার সময় বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। শেষকালে আমি ওকে চলে যেতে অনুরোধ করলাম। ও চলে যেতেই বিছানায় আশ্রয় নিলাম। নিজেকে ভীষণ, হাস্যকর লাগছিল। আমিই ওকে কথা দিয়েছিলাম আমাদের বন্ধুত্ব সম্পর্কে। আমি কি বোকা! নিজের কৌশল প্রয়োগ করতে গিয়ে একটার পর একটা মিথ্যা স্বীকার করে ওর চোখেই ছোট হয়ে গেছি। আমি অদ্ভুত আচরণ করেছি। ও ওর তরফে ঠিক শান্ত ব্যবহারই করেছিল। এই আবেগময় খেলার ফলে আমরা দুজনেই দুজনের কাছে ছোট হয়ে গেছি। ঠিক করলাম আমাদের এই খেলা শেষ করতে হবে। আবার আমাদের পুরনো বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনতেই হবে।

"হায়! সবকিছু এত সহজ নয়। আমি ওকে ভালবাসি, ভয়ংকরভাবেই ভালবাসি। আবার আমি ওকে ভয়ও পাই। আমার প্রতি ওর অন্যায় ও স্বীকার করলো।

"ভয় আর আনন্দ এ দুয়ের মিশ্রণে আমার মধ্যে কি যে হয়ে চলেছে! নতুন নতুন সমস্যা আর চিন্তা : ভাবপ্রবণ, আবেগহীন গভীর প্রেম কি সম্ভব? আমি ভাবপ্রবণ হই বা না হই তাতে কি যায় আসে?

"আমার মন কি বিষিয়ে গেছে? আমি কি আপন খেয়ালেরই দাস হয়ে পড়ছি? সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আমি ছিলাম একজন সুখী পুরুষ। আপ্লুত ছিলাম জীবনীশক্তির জোয়ারে; আবার নতুন করে বাঁচার প্রেরণায়। আমি মৈত্রেয়ীকে বলতে প্রস্তুত ছিলাম : তুমি কি আমার স্ত্রী হতে চাও? আমি এখনও ওই কথা বলতে প্রস্তুত। ওর স্বামী হতে পারলে আমি সত্যিই সুখী হবো…ও এত পবিত্র…এত শান্ত।

"আজ বিকেলে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে বিয়ে নিয়ে আলোচনা হোল। কল্পনা করার চেষ্টা করলাম আমি ওকে বিয়ে করেছি। ও আমার স্ত্রী, আমি এই পরিবারের কর্তা! জীবন কি বিস্ময়কর! আমি তৃপ্তি চাই আর চাই মানসিক শান্তি।

বিকেলে মৈত্রেয়ী জানাল যে ওর মন খুব খারাপ। রবীন্দ্রনাথ ওকে কোন চিঠি দেন নি। রবীন্দ্রনাথ ওর গুরু, বন্ধু, আদর্শ এবং ভগবান। ও বললো ওদের যোগাযোগ সবাই ভালো চোখে দেখে। 'খাঁটি বাঙালী ভক্তি'। আমার কি ঈর্ষা হচ্ছে! পরোক্ষভাবে ওকে অনেক গোপন কথা বলেছি। ও যখন সব জানে, ঠিক করেছি ওকে বলে দেবো যে আমাদের প্রেমেরও কোন পরিণতি নেই।

"আমি কখনই এমন কাউকে বিয়ে করতে পারব না যে আগে অন্য কারো সঙ্গে

প্রেম করেছে।

"আমার যে রাগ হয়েছে তা ও বেশ বুঝতে পেরেছে। রাতের খাওয়ার পর আমাদের মধ্যে আর কোন কথা হয়নি। এক লাইন লিখে জানিয়েছিল যে আমি ওকে অপমান করেছি। আমি কোন উত্তর দিইনি।

"অপ্রত্যাশিত ঘটনা! কখনও রাগ হয় আবার আনন্দও হয়। প্রেম বিষের মত। বিয়ের স্বপ্ন দেখি। আমার সন্তানদের মানসচক্ষে দেখতে পাই। সমস্ত সময় নষ্ট করছি। আমার পক্ষে বাস্তবিকই মনস্থির করা শক্ত। আমার আসক্তি আমি ত্যাগ করতে চাই না।

"রাত্রিতে ভূমিকম্প হোল। আমার জ্বর ছাড়েনি। সকালে মৈত্রেয়ীকে একটা দামী উপহার দিলাম।

"প্রচণ্ড মানসিক চাপের দিন। এইদিনের সম্পূর্ণ বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মৈত্রেয়ী আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চেয়েছিল। আমায় জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপারটা আমি কোথায় নিয়ে যেতে চাই। আমি নিজের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে চললাম। ওর সঙ্গে আপোষ করার চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

শিবু, বাচ্চু সবাই লক্ষ্য করছিল। আমি একটি কথাও বলিনি। ও যদি অপমানিত বোধ করে থাকে তার জন্য আমি দুঃখিত কিন্তু খুব দৃঢ়তার সঙ্গে আমার নিজের মন শক্ত করে রাখতে পেরেছি।

বাচ্চু ঠিক সেই সময় আমার ঘরের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল এবং সবই শুনতে পাচ্ছিল। হতাশ হবার ভঙ্গী নিয়ে মৈত্রেয়ী কাঁদছিল। একটা কাগজের ধারে লিখেছিল—ও মরতে চায়। বাচ্চু যা শুনতে পেয়েছিল একজন ভারতীয় নারীর পক্ষে তা ছিল যথেষ্ট অসম্মানের।

অবশেষে ও শান্ত হোল। আমার ঘর গুছিয়ে দিল। টেবিলের ওপর ফুল-দানিতে ফুল এনে রাখল। আমি একটাও কথা বলিনি।

"অবাস্তব বিশ্বাস এবং মরীচিকার ওপর একটা কবিতার বই লিখছে মৈত্রেয়ী।"

"ইওরোপে যুবতীরা কি ধরণের স্বাধীনতা ভোগ করে সে সম্পর্কে আজ বললাম ওকে। আমার কৌমার্য এখনও আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলো এবং তা নেই ধরে নিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। দৈহিক শুদ্ধতা নিয়ে ওর এই রহস্যজনক আসক্তি দেখে বিচলিত হলাম।

"সন্ধ্যাবেলা আলোচনা আবার সেই এক বিষয়ে এসে দাঁড়াল—ওর বিয়ে।

ওর দৃঢ় বিশ্বাস অন্য যেখানেই ওর বিয়ে হোক না কেন ও অসুখী হবেই। আমি বললাম যে আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো বোধহয় শ্বেতকায় হয়ে জন্মানো। যদি ভারতীয় হয়ে জন্মাতাম খুব ভাল হোত। আমার এই কথায় ও খুবই বিচলিত হয়ে পড়লো। আমি ভয়ংকর একটা প্রশ্ন করে বসলাম ঃ আমাদের বিয়ে হতে পারেনা কেন? ও খানিকক্ষণ প্রস্তর মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে রইল তারপর আমাদের কথা কেউ শুনে ফেলেছে কিনা দেখার জন্য ও চিন্তিত হয়ে উঠল। ও উত্তর দিল, ভাগ্য বা বিধাতা এইভাবেই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম ভাগ্য বা বিধাতা কেন, কুসংস্কারই কি এরজন্য একমাত্র দায়ী নয়? ওর উত্তর ছিল বিধাতা এইসব সংস্কারের মধ্য দিয়েই তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেন। আর আমার প্রেম নাকি ক্ষণিকের মোহ।

"প্রকৃতপক্ষে এই প্রেম যা প্রথম প্রথম আমার অসম্ভব ভাবাবেগের নিদর্শন বা শিশুসুলভ খেয়ালীপনা বলে মনে হোত তা মৈত্রেয়ীর মনোভাবের দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে আমার আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। আর টেনে নিয়ে গিয়েছিল অনেক দূর অবধি—প্রায় আমার বুদ্ধির প্রান্তে, কল্পনার জগতে যেখান থেকে নিজেকে আমার সুখী, পরিপূর্ণ সুখী বলে মনে হোত। জানিনা কি ভাবে এর ব্যাখ্যা দেব।

"অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আমি বিয়ের কথা চিন্তা করছি।

"ওর দেখা পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠছে। ও সব সময়ই শোবার ঘরে। নয় লিখছে নয় গান গাইছে। আমি রুমা মারফৎ কয়েকটা নির্দোষ প্রেম পত্র পাঠালাম কিন্তু কোন উত্তরই ও দিলনা। প্রথম রাতে খুবই কষ্ট হোল, অনেক কিছু ভাবলাম। দ্বিতীয় দিনেও যে ভাবনা ছিলনা তা নয়। তারপর এখন কিছুই নয়। লক্ষ্য করছি মৈত্রেয়ী ছাড়া বাঁচা এমন কিছু কঠিন নয়।

কয়েকদিন পরে এক বিকেলে হঠাৎই আমার সঙ্গে হ্যারোওর দেখা। ওকে ওর স্বভাবের তুলনায় কম ছটফটে লাগছিল কিন্তু চোখে সেই শয়তানির অভাব ছিলনা।

—যা শুনছি সেটা কি সত্যি অ্যালেন? তুই কি মিঃ সেনের মেয়েকে বিয়ে করছিস?

আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। ঠাট্টা ইয়ার্কিতে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। বেকায়দায় পড়লে যা আমি সচরাচর করে থাকি। হ্যারোও

আমার ইয়ার্কিতে কোন কানই দিলনা বরং জানাল, সে খবরটা অফিস থেকেই পেয়েছে। একটা পিক্‌নিক করার জন্য আমার খোঁজে ও আমাদের অফিসে গিয়েছিল। ও আরও জেনে এসেছে যে এর জন্য আমি নাকি ধর্মত্যাগ করে হিন্দু হচ্ছি। ও নিজে গীর্জায় যেত যুবতী মেয়েদের দেখার জন্য। বিশেষ করে সুন্দরী ইরিশকে। কিন্তু আমার ব্যাপার শুনে ওর আমার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও লুকোতে পারল না। হারোও জানাল নরেন্দ্র সেন একটি শয়তান এবং আমাকে যাদু করা হয়েছে। আমায় উপদেশ দিল গীর্জায় পাঁচ টাকা জমা দিয়ে আমার জন্য বিশেষ করে প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে। আমি ওর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেব, ঠিক করলাম।

—আর সবাইকার খবর কি ?

—সবাই তোর জন্য দুঃখ করে। আলিপুরে গিয়ে তুই বিস্তর পয়সা জমাচ্ছিস। থাকা, খাওয়ার খরচা নেই, বাইরেও বেরোস না। সারাদিন কি করিস ?

—রিজিওনাল ম্যানেজারের পোস্টে অ্যাপ্লাই করব। বাংলা না জানলে হবেনা, তাই বাংলা শিখছি।

হারোও আমার কাছে পাঁচ টাকা ধার চাইল সন্ধ্যায় Y. M. C. A. তে বলড্যান্সে এ যোগ দেবার জন্য।

—তুই যাবিনা ? জিজ্ঞাসা করলো হারোও।

আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হয়নি। ওয়েলেসলী স্ট্রীট বা রিপন স্ট্রীটে থাকার দিনগুলোতে যে অমূল্য সময় আমি নষ্ট করেছি তা পূরণ করা আর সম্ভব নয়। আমি হারোওকে লক্ষ্য করছিলাম। ওর কালচে মুখ, সুন্দর চোখ, এই সেই সঙ্গী যার সঙ্গে আমি বহু সন্ধ্যা, রাত্রি নষ্ট করেছি মেয়েদের পেছনে ঘুরে। আমার বর্তমান জীবন এত শুদ্ধ আর পবিত্র যে ওকে আমার একজন অচেনা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। ও আমার বর্তমান ঠিকানা টুকে নিল এবং কথা দিল খুব শীঘ্রই আমার সঙ্গে দেখা করবে—নিশ্চই কিছু টাকা হাতাবার মতলবে।

বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম সমগ্র পরিবার চায়ের টেবিলে। শিবু, শিবুর বৌ রমু, বাচ্চু আর তার দুই বোন যাদের আমি কদাচিৎ দেখেছি। হারোওর সঙ্গে আমার কথাবার্তা ওদের আমি অকপটে জানালাম এবং এই শহরে অন্যান্য ইওরোপিয়ান এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, যে জীবন আমি নিজেও কাটিয়েছি, তার প্রতি আমার বিতৃষ্ণার কথাও প্রকাশ করলাম।

আমার কথা শুনে ওরা মুগ্ধ হয়ে গেল। মেয়েরা আমায় চোখ দিয়ে গিলছিল আর দুর্বোধ্য কথ্য ভাষায় নিজেদের মধ্যে সম্ভবত আমার প্রশংসা করছিল। শিবু তার অভ্যাসমত চোখ বুজে আমার করমর্দন করলো। একমাত্র মিঃ সেন উৎসাহের প্রাবল্য দেখে কিনা জানিনা তাঁর অভ্যাসমত ডিটেকটিভ উপন্যাস হাতে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিলেন।

মৈত্রেয়ী, বাচ্চু আর রমুর সঙ্গে আমি ছাদের দিকে গেলাম। মাথায় একটা বালিশ দিয়ে কার্পেটে শুয়ে পড়লাম এবং আরামে সন্ধ্যার অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার চটি আমার পায়েই ছিল। পায়ের ওপর পা শূন্যে নাড়াতে নাড়াতে একঘেয়ে লাগার জন্য আমি পাঁচিলের ওপর পা দুটো ভর দিয়ে রাখলাম। গত কয়েক মাসে আমি এদেশী ভদ্রতার রীতি নীতি অনেক শিখে ফেলেছিলাম। যেমন কারো গায়ে পা লেগে গেলে, আমাকে ঝুঁকে ডান হাত দিয়ে পা ছুঁয়ে মাথায় ছোঁয়াতে হবে এই রকম নানান কিছু। সেই জন্যই পাঁচিলে পা রাখার সময় আমি একটু ইতস্ততঃ করছিলাম। ঠিক সেই সময় আমার নজরে এল রমু মৈত্রেয়ীর কানে কানে কিছু বলছে। মৈত্রেয়ী আমায় বুঝিয়ে দিল যে রমু বলছে আপনার পা দুটো খুব সুন্দর। মৈত্রেয়ীর দৃষ্টিতে ঈর্ষা আর দুঃখ দুইই মিশে ছিল। লজ্জায় এবং আনন্দে আমি লাল হয়ে গেলাম। আনন্দ, কেননা আমি নিজেকে কুৎসিত মনে করতাম এবং আমার দৈহিক রূপের কেউ একটু প্রশংসা করলেই আমি মোহিত হয়ে যেতাম। আমি উত্তরে সঠিক কি বলেছিলাম মনে নেই তবে এটুকু মনে পড়ছে যে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে পায়ের সৌন্দর্যের কোন গুরুত্ব আমাদের অর্থাৎ সাহেবের কাছে অন্তত কিছুই নেই কেননা ওটা আমাদের দেশে ঢাকাই থাকে প্রায় অধিকাংশ সময়ই।

মৈত্রেয়ী শুনে খুশী হোল।

—আমাদের এখানে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম। আমরা খালি পায়ে পা ঘসে দিয়ে আমাদের আদর জানাই। দেখুন এই রকম……

মৈত্রেয়ী শাড়ি একটু তুলে নিয়ে নগ্ন পায়ে রমুর দিকে এগোল। রমু তার পায়ের পাতা দিয়ে মৈত্রেয়ীর পায়ে চাপ দিচ্ছিল আর আলতো করে বুলিয়ে দিচ্ছিল। মৈত্রেয়ীকে দেখে মনে হচ্ছিল একটা মানুষ চুম্বনে যে রকম তৃপ্তি পায় প্রায় সেই রকম আরাম উপভোগ করছে। ও কেঁপে কেঁপে উঠছিল। পায়ের গোড়ালি দিয়ে রমু মৈত্রেয়ীর পায়ের ডিম অবধি ঘষছিল আবার মাঝে মাঝে জোরে চেপে ধরছিল পায়ের তলায় নিজের পায়ের পাতা, পা দিয়ে পা জড়িয়ে

ধরছিল। দুটো নারীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই ব্যবহার আমার ভাল লাগছিল না। হিংসাও যে হচ্ছিল না তা নয়।

হঠাৎ মৈত্রেয়ী পা সরিয়ে নিয়ে বাচ্চুর কালো মোটা পায়ের ওপর রাখল। আমি দেখলাম বাচ্চুর রোদে পোড়া পাঁচে ঝলসানো নোংরা পা অনায়াসে মৈত্রেয়ীর শরীরের মিষ্টি স্পর্শ পাচ্ছে। একটা কুকুরকে আদর করার সময় সে যেরকম করে, বাচ্চুর ভঙ্গী ছিল হুবহু সেই রকম। দুঃখের বিষয় সেই সময় মৈত্রেয়ীর মুখটা ছিল আমার দিক পেছন করা। আমি দেখতে চাইছিলাম, ওই যুবকটির সঙ্গে শরীর সংযোগে মৈত্রেয়ীর ইন্দ্রিয় কতটুকু সুখ পাচ্ছে; কারণ ওর শরীরের কাঁপুনি আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝেই ও প্রবল শব্দে হেসে উঠছিল ওই ইতর ক্লাউনটার ঠাট্টা ইয়ার্কিতে। ঐ হাসির মধ্যে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আত্মসমর্পণের আর দখলিকৃত হবার বাসনার নিঃশব্দ ইঙ্গিত।

অনেকবার আমি ভেবেছি শরীর দখলের এই যে পদ্ধতি এটা কি শোধরানো যায় না? রুচিপূর্ণ, সভ্য, মার্জিত এবং নিত্য নতুন! বুদ্ধি,সূক্ষ্ম চিন্তা, ভঙ্গীর বিনিময়ে-প্রকাশে কি বোঝান সম্ভব নয় আত্মসমর্পণ? সবচেয়ে পাগল করা দৈহিক মিলন তার আগে কি কোনভাবেই সম্ভব?

সেই সন্ধ্যার পর অনেক দিন ধরেই আমার একটা অদ্ভুত হিংসা হোত প্রত্যেকটা লোকের ওপর যারা প্রায়ই নরেন্দ্র সেনের বাড়ীতে আসতেন। সুন্দর সুন্দর যুবকেরা; কেউ কবি, কেউ গায়ক—মৈত্রেয়ী যাদের সঙ্গে গল্প করতো হাসতো। আমি, শিবু বাচ্চু ওদেরও হিংসা করতাম। বিশেষ করে বাচ্চু; যে মৈত্রেয়ীর সম্পর্কে কাকা এবং সেই সুবাদে যখন ইচ্ছে ওর হাত ধরতে, কাঁধ চাপড়াতে চুল ধরে টানবার অধিকার ভোগ করতো। ওকে আমার বাস্তবিকই একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হোত। মৈত্রেয়ী ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি অচিন্ত্যকেও হিংসা করতাম। যে কবির সঙ্গে মৈত্রেয়ীর আলাপ হয়েছিল একেবারেই মাত্র এবং যার সঙ্গে ওর শুধু টেলিফোনেই কথাবার্তা হয়। অচিন্ত্যবাবুর পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ কবিতা পাঠাত মৈত্রেয়ী। হিংসা করতাম এক গণিতজ্ঞকেও যিনি খুবই কম আসতেন কিন্তু তাঁর সম্পর্কে মৈত্রেয়ীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিত। মৈত্রেয়ী স্বীকারও করেছিল যে ওর বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে। তবে সবচেয়ে ঘৃণা করতাম ওর ওই গুরু, বন্ধু পথপ্রদর্শক কবিকে। ওকে একদিন যতখানি সূক্ষ্মভাবে সম্ভব বলেও ছিলাম যে ও এইভাবে আত্মস্বত্বা বিকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ও এত সরলভাবে

বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকাল যে আমি বাধ্য হলাম পিছিয়ে আসতে।

মৈত্রেয়ীর সঙ্গে বাচ্চুর সেই আচরণ আমাকে অনেকদিন ধরে পীড়া দিয়েছিল। সেই সন্ধ্যার কথা ভাবতাম আসন্ন সন্ধ্যার আকাশে একটা দুটো করে ফুটে ওঠা তারাগুলো দেখতে দেখতে। ওদের সমবেত কথপোকথন কথ্য বাংলায় চলার ফলে অতি সামান্যই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাছাড়া মৈত্রেয়ীর হাসিই আমাকে সবচেয়ে বেশী বিচলিত করেছিল। বাচ্চুর প্রতিটি মন্তব্যে ওর ওই উচ্চস্বরে হাসি আর বিচিত্র মুখভঙ্গী আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। মৈত্রেয়ী আমার অসুবিধা অনুভব করতে পেরেছিল,আর সেই জন্যই সে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছি কি না, অবসর সময়ে অর্থাৎ অফিসের পরে ওর বাবার লাইব্রেরীর ক্যাটালগ তৈরীর কাজে ওকে সাহায্য করতে পারব কি না এবং সেই সুযোগে আমরা দুজনে আলাদা গল্প করতে পারব, এই ইঙ্গিতও দিয়েছিল।

ঐ ক্যাটালগের ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি আগে কিছু জানতাম না। শুনেছিলাম নরেন্দ্র সেনের লাইব্রেরীতে প্রায় হাজার চারেক বই আছে। পরে শুনলাম উনি সব বই এর একটা সুশৃংখল তালিকা করে ছাপিয়ে রাখতে চান যাতে ওনার মৃত্যুর পর উনি বইগুলো কোন কলেজকে দান করে যেতে পারেন। তাঁর ওই পরিকল্পনা আমার হাস্যকর মনে হলেও আমি সম্মত হয়েছিলাম। ও বলেছিল —বাবার সাহস হচ্ছে না আপনাকে অনুরোধ করতে। উনি ভয় পাচ্ছেন যে এতে আপনার সময় নষ্ট হবে। আমি একটা মেয়ে, কোথাও যাই না, বাড়িতে সামান্যই কাজ থাকে……

আমার মনে পড়ছে প্রথম সন্ধ্যাতেই ভেবে চিন্তে মতামত না দেওয়ার জন্য নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল। বাস্তবিকই বুঝতে পেরেছিলাম বেশ কিছুটা সময় আমার এখানে নষ্ট হবে। তাছাড়া ভয়ও করছিল আবার না আমাদের সেই পুরনো খেলা শুরু হয়।

পরের দিন চা খাবার আগে দেখি লাইব্রেরীর দরজায় মৈত্রেয়ী আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

—আসুন, আমি যতটুকু করতে পেরেছি আপনাকে দেখাই।

টেবিলের ওপর গোটা পঞ্চাশেক বই কাত করে সাজান যাতে নামগুলো সহজেই পড়া যায়।

—আপনি এই পাশ থেকে শুরু করুন, আমি উল্টো দিক থেকে শুরু

করছি। দেখি কোন্ বইটাতে এসে আমরা মুখোমুখি হই।

ওকে খুব বিচলিত লাগছিল। ওর ঠোঁট কাঁপছিল আর প্রায়ই আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি লেখবার জন্য বসলাম কিন্তু কেবলই একটা বিপদ ঘটার পূর্বাভাস পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল আবার আমাদের মধ্যে পুরনো সম্পর্ক জেগে উঠতে চলেছে। চিন্তা হচ্ছিল এইভাবে কি ওর হৃদয়ের গভীরে আলোকপাত করা সম্ভব হবে? খুব হালকাভাবেই আমি আমার এই অনুভূতির কথা ভাবছিলাম। লিখতে লিখতে নিজেকেই প্রশ্ন করছিলাম, আমি কি ওকে এখনো ভালবাসি? বোধ হয় না, ওকে ভালবাসার আমি অলীক কল্পনা করেছিলাম। আবার বুঝতে পারলাম ওর বন্য মোহিনী শক্তিই আমাকে আকর্ষণ করে। নিজের সম্পর্কে আমার পরিষ্কার ধারণা হয়েছিল যে আমি শুধুই মোহগ্রস্থ প্রেমিক নই! কিন্তু ঘটনাগুলোর প্রারম্ভে আমার চেতনা যখন স্বচ্ছ ছিল তখন আমার এই সব কিছু মনে হয়নি। মনে হয়েছিল এটাই বাস্তব।

অন্যমনস্কে একটা বই নিতে গিয়ে আমার হাত মৈত্রেয়ীর হাতের ওপর পড়লো। আমি দ্রুত হাত সরিয়ে নিলাম।

—আপনি কোন্ বই অবধি এলেন?

আমি ওকে বইটা দেখালাম। ঠিক ওই বইটার আগের বই অবধিই ও এসেছিল। বইটা ছিল Wells-এর 'Tales of the unexpected'।

ও যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়ে বললো—দেখেছেন! নিশ্চই কোন অদৃশ্য শক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে।

উত্তরে আমি মৃদু হাসলাম। বাস্তবিক আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এই আকস্মিকতায়। টেবিলের ওপর রাখা বইগুলোর নামগুলো থেকে ইচ্ছে করলে অর্থ বার করা যেতেই পারে। যেমন, 'স্বপ্ন', 'আমাকে তোমার সঙ্গে নাও', 'সাহায্যার্থে', 'কিচ্ছু নতুন নয়', ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি এমন একটা উত্তর ভাবছিলাম যার একাধিক অর্থ হতে পারে কিন্তু সেই সময় ছবি আমাদের চা খেতে যাবার জন্য ডাকলো। খুব ভাল লাগছিল। আমরা পরস্পরের দিকে গাঢ় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম।

চা খেতে বসে আমি দারুণ উৎসাহে কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে বলতে শুরু করলাম। আমি এত আন্তরিকতার সঙ্গে চৈতন্যদেবের জীবন ও বিশ্বাস সম্পর্কে বলছিলাম যে মিসেস সেন আমার কাছে এসে বসলেন। ক্রমশঃ তাঁর চোখ জলে ভরে এল।

—তোমাকে একজন প্রকৃত বৈষ্ণব মনে হচ্ছে।

এই প্রশংসায় আমার যে কি আনন্দ হোল তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। আমি উত্তর দিলাম, বৈষ্ণব ধর্মকে আমি সব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করি। এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিতর্ক শুরু হলো। শিবুই আমার সঙ্গে তর্ক করতে শুরু করলো। মৈত্রেয়ী মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, তারপর হঠাৎই সে বলে উঠলো—তোমরা ধর্ম সম্পর্কে কি জান?

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল মৈত্রেয়ী। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়ে কি উত্তর দেবো বুঝতে পারছিলাম না। শিবু ওকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। মৈত্রেয়ী দৌড়ে লাইব্রেরীর দিকে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে চা শেষ করলাম।

সবাই কেমন চুপ করে গেল। আমি আমার ঘরে ফিরে গেলাম। কয়েকটা চিঠি লেখার ছিল, সেগুলো নিয়ে বসলাম। কিন্তু মন বসলো না। একটা অস্থিরতা আমায় কষ্ট দিচ্ছিল; মনে হল মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলা দরকার। আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

সেদিনটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমার ডায়েরির অংশ তুলে দিলাম:

"আমি ওকে দেখলাম চোখের জলে বিপর্যস্ত অবস্থায়। আমি বললাম যে আমাকে এখানে আসতে বলা হয়েছে বলেই এসেছি। এ কথায় ও খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। আমি পাঁচ মিনিট সময় চাইলাম যাতে আমার চিঠিটা শেষ করে আসতে পারি। ঘর থেকে ফিরে এসে দেখলাম টেবিলের সামনে একটা আরাম চেয়ারে বসে ও ঘুমচ্ছে। আমি ওকে জাগালাম ও চোখ বড় বড় করে জেগে উঠল। আমি ওকে এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকলাম। ও বেশ উপভোগ করছিল আমার দৃষ্টি। মাঝে মাঝে শুধু জিজ্ঞাসা করছিল "কি হোল? কি হোল?" তারপর একসময় চুপ করে আমার চোখে চোখ রেখে বসে রইল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো, রহস্যময় এক স্নিগ্ধ, মিষ্টি শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে আমরা বসে রইলাম। সেই সময় আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছিল তা আমার পক্ষে বর্ণনা করা অসম্ভব। ইন্দ্রিয়ের এক তীব্র উত্তেজনা বোধ করছিলাম কিন্তু তা ছিল কোন রকম যৌন চেতনা-বোধের ঊর্ধ্বে। এক স্বর্গীয় আনন্দের জগতে বিচরণ করছিলাম আমি। প্রথমে দৃষ্টিই যথেষ্ট ছিল, তারপর হাতে-হাত রাখলাম আমরা। চোখের মিলনে ছেদ ঘটলো না। জোরে চেপে ধরলাম আবার আদরে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিলাম ওর দুটো হাতে। (আমি কিছু দিন আগেই প্রেম সম্পর্কে চৈতন্য দেবের ধারণা পড়েছিলাম, আর তাইই

ব্যক্ত করতে চাইছিলাম)। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমি ওর হাত চুম্বন করলাম। ও আনমনে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছিল প্রবল উত্তেজনায় কিন্তু তাও ছিল অতি পবিত্র। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে করছিল ওর মুখে চুম্বন করতে কিন্তু অনেক কষ্টে আমি নিজেকে সংযত রেখেছিলাম। আমাদের অবস্থানটাও খুব নিরাপদ ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে নামার পথে যে কেউ আমাদের দেখতে পাবার সম্ভাবনা ছিল। ওকে আমি একবার জিজ্ঞাসা করে ছিলাম আমাদের মিলনে বাধা কিসের। ওর একটা শিহরণ দেখা দিল এই প্রশ্নে। আমি ওকে রাগিয়ে দেবার জন্যে কবির শেখানো মন্ত্র দুবার উচ্চারণ করতে বললাম যাতে ওকে কোন অশুচিতা স্পর্শ না করতে পারে। ও আমার কথা শুনলো কিন্তু শুনে ওর কোন ভাবান্তর ঘটলো না। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে যা ঘটেছে তা প্রেম, দৈহিক পবিত্রতা বজায় রেখেও তা প্রেমই।

আমার স্পর্শ এবং দর্শন দিয়ে অতিপ্রাকৃত স্তরে পেঁছনর অভিজ্ঞতা হোল। দুঘণ্টা ধরে চলেছিল আমাদের এই অভিজ্ঞতার পর্ব। স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে কোন দিন, যে কোন সময় আমরা আবার ওই খেলায় মগ্ন হতে পারব।

এরপর ও আমায় অনুরোধ করলো চটি খুলে ওর পায়ে পা ঠেকাবার জন্য। আমি জীবনে ভুলতে পারবোনা আমার সেই প্রথম স্পর্শের অনুভূতি। এই স্পর্শ আমাকে ভুলিয়ে দিল আমার সব হিংসা, সবার প্রতি আমার ঈর্ষা, যার জন্য এতদিন আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম মৈত্রেয়ী ওর পায়ের পাতা, ওর পা সমর্পণের মধ্য দিয়ে ও নিজেই আমার কাছে আত্মসমর্পণ করছে। সেই মুহূর্তে ভুলে গেলাম ছাদের সেই ঘটনা। মনে হোল এই প্রথম, শুধু আমাকেই ও এই সৌভাগ্য প্রদান করলো। আমি আমার পায়ের পাতা ওর হাঁটুর পেছন অবধি তুলে দিয়ে সেই মায়াময় কোমলতা, উষ্ণতা অনুভব করলাম। মনে মনে ভাবলাম আমিই প্রথম পুরুষ যে অতখানি স্বাধীনতা ভোগ করলো। পা দিয়ে ওর পা জড়িয়ে ধরলাম। এইভাবে যে আমরা কতক্ষণ সময় কাটালাম তা বলতে পারবো না। মনে করতে পারিনা সেই সময়ে আর কিছু করেছিলাম কিনা, তবে মৈত্রেয়ীর মনের স্বরূপ আমি অনুধাবন করতে পারলাম। ছটা মাস আমি অর্থহীন জেদে হারিয়ে ফেলেছি। আজ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম ও আমার সম্পূর্ণ অধিকারে।

আমি যে ওকে ভালোবাসি একথা হয়ত ওকে স্পষ্ট করে জানাইনি, কিন্তু

আমার মনে হোত আমাদের দুজনের অনুভূতির কাছেই ব্যাপারটা সুস্পষ্ট ছিল। ওর প্রত্যেকটা ভঙ্গীর মধ্যেই আমি খুঁজে পেতাম সমব্যথী, সহমর্মী এবং ভালোবাসার এক নিঃশব্দ বার্তা। আমি বিশ্বাস করতাম না যে ও আমাকে ভালবাসেনা এবং ওর প্রতি আমার ভালোবাসায় ওর আস্থা নেই। তাই যখনই ও সামান্য অন্যরকম ব্যবহার করতো বা আমাদের মিলনের কথা বললেই মুখে হাত চাপা দিতো কিম্বা গুরুত্বের অবস্থায় চোখে মুখে আতংক নিয়ে চুপ করে থাকত, আমি দুশ্চিন্তার শিকার হতাম। এসব সত্ত্বেও আমার মনে হোত ওর পরিবারবর্গের সঙ্গে আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তায় মৈত্রেয়ীও যোগ দিত এবং উৎসাহিত করতো।

একদিন আমি যখন বললাম যে ওকে আমি ভালোবাসি, ও তখন দুহাত দিয়ে চোখ ঢাকা দিল। আমার কথার প্রতিক্রিয়া যে কি হোল আমি সঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি যখন উষ্ণ আন্তরিকতা নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম বাংলায় কয়েকটা ভালোবাসার কথা বলার জন্য, ও উঠে পড়লো। আমাকে একজন সদ্যপরিচিতের মতো মনে করে বললো—আমায় ছেড়ে দিন। আমি বুঝতে পারছি আপনি আমায় ঠিক বুঝতে পারেন নি। আমি আপনাকে ভালোবাসি বন্ধুর মতো, একজন ভীষণ প্রিয় বন্ধুর মতো। আমি আপনাকে অন্যভাবে দেখতে পারি না। আর দেখতে চাইও না…

—কিন্তু মৈত্রেয়ী, এখন আর এটা নিছক বন্ধুত্ব নয়, এটা ভালোবাসা, প্রেম…

আমি হঠাৎই আমার উপস্থিত বুদ্ধি ফিরে পেয়েছিলাম।

—আত্মা, মন অনেক রকম ভালোবাসার অস্তিত্ব স্বীকার করে।

—সত্যি কথা। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে আমার প্রেমিকা হিসেবে পেতে চাই। তুমিও তা জান। আর এটা থেকে তুমি নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছো কেন? আমরা পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। এই সত্য ঢাকবার জন্য আমরা নিজেদের যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছি। আমি তোমায় ভালবাসি মৈত্রেয়ী, আমি তোমায় ভালোবাসি।

আমি কথাগুলো বলছিলাম একটা বাংলা বাক্যের সঙ্গে পাঁচটা ইংরাজী বাক্য মিশিয়ে।

—আপনার নিজের ভাষায় কথাগুলো আবার বলুন।

এলোমেলোভাবে মাথায় যে ভাবে এলো, কথাগুলো আমি ফরাসীতে আবার

বললাম। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে। সবে ঘরে আলো জবালা হয়ে গিয়েছিল। লাইব্রেরীতেও আলোর প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। বললামও সে কথা। ও উত্তর দিল—না ছেড়ে দিন। দরকার নেই।

—কেউ এসে পড়লে? আমাদের দুজনকে যদি কেউ এভাবে অন্ধকারে দেখে, তখন?

—বয়ে গেছে আমার। আমরা ভাই বোনের মত রয়েছি এখানে।

আমি না বোঝার ভান করলাম। ওকে আদর করার জন্য ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত দুটো ধরলাম। ও আমায় জিজ্ঞাসা করলো—কেন তুমি মাঝে মাঝে এইরকম অবুঝ হয়ে ওঠো?

ওর কণ্ঠস্বরে প্রশ্রয় আর হাল্কা হাসির আমেজ ছিল। আমি নিজের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে উত্তর দিলাম—কারণ তুমি মাঝে মাঝেই অর্থহীন বোকামো করো।

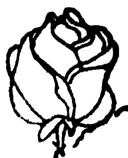
মৈত্রেয়ী নিজের হাত দুটো আমার হাত থেকে মুক্ত করে কাঁদতে শুরু করলো। ও লাইব্রেরী ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হোল। ওকে থামাবার জন্য ওর চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে খুব নিচু স্বরে ওকে আমি আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। ওকে কান্না থামাতে অনুরোধ করলাম। ওর শরীরের স্নিগ্ধ সৌগন্ধ, কুমারী শরীরের উষ্ণতায় আমার সংযম হারিয়ে যাচ্ছিল। আমি ক্রমশঃ ওকে আমার শরীরের সঙ্গে জোরে চেপে ধরছিলাম। আমার আলিঙ্গনের মধ্যে ও ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। অস্ফুট স্বরে বিরোধিতা করছিল। আমার ভয় করছিল। যে কেউ ওর কণ্ঠস্বর শুনে ফেলতে পারে এই ভয়ে আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। ও কিন্তু ঘর ছেড়ে চলে গেল না। দরজার দিকে না গিয়ে ও জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তার গ্যাস পোস্টের স্বল্প আলো ওই জায়গাটায় এসে পড়েছে। ওর চোখ, এলোমেলো চুল, কামড়ে ধরা ঠোঁট আমার শরীরে শিহরণ এনেছিল। এক অদ্ভুত ভয় আর আকর্ষণ মিশ্রিত দৃষ্টি নিয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। একটা কথাও ও বলতে পারছিল না। আমি ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। জড়িয়ে ধরলাম। দুহাত দিয়ে ওর মুখটা তুলে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলাম। তীব্র আবেগ, উন্মত্ততায় দিশেহারা তখন আমি। আমি ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম—ভেজা, ভেজা, কোমল, সৌগন্ধযুক্ত এই ঠোঁট আমি কোনদিন চুম্বন করতে পারবো ভাবতেও পারিনি। প্রথমে ও ঠোঁট দুটোকে গুটিয়ে শক্ত করে রাখছিল কিন্তু ক্রমশঃ ওর প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে গেল। মেলে ধরলো

নিজের ঠোঁট। আমার ঠোঁটে চুম্বন করলো এবং আলতো করে কামড়ে দিতে থাকলো। ও ওর শরীরের ভাব আমার শরীরে এলিয়ে দিল। আমি ওর সুগঠিত বুকের স্পর্শ আমার শরীরে অনুভব করছিলাম। অনুভব করতে পারছিলাম ওর সমস্ত শরীরের জ্যামিতিক বিন্যাস।

জানিনা কতক্ষণ আমরা এই অবস্থায় ছিলাম। একটা সময় মনে হোল মৈত্রেয়ী হাঁপাচ্ছে। আমি ওকে ছেড়ে দেওয়া মাত্র ও একটা ভগ্ন স্তুপের মতো মাটিতে পড়ে গেলো। আমি ওকে উঠতে সাহায্য করার জন্য নিচু হলাম, কিন্তু ও আমার পা দুটো ছুঁয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, ওকে যেন আমি স্পর্শ না করি। আমাকে আমার নিজের মায়ের নামে, মিসেস সেনের নামে শপথ করাল। আমি চুপ করে রইলাম। ও নিজে নিজেই উঠে পড়লো। চোখের জল মুছে, চুল ঠিকঠাক করে নিল। এক দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা গভীর শ্বাস ফেলে ও ঘর ছেড়ে চলে গেলো।

আমি ঘরে ফিরে এলাম। ওকে জয় করার আনন্দ, অনুতাপ এবং সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড ভয় আমাকে বিচলিত করলো। খেতে যাওয়ার আগে অবধি কিছুই করতে পারলাম না। কোন কিছুতেই মন বসাতে পারলাম না। ভাবছিলাম খাবার টেবিলে ওর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস কি আমার হবে! এখন এই মুহূর্তে ও আমার সম্পর্কে কি ভাবছে! ভয় হচ্ছিল যদি ও ওর মার কাছে অথবা রমুর কাছে বলে দেয়! আমি কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। মৈত্রেয়ী খাবার টেবিলে এলনা। খাওয়ার পর রমু আমার দিকে এগিয়ে এসে বললো—আমাদের মহিলা কবি আপনাকে এই কাগজটা দিতে বলেছে।

আমার দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এক প্রচণ্ড উত্তেজনা, ভয়ে যেন আমি আমার হৃৎস্পন্দনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি কাগজটা খুললাম। যাতে কেউ না বুঝতে পারে, সেই জন্য ফরাসীতে লেখা: "সকাল ছটায় লাইব্রেরীতে এসো"।



সকাল দশটার মধ্যে আমাকে অফিসে পেঁছিতে হোত। রাত আটটায় চায়ের টেবিলে হাজিরা দিতে হবে। তাই সন্ধ্যা ছটার মধ্যেই বাড়ী চলে আসার চেষ্টা করতাম যাতে অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েক সময় মৈত্রেয়ীর সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পাই। সেই রাতে আমি ভাল করে ঘুমতে পারিনি। বার বার দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। আমি মৈত্রেয়ীকে হারাচ্ছি। দাড়িওয়ালা এক স্বর্গীয় দূত আমায় এই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। নরেন্দ্র সেন নিঃশব্দে তাঁর টেরাস থেকে আমার চলে যাওয়া দেখছেন। ঘুম ভেঙে দেখি আমার কপাল ঘামে ভিজে গেছে। মনে হচ্ছিল একটা ভীষণ পাপ কাজ করে ফেলেছি।

যথা সময়ে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা হোল। ওর পরণে ছিল সাদা শাড়ি, গায়ে হাল্কা ধোঁয়াটে রঙের শাল। বুঝতে পারছিলাম না আমার ঠিক কি ভাবে ওর সঙ্গে ব্যবহার করা উচিৎ। ওকে জড়িয়ে ধরবো না শুধু মৃদু হাসবো অথবা কিছুই হয়নি এরকম ভান করবো ভাবতে ভাবতে ওকে নমস্কার জানালাম। ও আমার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করছে আন্দাজ না করতে পেরে প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি উল্টোপাল্টা অসংলগ্ন কথা বলছিলাম। মৈত্রেয়ী ছিল শান্ত আর স্থিতধী। ওর চোখের তলায় ছিল কালি বেশ বোঝা যাচ্ছিল আগের রাতটা ওর কেটেছে প্রার্থনা আর পুজোর মধ্য দিয়ে। আমি কি ভুল করছি? না ঠিকই শুনেছিলাম মনে নেই, ও একটা প্রার্থনা সঙ্গীত গাইছিল গুনগুন করে। তারপর হঠাৎই ও গান থামিয়ে দিয়েছিল।

আমি ওর সামনের চেয়ারে বসে যন্ত্রচালিতের মতো বই-এর তালিকা প্রস্তুতির কাজে লেগে গেলাম। কয়েক মিনিট পরে ওই বরফের মতো শীতল স্তব্ধতা কাটানোর জন্য আমি প্রশ্ন করলাম—কাল রাতে ঘুম হয়েছিল?

—না। একদম ঘুমতে পারিনি।

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে আবার বললো—আমি ভেবে দেখলাম এখন আপনার এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া উচিৎ। এই জন্যই আপনাকে আমি ডেকেছি।

আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও অনুনয়ের ভঙ্গী করে আমায় থামিয়ে দিয়ে কথা বলে যেতে থাকলো। কথা বলতে বলতে একটা কাগজে পেনসিল দিয়ে কিছু লিখছিল আবার মুছছিল, কিছু ছবি আঁকছিল যে-গুলো

আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম না। ওর এই খেলা সেই প্রথম দিকে ওর ফরাসী শিক্ষার দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আমার মন ভেঙে যাচ্ছিল। ওর ওই মানসিক ক্ষুদ্রতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। প্রতি মুহূর্তে অপমানিত হচ্ছিল আমার ধারণার নিশ্চয়তা, আমার বিশ্বাস যাবতীয় কিছু। প্রসঙ্গান্তরে না গিয়ে একটা বিষয় নিয়ে একটানা এতক্ষণ ধরে কথা বলতে আমি কখনই ওকে দেখিনি। আমার যে কিছু বলার থাকতে পারে, এ ব্যাপারটার কোন গুরুত্বই ওর কাছে ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন ও একাই এই ঘরে বসে রয়েছে।

সুতরাং এটাই ধরে নিতে হচ্ছিল যে আমার যা ধারণা ছিল, অর্থাৎ আমি ওকে যেভাবে ভালোবাসতাম, মৈত্রেয়ী আমাকে একইরকম ভালোবাসে তা সম্পূর্ণ ভুল! তেরো বছর বয়স থেকেই ওর মন, প্রাণ বাঁধা পড়ে আছে রবীন্দ্রনাথের কাছে। যেদিন থেকে ওনার সাহিত্যের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে। গতবছর ছাড়া প্রতিটি গ্রীষ্মই সে কাটিয়েছে শান্তি নিকেতনে তার সমগ্র পরিবারবর্গের সঙ্গে। অনেক সন্ধ্যা রাত্রি সে বৃদ্ধের পায়ের কাছে তাঁর কথা শুনে কাটিয়েছে। তিনি ওর চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। তাঁর কথা, তাঁর স্পর্শ ওকে নিয়ে যেত এই পার্থিব জীবনের উর্ধ্বে এক অতীন্দ্রিয় জগতে। ভক্তি, প্রেম নিয়ে এক আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে ও মগ্ন ছিল। একদিন রবীন্দ্রনাথ ওর সঙ্গে জাগতিক প্রেম নিয়ে আলোচনা করলেন। শুনতে শুনতে ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। যখন ওর জ্ঞান ফিরেছিল তখন ও নিজেকে আবিষ্কার করেছিল রবীন্দ্রনাথের বিছানায়। ঘরের মধ্যে ভাসছিল জুঁই ফুলের সৌগন্ধ। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ওকে দিলেন সেই মন্ত্র যা ওকে রক্ষা করবে পাপ থেকে। মনকে করবে পবিত্র, সুন্দর। তিনি ওকে বললেন সারা জীবন পবিত্র থাকতে, কবিতা লিখতে, ভালোবাসতে এবং ভুলে না যেতে। আর মৈত্রেয়ীও তাঁকে কখনো ভোলেনি, ভুলবেও না। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার লেখা সব চিঠি একটা চন্দন কাঠের বাক্সে ও সযত্নে রেখে দিয়েছে। বাক্সটায় রয়েছে রবীন্দ্রনাথের একগাছি কেশ। বাক্সটাও রবীন্দ্রনাথের উপহার।

কি ভাল অভিনেতা! হিংসা, ক্রোধ আর অক্ষম বিদ্রোহে আমি জ্বলছিলাম। এই কি মানুষ? অতীন্দ্রিয়বাদের মোড়কে ভোগ বাসনা, অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে প্রতারণা! এই যুবতীর শুচিতা আমি কি বিশ্বাস করতে পারি? কি করে আমি বিশ্বাস করবো আমিই ওর কাছে প্রথম 'পুরুষ'?……ওর গুরু ওকে

কখনও আলিঙ্গন পর্যন্ত করেন নি। শুধুমাত্র চুলে হাত বুলিয়ে আদর করেছেন। তাছাড়া অনেকদিন ওদের দেখা সাক্ষাৎও হয়না। রবীন্দ্রনাথ সারা বছরই প্রায় ঘুরে বেড়ান। তারপর!...তারপর! হায় আমি কি করবো? মিসেস সেন বোধহয় ওনার মেয়ের ব্যবহারে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি আর ওকে ওর গুরুর কাছে যেতে দেননি। কিন্তু মৈত্রেয়ী ওর গুরুকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকতে পারেনি। সে চাইছিল আমরা এমনই বন্ধু হই যাতে দুজনেই অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী হয়ে একযোগে রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসতে পারি। ও বন্ধুত্বের কথাই ভেবেছিল, প্রেম নয়। ভালোবাসা, কিন্তু শরীর বাদ দিয়ে। ও এই কথাগুলো বলেছিল লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে, নিচু স্বরে এবং ইংরাজীতে অনেক ব্যাকরণ ভুল করে। আমার প্রতি ওর ব্যবহারে কিন্তু আন্তরিকতা সহানুভূতির কোন অভাব ছিল না। আমাকে যথেষ্টই সময় দিত। খুশী হোত যখন চোখে চোখ, হাতে হাত রেখে আমরা বসে থাকতাম। ও বলতো, আমি ওকে অন্যভাবে নেওয়ার জন্য ওর নিজের ব্যবহারই দায়ী, ওর সব কথা খুলে বলা উচিৎ ছিল এবং এমন কিছু করা ঠিক হয়নি যাতে আমার ভাবনা চিন্তা অন্য দিকে বয়ে যেতে পারে।

কথা বলতে বলতে ও ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ওর কথা শেষ হতেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। আমার মাথা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। আমি সোজা ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর মুখ আমার দুহাতে ধরলাম। আমি জানতাম ও চিৎকার করতে পারবেনা, কোন সাহায্যও চাইতে পারবেনা কারো কাছে। দুহাতে ওর মুখ ধরে ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। জানতাম যে কোন মুহূর্তেই যে কেউই দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে পারে এবং লাইব্রেরীতে তার চোখ পড়তেই পারে! কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা যেন আমাকে আরও বেপরোয়া করে তুললো। গভীর চুম্বনে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হোল।

—কেন আপনি এরকম করছেন? আপনি জানেন আমি দুর্বল, আমার প্রতিরোধ শক্তি নেই। আপনি আমায় জড়িয়ে ধরলে বা চুমু খেলে আমার কিছুই উত্তেজনা হয়না।? আপনার ঠোঁটের সঙ্গে ছবির বা কোন শিশুর ঠোঁটের কোন তফাৎ আমি করতে পারিনা।? আমি আপনাকে ভালোবাসিনা।

আমি কিছুই না খেয়ে অফিসে চলে গেলাম। মৈত্রেয়ীর স্বীকারোক্তি আমার হিংসা, ঈর্ষা, রাগের কিছুটা উপশম করলো। বুঝতে পারছিলাম এই

নারী আপন প্রকৃতিকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারবেনা।

সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ওর আর দেখা হয়নি। রাতে খাবার টেবিলে ও ওর নির্দিষ্ট আসনে অর্থাৎ আমার ডানদিকের চেয়ারে এসে বসলো। টেবিলে আমি ছাড়া ছিল মণ্টু, রমু, আর মৈত্রেয়ী। আমরা রাজনীতি আলোচনা করছিলাম ; মেয়রের গ্রেপ্তার, সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা ইত্যাদি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ছিলাম আমি মৈত্রেয়ীর দিকে তাকাবো না, স্পর্শও করবো না ওকে যদি না কোন দুর্ঘটনাক্রমে তা ঘটে যায়। কিন্তু হঠাৎই অনুভব করলাম ওর উষ্ণ, নগ্ন পা আমার পায়ের ওপর। আমার সারা শরীরে যে শিহরণ দেখা দিল তা আমার প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত করে দিল। ওর মুখ ছিল ফ্যাকাশে কিন্তু ঠোঁট দুটো লাল। গভীর ভয়ের চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল ও। সে চোখে ছিল গভীর আমন্ত্রণ। নিজেকে সংযত রাখার জন্য আমি আমার বুকে নখ বসিয়ে ছিলাম। কিন্তু এর পর থেকে টেবিলের নিচে পায়ে পা জড়িয়ে আদর করা আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম হয়ে দাঁড়াল। খাওয়ার পর সেই রাতে ও আমার দরজায় আটকালো, বললো—আমার কাজ কতদূর এগুলো দেখবেন না ?

ও লাইব্রেরীর আলো জবালালো কিন্তু কাগজপত্রের টেবিলের দিকে না গিয়ে অন্য একটা অন্ধকার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। এই ঘরটার কাছে এসে ও ঘুরে দাঁড়াল। ওর ব্লাউজ ছিল কাঁধ অবধি অর্থাৎ জামার হাতা স্বাভাবিক প্রচলিত মাপ অনুযায়ী কনুই অবধি নয়। চারদিক ভাল করে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ও ওর নগ্ন বাহু আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো—আপনার যা ইচ্ছে আমার হাতে করতে পারেন। আদর করুন, চুমু খান যা ইচ্ছে করুন, দেখবেন আমার কিছু হবে না। আমি স্থির থাকবো, আমার মধ্যে কোন উত্তেজনা আসবে না।

বহুদিন আগে আমাদের মধ্যে ভোগ বিলাস নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম যে, যদি কেউ প্রকৃত ভালোবাসতে পারে তবে তার সামান্য স্পর্শেই তার প্রেমিক বা প্রেমিকা সুখ পাবেই। আরও বলেছিলাম মানুষের পক্ষে কোন মানুষকে তার শরীর-মনে সম্পূর্ণ অধিকার করার ব্যাপারটা আমরা যতটা সহজ ভাবে নিই ব্যাপারটা ঠিক ততখানিই জটিল। যাকে মনে করি যে সে আমার সম্পূর্ণ অধিকারে আছে আসলে হয়ত সে আদপেই তা নেই। ওই সব কথাগুলো দিয়ে আমি মৈত্রেয়ীর সূক্ষ্ম বিশ্বাসবোধ, ভাঙার চেষ্টা করেছিলাম।

আমি ওর হাত ধরলাম এবং সম্মোহিতের মতো কিছুক্ষণ ধরে দেখলাম। মনে হচ্ছিল কোন মানুষের হাত নয়। মনে হচ্ছিল ওর ওই অনুজ্জ্বল বাদামী

ত্বকের নিচে ওর বিশ্বাস আর আবেগ সঞ্চরমাণ। ও যেন হাতটা বাড়িয়ে ধরেছিল জ্বলন্ত আগুনের ওপর। পরীক্ষা করে দেখছিল আপন ইচ্ছা শক্তি। আমি ওর হাতটা নিজের হাতে নিলাম। ওর মধ্যে একটা শিহরণ অনুভব করতে পারছিলাম। ও বুঝতে পারছিল না আমি কি করতে যাচ্ছি। আমি ওর হাত ডলে পিষে দিচ্ছিলাম, আলতো করে হাত বোলাতে বোলাতে অসংখ্য চুমু খাচ্ছিলাম। ওটা শুধু একটা হাত নয় ওটা সম্পূর্ণ মৈত্রেয়ীর শরীর মনে করে সুতীব্র কামনায় জড়িয়ে ধরেছিলাম, আদর করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম ও ক্রমশই ইন্দ্রিয় সুখের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ওর মুখ তখন ফ্যাকাশে। চোখ আধ বোঝা। যে আঙুল, হাত ওর নগ্ন বাহুকে আদর করছিল ক্রমশঃ তা ওর সমস্ত শরীরের দিকে ধাবমান হোল। অনুভব করতে পারছিলাম ওর পা থর থর করে কাঁপছে, শরীরের ভার ক্রমশঃ আমার শরীরে এসে পড়ছে। ও ওর আরেকটি হাত দিয়ে আমাকে জোরে জড়িয়ে ধরলো। অব্যক্ত কান্নায় ওর শরীর ফুলে ফুলে উঠছিল। আমি ওর মুখে চুমু খেলাম। ওর ঠোঁট আপনিই খুলে গেল। দাঁত দিয়ে ও আমার ঠোঁট কামড়ে দিতে লাগলো। আমার কামনায় উন্মুখ উত্তেজনা! বুঝতে পারছিলাম ওর ভেতরে যে কামনা-বাসনা, পাপ-পুণ্যের বোধ এত দিন ধরে ফুটে উঠেছিল তা সন্ধ্যায় সূর্যের আলোর মতো ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে আর নতুন উষার আলোর মতো তার মধ্যে জেগে উঠছে নারীত্ব। সেই ক্ষণকাল মনে হচ্ছিল যেন কোন দিন না শেষ হয়।

একটা সময় নিজেকে ফিরে পেল ও। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টেবিলের দিকে এগুলো। মাঝে মাঝে দু হাত দিয়ে চোখ ঢাকছিল। টেবিলের কাছে গিয়ে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে বললো—আজকে এইটুকু কাজ করেছি দেখুন।

ঠিক এই সময় বাচ্চু এসে হাজির হোল। এসে জানাল মিসেস সেন মৈত্রেয়ীকে তাঁর ঘরে ডাকছেন। আমি লাইব্রেরীর আলো নিভিয়ে দিলাম। সেই মুহূর্তে আমার সৌভাগ্যে এতই বিগলিত হয়ে পড়েছিলাম যে বাচ্চুকে অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করে সব খুলে বলতে যাচ্ছিলাম।

ঘরে ফিরে এসে কিছুতেই এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না। একবার জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম; বিছানায় এসে শুলাম আবার উঠে পড়ে ঘরে পায়চারী করতে শুরু করলাম। মৈত্রেয়ীকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল। ওই ভাবে বাচ্চুর আগমনে ব্যাপারটা শেষ না হয়ে একটা বিদায়ী চুম্বনে শেষ হলে

হয়ত এরকম হোতনা। মনে হচ্ছিল মৈত্রেয়ীও নিশ্চয়ই একই কথা ভাবছে। আমি ছাদের ওপর হাল্কা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

বারান্দায় ওর ছায়া দেখতে পেলাম কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ও আলো নিভিয়ে দিল আর আমি প্রচণ্ড হতাশায় ভেঙে পড়লাম।

হঠাৎই একটা শিস্ দেওয়ার মতো আওয়াজ পেলাম। অন্তত আমার তাই মনে হোল। আমি জানালার কাছে গিয়ে শিস্ দিলাম। কোন উত্তর নেই। মনে হোল মৈত্রেয়ী দোতলার বারান্দায় আছে। আমি খুব সাবধানে আমার দরজা খুললাম তারপর আরো সাবধানে সদর দরজা খুলে ফেললাম। রাস্তায় নামতে আমার সাহস হচ্ছিল না কারণ রাস্তায় যথেষ্ট আলো ছিল। আমি আবার শিস্ দিলাম।

—অ্যালেন ; অ্যালেন…

ডাকটা দোতলার বারান্দা থেকে এল। এই প্রথমবার ও আমার নাম ধরে ডাকলো। বারান্দার রেলিং এ ঠেস দিয়ে ও দাঁড়িয়ে। গায়ে একটা শাল। গ্লিসিন ফুলের গুচ্ছের পাশে দাঁড়িয়ে ও। কালো এলো চুলে কোন চোরা পথে আসা টুকরো টুকরো বিন্দু বিন্দু আলো এসে পড়েছে। রূপকথার গল্পের চরিত্রের মতো মনে হচ্ছিল ওকে।

আমি চুপ করে ওকে দেখছিলাম। ওকে খুবই ক্লান্ত, বিপর্যস্ত লাগছিল। হঠাৎই ও শালের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বুকের কাছ থেকে সাদা মত কোন জিনিস বের করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। হাতে তুলে নিয়ে দেখলাম, জুঁই ফুলের একটা মালা।

পর মুহূর্তেই মুখ তুলে দেখি ও আর ওখানে নেই। ভীষণ খুশী মনে ফিরে এলাম সাবধানে। বারান্দার শেষ দিকে আসতেই খাচ্চুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। আমি ওকে কিছু বলার আগেই ও তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—আমি একটু জল খেতে এসেছিলাম।

সেই সময় আমার একবারও মনে হয়নি অত রাত্রে ও কি করছিল ওখানে বা একবারও সন্দেহ হয়নি ও আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে কি না। আসলে আমার মন তখন আনন্দে এতই অভিভূত ছিল যে মনে হয় আমার বুদ্ধি সঠিক কাজ করছিল না। জুঁই ফুলের মালা সম্পর্কে পরে জেনেছিলাম যে ওটা প্রায় বাগদানের সমান। সেই মুহূর্তে আমার ওসব কিছু জানার প্রয়োজনও হয়নি। মৈত্রেয়ী যখন ওটা আমাকে দিয়েছে সুতরাং ওটা আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান

সম্পদ এই ভেবে নিয়েই বহুবার চুম্বন করেছিলাম ওই ফুলের মালা। আমি খাটের ওপর বসে ফুলগুলো দেখতে দেখতে ভাবছিলাম পুরনো দিনগুলোর কথা। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এরকম কোন ঘটনা আমার জীবনে কোন দিন ঘটতে পারে। বুঝতে পারছিলাম মৈত্রেয়ীর সচেষ্ট ভূমিকা থাকলেও, যাতে ওকে আমি প্রেমাস্পদ না ভাবি, আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

রাতটা কাটলো স্বপ্ন আর স্মৃতির আনাগোনার মধ্য দিয়ে। ফুলের সৌগন্ধ আমাকে যেন শোনাচ্ছিল বাংলার সমভূমিতে মরালের ডাক। মনে হচ্ছিল সৌভাগ্যের দরজা আমার সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। অদূরে এক রূপকথার জীবন আমার জন্য অপেক্ষামাণ।

পরের দিন অফিসে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে আমার বাড়ি ফিরতে অনেক দেরী হোল। মৈত্রেয়ী আমার জন্য খাবার ঘরে অপেক্ষা করছিল। ও বর্ণমালা অনুযায়ী বই-এর নামগুলো এক একটা কাঠের বাক্সে শ্রেণীবন্ধ করে রাখছিল। আমাকে দেখা মাত্র ও দৌড়ে গিয়ে আমার খাবার নিয়ে এল। আমার কাছে চেয়ার টেনে বসলো। আমি বুঝতে পারছিলাম না কি দিয়ে কথা শুরু করবো। ও আমাকে এক দৃষ্টিতে দেখছিল। ভীষণ খিদে পেয়েছিল তাই গোগ্রাসে খাচ্ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় খাওয়া থামিয়ে ওর দিকে তাকালাম। আমার দৃষ্টিতে আমি ওকে বলতে চাইছিলাম ও আমার ভীষণ, ভীষণ প্রিয়।

—আজ একবারও আমার কথা তোমার মনে পড়েছে ?

আমি জানতাম প্রেমিক প্রেমিকারা পরপস্পরকে ওই ধরণের প্রশ্ন করে থাকে। কিন্তু আমি দেখলাম ওর চোখের কোণে জল।

—কাঁদছো কেন ?

আমার কণ্ঠস্বরে হয়ত যথেষ্ট কোমলতা ছিল না। কিন্তু আমি ওকে সত্যিই ভীষণ ভালোবাসতাম। তবু কেন ওর কষ্ট আমার মধ্যে একই সঙ্গে সঞ্চারিত হোল না ? কেন তখনও আমার খিদে পাচ্ছিল ?

ও কোন উত্তর দিল না। আমি হাত বাড়িয়ে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। তারপর আবার খেতে শুরু করলাম।

—অ্যালেন তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।

ও বাংলায় কথা বলছিল যাতে সম্বোধনটা তুমি করে বোঝান যায়। ওর গলার ওঠা নামা ছিল ভীষণ মিষ্টি।

ও আমায় রবীন্দ্রনাথের বাক্সটা দেখাল। বাক্সের মধ্যে সৌগন্ধ যুক্ত এক

গাছা সাদা চুল ছিল।

—এটা নিয়ে তুমি যা খুশি করো। ছুঁড়ে ফেলে দাও। সব পুড়িয়ে ফেল। আমি আর এটা আমার কাছে রাখতে পারছিনা। আমি রবীন্দ্রনাথকে কোনদিনও ভালোবাসিনি। ওনার জন্য আমার শ্রদ্ধা ছিল, আবেগ ছিল। বলতে পারো প্রায় পাগলামীর পর্যায়ে, কিন্তু প্রেম নয়। উনি আমার গুরুই থাকবেন, আর সেই হিসেবেই সারা জীবন ভালোবেসে যাব। কিন্তু আজ, আজ…

ও আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেন ও স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে। আমি কোন রক্ত মাংসের মানুষ নই। কি এক প্রবল প্রত্যাশা, নিবিড় আসক্তি যে ছিল সেই চোখে তা বর্ণনা করা যায় না।

—আজ কেবলমাত্র আমি তোমাকেই ভালোবাসতে চাই। আমি কাউকে এভাবে ভালোবাসিনি। আজ আমি সঠিকভাবে জেনেছি।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম কিন্তু শিবুকে দেখতে পেয়ে আমি ওর করমর্দনেই সন্তুষ্ট থাকলাম। আমি ওর বাক্স ওর হাতেই তুলে দিলাম। একগুচ্ছ হতভাগ্য সাদা চুলের ওপর হিংসা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়েছিল। জীবন জীবনই। অতীত স্মৃতিমাত্র। ওর বিগত জীবন নিয়ে যন্ত্রণা পাবার কোন মানে হয় না। শুধু কষ্ট হোত যখনই মনে হোত মৈত্রেয়ী আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে অথবা ওনার সঙ্গে আমাকে তুলনা করছে। তখন ডুবে যেতে চাইতাম এমন কোন যুগের চেতনায় যখন আমার আবির্ভাব হয়নি। নিশ্চই সে আমার এই ধরণের অবস্থার অন্য মানে করতো। ওর আত্মত্যাগ, ঝুঁকির পক্ষে অবমাননাকর মনে করতো। ও অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলল—তুমি এই চুলের সম্পর্কে কিছু বললে না তো?

—আমি কি করবো ওটা নিয়ে? তুমিই ওটা পুড়িয়ে ফেল। সেটাই আরও ভাল হবে।

—ওটার কোনই মূল্য নেই আমার কাছে এখন।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। চুলটা নিয়ে কোটের পকেটে ফেলে রাখলাম। ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে আমি স্নান করতে গেলাম। স্নানের ঘরে খোসমেজাজে আমি এত জোরে শিস দিচ্ছিলাম যে রমু ওখান দিয়ে যাবার সময় দরজায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো গত রাত্রে আমি কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছি কি না!

জামা কাপড় পরা শেষ হতে না হতেই মৈত্রেয়ী এসে দরজায় টোকা দিল। ও ঘরে ঢুকেই পর্দাটা টেনে দিল আর আমার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো,

মৃদু অস্ফুট স্বরে বললো—আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরতেই ও ছাড়িয়ে নিল নিজেকে।

—আমি কি কোন পাপ করছি ?

—কেন ? আমরা কি পরস্পরকে ভালোবাসিনা ?

—আমাদের সম্পর্কটা যেন বাবা মা কেউই না জানতে পারে।

—আমিই একদিন বলবো।

ও এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি পাগলের প্রলাপ বকছি।

—এসব কথা বলা অসম্ভব।

—কিন্তু এটাতো করতেই হবে। আজ নয় কাল। তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব তো আমাকে করতেই হবে। আমি বলবো আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। তোমার বাবা নিশ্চয়ই আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। তুমি তো জান উনি আমাকে কতখানি ভালোবাসেন।

—তুমি একটা জিনিস বুঝতে পারছ না। আমাদের বাড়ীর সবাই তোমাকে ভালোবাসেন। আমিও তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু তোমাকে আমায় ভালোবাসতে হবে ওঁদের মতো করে। অনেক আগে যেভাবে ভালোবাসতাম সে ভাবে…ভাই-এর মতো।

ওর হাতে একটা চুমু দিয়ে বললাম—আমি তোমার ভাই বা দাদা ! তোমার বাবা মাও বোধ হয় এরকম ভাবেন না।

—না সত্যিই তাই। তুমি কিছু বোঝ না। ও কাঁদতে শুরু করলো।

—ওঃ ভগবান ! এসব কেন ?

—তোমার অনুশোচনা হচ্ছে ?

ও আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

—তুমি বেশ জান যে যাই ঘটুক না কেন আমি তোমাকে ভালোবাসবোই। আমি তোমার। একদিন তুমি আমায় তোমার দেশে নিয়ে যাবে। আমি আমার দেশকে ভুলে যাবো। আমি ভুলতেই চাই……

আমার শরীরের সঙ্গে মিশে ও কাঁদতে থাকলো। তীব্র আবেগ আর দুঃখে ও ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিল।

—ওঁদের কিছু বোলনা। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ওঁরা কখনই মেনে নেবেন না। ওঁরা তোমায় ভালোবাসেন—চান তুমি ওঁদেরই একজন হও—ওঁদের ছেলে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। মৈত্রেয়ী বলেই চললো—ও'রা আমায় বলছেন। আলেন তোমার দাদা হবে। ওকে তোমায় ভালোবাসতে হবে আপন ভাই-এর মতো। তোমাকে ও'রা দত্তক পত্র নেবেন। যখন বাবার অবসর নেবার সময় হবে আমরা সবাই তোমার দেশে চলে যাবো। আমাদের টাকা কড়ি নিয়ে আমরা ওখানে রাজার হালে থাকবো। ওখানে এত গরম নেই, দাঙ্গা, হাঙ্গামা নেই। এখানকার ইংরেজদের মতো তোমার দেশের লোকেরা নয়। অত্যাচার, শোষণ কিছুই আমাদের সহ্য করতে হবে না। আমি ওনাদের কোন কথা না শুনে তোমায় কিভাবে ভালোবেসে ফেললাম…

মৈত্রেয়ী টলমল করছিল। ওকে ধরে না ফেললে হয়ত পড়েই যেতো। আমি ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। আমি ওর কথাবার্তা শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। বহুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না।

এক নতুন জীবন শুরু হোল। সেই দিনগুলোর স্মৃতি আজও সজীব। প্রতিটি দিন নিয়েই এত কথা আমি লিখতে পারতাম যে হয়ত একটা গোটা খাতাই ভরে যেত। অগাস্ট মাসের প্রথম দিকটা ছিল যেন অবকাশ যাপনের সময়। জামা কাপড় পাল্টানো, ডায়েরি লেখা আর ঘুমনোর জন্য ছাড়া আমি ঘরেই ফিরতাম না। মৈত্রেয়ী বি. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি ওকে সাহায্য করতাম। যদিও সংস্কৃত আমি একটুও বুঝতে পারতাম না তবু যখন ওর বৃদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষক আসতেন, আমি শকুন্তলা নাটকের ব্যাখ্যা শোনার জন্য ওর পাশে কার্পেটে বসে পড়তাম। বৃদ্ধ পণ্ডিত চোখে কম দেখতেন আর সেই সুযোগে আমি মৈত্রেয়ীকে লুকিয়ে চুরিয়ে আদর করতাম, জ্বালাতন করতাম।

মৈত্রেয়ী আমাকে কালিদাসের রচনা বুঝিয়ে দিত। কালিদাসের কাব্যে বিশেষ করে প্রেমের অংশগুলো ও ব্যাখ্যা করতো। যেন পরোক্ষভাবে নিজের কথা বলে যেত ও। সঙ্গীত, সাহিত্য বিশেষ করে বাংলা কবিতা যা যা ও ভালোবাসতো ক্রমশঃ আমিও তা ভালোবাসতে শুরু করলাম। বৈষ্ণব কবিতার মানে বোঝার চেষ্টা করতাম। সবচেয়ে মোহিত হতাম শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ পড়ে। তাক ভর্তি পদার্থ বিজ্ঞান, গণিতের বইএর প্রতি আকর্ষণ আমার ক্রমশঃ চলে যাচ্ছিল।

কয়েকদিন পরে ও আমাকে বললো ওর আরও কিছু স্বীকারোক্তির বাকি আছে। আমার প্রতি ওর ভালোবাসায় আমার কোনই সন্দেহ ছিল না। যে কোন সময়ই ওর উপস্থিতি ছিল আমার কাছে দারুণ কিছু প্রাপ্তির মতো। ও

কিছু বলার আগেই ওকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলাম।

—না, আগে আমার কথা শুনতেই হবে। তোমার সমস্ত কথা জানার দরকার। আচ্ছা, তুমি কি আগে কখনও এরকম করে ভালোবেসেছ?

—না, কোন দিনও না।

তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম আমি! সত্য, মিথ্যা বিচার না করেই। অথবা হয়ত এরকমই ভেবেছিলাম কি মূল্য আছে আমার কৈশোরের সেই ইন্দ্রিয়গত ক্ষণিকের ভালোলাগার। অন্ততঃ এই সব ভুলোন, পাগল করা ভালোবাসার কাছে! ও বললো—আমিও তাই ভাবি। কিন্তু একটা অন্যরকম ভালোবাসার কথা কি তোমায় বলবো?

—তোমার ইচ্ছে।

—আমি একটা গাছকে ভালোবাসতাম। আমাদের দেশে এই গাছের নাম সপ্তপর্ণী।

—ওটাকে ভালোবাসা বলে না।

—না ওটা ভালোবাসাই। ছবিও ওর গাছকে ভালোবাসে। আমার গাছটা ছিল বড় গাছ। সেই সময় আমরা বালীগঞ্জে থাকতাম। ওখানে খুব বড় বড় গাছ ছিল। আমি প্রেমে পড়লাম বিশাল এক সপ্তপর্নী গাছের সঙ্গে। আমি গাছটাকে রোজ না দেখে থাকতে পারতাম না। আমি রোজ ওকে আলিঙ্গন করতাম, কথা বলতাম ওর সঙ্গে। গাছটার গায়ে আমি চুম্বন করতাম, ওর কাছে গিয়ে আমি কাঁদতাম। মনে মনে কবিতা সৃষ্টি করে আমি ওকে আবৃত্তি করে শোনাতাম। ও ওর পাতা দিয়ে আমার গায়ে মাথায়, মুখে ঠাণ্ডা স্পর্শ দিতো। আমি একা ঘুমোতে পারতাম না। গাছটার কথা ভাবতে ভাবতে আমার অসুখ করে গেলো। আমার বুকের অসুখের সূত্রপাতও সেই সময়। আমায় অনেক দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। বিছানায় রোজ আমাকে ওই গাছেয় টাটকা ডাল পাতা এনে দিতে হোত।

আমার মনে হচ্ছিল যেন কোন রূপকথার গল্প শুনছি। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতে পারছিলাম ও যেন অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। এক জটিল মানসিক গঠন ছিল ওর। বুঝতে পারছিলাম একমাত্র শিক্ষিত সভ্য মানুষরাই স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন। যে ভারতীয়দের আমি এত ভালবাসি, ওদেরই একজন হয়ে উঠতে চাই, তাদেরই মনে এত জটিল দুর্ভেদ্য যে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারতাম না।

মৈত্রেয়ীর স্বীকারোক্তি আমায় কষ্ট দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ও একই সঙ্গে অনেক কিছুই, সব কিছুকেই ভালোবাসতে পারে। আমি হৃদয়ের অংশীদারী কারবারের বিশ্বাস করতাম না, চাইতাম ওর সমগ্র হৃদয় জুড়ে শুধু একজনেরই অস্তিত্ব থাকবে, আর সেটা হবো আমিই। তাই ওর কথাগুলো যে কতখানি আমায় কষ্ট দিচ্ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আমি ওর স্মৃতি থেকে কিছুই মুছে দিতে পারবো না। কি করে এক কিশোরী তার শরীর মন নিবেদন করতে পারে একটা গাছকে, কি করে একটা গাছের সঙ্গে একজন মানুষের মানসিক আদান-প্রদান ঘটতে পারে, এসব কিছু আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। ও আমাকে সেই গাছের পাতা আর ডাল এনে দেখাল। সেগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু এক মৃদু সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। আমি আমার ক্রোধ সম্বরণ করতে পারলাম না। ডাল, পাতা সব দুহাতে ছিন্ন ভিন্ন করে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিলাম। আমি ভাবতে পারছিলাম না ভালোবাসায় একটা গাছ আমার চেয়ে এগিয়ে আছে। কোথায় গেল আমার বিশ্বাস, যে ও আমাকেই শুধু ভালোবাসে, ওর জগৎ জুড়ে শুধু আমারই অস্তিত্ব!

ও আমার হাতে চুমু খেতে লাগলো। যেন নিশ্চিত করতে চাইলো যে ও নিজেও এইই চেয়েছিল। ও সব ভুলে গেছে, ওর গুরু, ওর গাছ ওর এখনকার ভালোবাসার সঙ্গে ওইসব ভালোবাসার কোন মিল ছিলনা। আমি চুপ করে ছিলাম। নিজের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। মৈত্রেয়ী কাঁদতে কাঁদতে বললো।

—তোমাকেই যদি একমাত্র ভালো না বাসতাম, আমি কখনই এসব কথা স্বীকার করতে পারতাম না। তোমাকেও বলতে হবে সেই সব মেয়েদের কথা যাদের সঙ্গে তুমি আগে মিশেছ, ভালোবেসেছ।

—আমি কোন দিনই কাউকে ভালোবাসিনি।

ও আশ্চর্য হয়ে গেল।

—তুমি এত দিন প্রেম ছাড়া বেঁচে আছ?

আমি ইতস্ততঃ করছিলাম। মৈত্রেয়ী আমার মন পড়তে পারলো।

—না আমি সেই সব মেয়েদের কথা জানতে চাইনা যাদের সঙ্গে তোমার শারীরিক সম্পর্ক ছিল। ওগুলো কলঙ্ক, পাপ, ভালোবাসা নয়।

ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সেই সময় ওদের গাড়ীর ড্রাইভার বারান্দা ধরে এগিয়ে আসছিল, হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনে অবাক হয়ে ও

মৈত্রেয়ীকে দেখলো এবং ভয় পেয়ে সেখান থেকে দ্রুত চলে গেল। পরে জেনে ছিলাম ড্রাইভারটা আমাদের ওপর নজর রাখত। মৈত্রেয়ী মুখের ওপর শাল চাপা দিয়ে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎই বলে উঠলো—আমায় কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ হচ্ছে? তোমার কি মনে হচ্ছে যে আমি দেহে এবং মনে শুদ্ধ নই?

আমি বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ওর কথাগুলোই আমার বুক ভেঙে দিচ্ছিল আর উল্টে ওই বলছে যে আমি ওকে কষ্ট দিচ্ছি? আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমি ওকে পাগলের মতো ভালোবাসতাম। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলাম আমার মন থেকে ওর অতীতকে মুছে ফেলতে। অপরপক্ষে ও ক্রমাগতই সেগুলোকে আমার সামনে মেলে ধরছিল।

সেই দিনই বিকেলে ও আর একটা ঘটনার কথা বললো। ওর তখন বারো-তেরো বছর বয়স। ওর মা ওকে নিয়ে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গিয়েছিলেন। মন্দিরের অন্ধকার গলিপথগুলো দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ ওর গলায় একটা মালা কেউ পরিয়ে দেয়। ও পরিষ্কার বুঝতে পারেনি মানুষটাকে। আলোয় এসে মিসেস সেন মালাটি দেখলেন এবং ওরা গলা থেকে খুলে নিয়ে নিজের হাতে রাখলেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে যখন ওরা বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করছিল তখন প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণের মধ্যেই কেউ ওকে একটা করে মালা পরিয়ে দিচ্ছিল। প্রদক্ষিণ শেষে মিসেস সেনের হাতে ছখানা মালা জমা হোল। উনি প্রচণ্ড রেগে চেঁচামেচি করে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। কারণ ওই মাল্য-প্রদানের অর্থ ছিল প্রায় বিবাহের সমান। ওনার চেঁচামেচির সময় একজন যুবক অন্ধকার থেকে সামনে এগিয়ে এল। অসম্ভব রূপবান ছিল সেই যুবক। যুবকটি নিচু হয়ে মিসেস সেনের পায়ে হাত দিয়ে বললো 'মা'। এইটুকু বলেই যুবক ভিড়ে আর অন্ধকারে মিশে গেল। যুবকটির রূপের বর্ণনা আমি শুনতে পারছিলাম না। আমার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল।

বহু বছর ধরে মৈত্রেয়ী সেই যুবকের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসার পরও। এই কথা শুনে আমার মনে হোল রবীন্দ্রনাথকে মৈত্রেয়ী বোধ হয় এখনও ভুলতে পারেনি। তাহলে···ভবিষ্যতে এমনও কি হতে পারে যে আরও একজন কেউ এল এবং মৈত্রেয়ী তাকেও একই সঙ্গে ভালোবেসে চললো! ওই ঘটনাটা ও রবীন্দ্রনাথকে বলেছিল এবং উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ওই যুবকটি ছিল ভালোবাসার দূত। আর মালাটা ছিল ভালোবাসার

প্রতীক। এইসব কথা শোনবার পর মৈত্রেয়ীর মনের জগৎ সম্পর্কে আমার সমস্ত ধারণা নতুন করে ভাবতে শুরু করলাম। এই দেশের গভীর জঙ্গল, ধর্মীয়, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, প্রতীক এসব কিছুর মতই দুর্বোধ্য এক মানসিক জগৎ। এই দুর্বোধ্যতার মিছিলের মধ্যে আমার অবস্থান কোথায়? এই কিশোরী মেয়েটি, যে কিনা আমায় ভালোবাসে তার মনের কোন জায়গায় আমার অবস্থান? আমায় জড়িয়ে ধরে মৈত্রেয়ী বললো—এখন আমি শুধুই তোমার। সত্যিকারের, বাস্তব ভালোবাসা আমি তোমার কাছেই পেয়েছি। কি ভাবে ভালোবাসতে হয় তুমিই আমাকে শিখিয়েছ। আমি তোমার কাছেই আত্ম-সমর্পণ করেছি। তুমি যখন রাগ করো আমার মনে হয় এক বিশাল ঝড় বইছে। তুমি আমাকে পা দিয়ে ঠেলে ফেললেও আমার আনন্দ হবে। তোমার কিসের ভয়?

বাস্তবিকই চিন্তিত হবার মতো কোন কারণ ছিল না। খাবার পর মৈত্রেয়ী আমার ঘরে এল। সবাই তখন ওপরে ফ্যানের তলায় ঘুমচ্ছে। বিরাট আরাম কেদারায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বসলো। আমি ওকে চুম্বন করতে শুরু করলাম। সেই দিন আমি ওকে দেখলাম। ভারতের মন্দিরগাত্রে যেসব অপ্সরা মূর্তি আমি দেখেছিলাম প্রায় তাদের মতো নিখুঁত। আনন্দ মিশ্রিত দারুণ ভয়ে মৈত্রেয়ী চোখ বুজলো।

আরাম কেদারার একটা হাতল ও চেপে ধরে রেখেছিল অপরহাতে আমার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করছিল।

—এটা কি পাপ নয়?

ওর চোখের কোণে অশ্রু ছিল। কয়েক গুচ্ছ চুল ওর ঠোঁটের কোণে এবং চিবুকে আটকে ছিল। আমি উত্তর দিলাম—যখন আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে তখন আমাদের ভালোবাসায় কোন সীমানা থাকবে না।

—কিন্তু এখন? এখন এটুকুই কি পাপ নয়?

—না, এখন তো আমরা সেভাবে আদর করছিনা।

—তবু বলো আমি কি পাপ করছিনা?

ও চোখ বন্ধ করে ঠোঁট কামড়ে ধরলো।

ও কি বলতে চেয়েছিল তা বুঝতে আমার কয়েক দিন লেগে গেল। প্রাচ্য নৈতিকতার বোধে ও পীড়িত হচ্ছিল। আলিঙ্গন, চুম্বন অবধি ওর বোধে ছিল ভালোবাসার বন্ধনের প্রতীক। তার সামান্য অতিরিক্তই নির্দিষ্ট গন্ডী অতিক্রম

করা। সংস্কার, কর্মফলের ভয়, ঈশ্বরের ভয় এদেশের ভালোবাসায় ইন্দ্রিয়কে অবদমিত করে রেখেছে। সেদিন রাত্রে নিজেকে বহু প্রশ্ন করেছিলাম কাকে বলে শুচিতা? শরীর ও মনের সততা? এর অর্থ কি—এর ব্যাখ্যা কি, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ধারণায়? প্রথম চুম্বনের পরই মৈত্রেয়ীর বিবেকের প্রতিরূপ কি?

অনেক ভেবে আমি ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। মিসেস সেনকে আমি সত্যিই ভীষণ ভালোবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম ওনার স্বামীকে, তাই ঠিক করলাম সুযোগ মতো আমি নিজেই মৈত্রেয়ীকে বিবাহের প্রস্তাব তুলবো।

তখনকার মতো সান্ত্বনা খুঁজে নিতে হোল আমাদের একসঙ্গে বাইরে বেড়ানোর মধ্যেই। মোটরে করে আমরা ঘুরে বেড়াতাম ব্যারাকপুর, হুগলী, চন্দননগর—প্রায় মধ্যরাত্রি অবধি।

গাড়ীতে নরেন্দ্র সেনের পরিবারের কেউ না কেউ থাকতেনই কিন্তু আমাদের দৃষ্টি শুধুমাত্র পরস্পরের প্রতিই নিবদ্ধ থাকত, তাই আমাদের অন্তরঙ্গতার মধ্যে অন্য কারো উপস্থিতি অনুভব করতাম না। গাড়ীতে করে কত গ্রামের ভেতর চলে গেছি। তাল, সুপারি, নারকেল গাছের নিচে কত ছোট ছোট বাড়ী দেখতে পেতাম। ছোট ছোট জংগল দেখে মনে হোত কি সুন্দর লুকোনোর জায়গা। গ্রামের লোকেরা আমাদের শুভেচ্ছা জানাতো। বড় বড় গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন রাস্তাগুলোর ওপর আমরা কত স্মৃতির স্বাক্ষর রেখে এসেছিলাম। বড় বড় পুকুর, যার পাশে কখনো কখনো আমার হাত ধরাধরি ধরে বসে থাকতাম। চন্দননগরের রাস্তা তখন ছিল নিস্তব্ধ, দুপাশে বড় বড় গাছ, অন্ধকারে মুঠোমুঠো জোনাকির আলো—এসব কথা কি ভুলে যাবার?

একটা বিশেষ রাত্রির কথা বেশ মনে পড়ে। রাস্তার মাঝে গাড়িটা গেল খারাপ হয়ে। ড্রাইভার আর শিবু যন্ত্রপাতি আর মিস্ত্রীর সন্ধানে বেরোল। নরেন্দ্র সেন গাড়ীর সিটে প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় আধ শোয়া। ছবি, মৈত্রেয়ী আর আমি তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। আকাশে চাঁদ ছিল না, এত অগণ্য তারা আমি একসঙ্গে কখনো দেখিনি। জোনাকির দল নির্ভয়ে আমাদের মুখে, কাঁধে, হাতে এসে বসছিল। মনে হচ্ছিল রূপকথার জীবন্ত মণিমুক্তো। আমরা কেউই কোন কথা বলছিলাম না। যদিও ছবির উপস্থিতির ভয় ছিল তা সত্ত্বেও অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার সুযোগে মৈত্রেয়ী আর আমি প্রায়ই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছিলাম। জানি না কোন্ এক মনোজগতে আমি বিচরণ করছিলাম। মনে হচ্ছিল এই অবস্থার যেন কোন আদি ও অন্ত নেই। প্রাচীন ইউক্যালিপটাস্ গাছ যেন

আকাশ স্পর্শ করতে উঠে গেছে। আমরা তিনজনে একটা নিস্তরঙ্গ পুকুরের ধারে বসলাম। নিকষ কালো জলে তারাদের প্রতিবিম্ব যেন সূক্ষ্ম জরির কাজের মতো লাগছিল। এক অদ্ভুত ভাবাবেগ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কোন কথা বলতে পারছিলাম না। আমার আত্মা প্রবেশ করছিল এক অলৌকিক প্রশান্তির মধ্যে।

আর একবার একটা ধানখেতের সীমানায় ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে আমি একটা জীর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ী আবিষ্কার করেছিলাম। ধানখেতে হাঁটার সময় আমার প্যাণ্ট হাঁটু অবধি ভিজে গিয়েছিল। প্যাণ্ট শুকোবার জন্য আমি সেই বাড়ীর প্রাচীরে বসেছিলাম। বন্য গাছপালায় বাড়ীটা প্রায় ঢেকে গিয়েছিল। তখনও সন্ধ্যা হয়নি, আকাশে তারাদের উদয় হয়নি। পড়ন্ত বিকেলের উষ্ণ হাওয়া ইউক্যালিপ্টাসের সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। সমস্ত পরিবেশটাই যেন আমাদের প্ররোচনা দিচ্ছিল, আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। মৈত্রেয়ী আর আমি পরস্পরের দিকে গভীর দৃষ্টি নিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়েছিলাম ঠিক সেই লাইব্রেরীতে যে ভাবে আমরা পরস্পরকে দেখতাম। হৃদয়ের সমস্ত উষ্ণতা দিয়ে আমি ওর মাথার চুলে একটা চুম্বন করলাম।

সেই সব বেড়ানোর দিনগুলো আমার স্মৃতিতে আজও সজীব হয়ে আছে। সেইসব দিনগুলোর মাধুর্য আজওআমায় বিচলিত করে। দৈহিক স্মৃতি চলে যায়, সম্পূর্ণ দৈহিক অন্তরঙ্গতার স্মৃতিও ম্লান হয়ে যায়, যেমন যায় আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার স্মৃতি। সেই সমস্ত সময় নির্বাক সম্মোহিত দৃষ্টি বিনিময়ের রহস্য আমি অনুধাবন করার চেষ্টা করতাম। একটা সময় গাড়ী এসে শহরে ঢুকত। সেখানে পর্যাপ্ত আলোর মধ্যেও আমাদের চোখ পরস্পরকে খুঁজে বেড়াত। দৃষ্টিতেই আমরা পরস্পরের কাছে আত্মসমর্পণ করতাম। ভাবতে অবাক লাগে আমাদের ভ্রমণসঙ্গীরা কি করে সমস্ত ব্যাপারটার প্রতি উদাসীন থাকত।

একদিন রাত্রিতে আমরা চন্দননগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। বৃক্ষশ্রেণী শোভিত প্রশস্ত রাস্তা উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত। কিন্তু আমার মনে এক ক্লান্তি আর অবসাদ আমি অস্বীকার করতে পারি না। রাস্তার দুপাশে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম প্রাসাদ অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ, পৃথিবীর আর এক প্রান্তে হারিয়ে যাওয়া লুপ্ত প্রায় ফরাসী ঔপনিবেশিকদের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিগুলো। ফেরার পথে আমি ভারতবর্ষকে বোঝার চেষ্টা করছিলাম—এই দেশ কোন্ আত্মশক্তির জোরে কিভাবে কষ্ট সহ্য করে, আত্মস্থ করে, যে সব যাযাবর জাতি জোর করে তাকে

দখল করে, শাসন ও শোষণ করে তাদের! বিংশ শতাব্দীর একটি আধুনিক মোটরগাড়ীতে ভ্রমণ করতে করতে আমি অনুভব করছিলাম, উপনিষদের ব্যাখ্যার মতো প্রায় অপ্রবেশ্য ও প্রায় অবোধ্য এক নিঃসঙ্গ আত্মার উপস্থিতি যা একই ভাবে অবাস্তব এবং পবিত্র। আমি পার্থিব জগতে ফিরে আসার জন্য সেই কিশোরীটির বাহু স্পর্শ করলাম যে আমাকে ভালবাসে।

প্রায়ই আমরা বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের আশ্রমে যেতাম বিশেষ করে উৎসবের সময়গুলোতে। মঠের সিঁড়িগুলি গঙ্গার জল অবধি নেমে গেছে। সৌরভে আচ্ছন্ন মন্দির। অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য। নিঃশব্দে আমরা সেখানে বেড়াতাম। প্রেম ভালবাসার কোন আকার ইঙ্গিত সব ভুলে যেতাম। মনে হোত আমি সেখানে এমন এক শান্তি পাই যা আমার আত্মা আগে কোনদিনও অনুভব করেনি।

একটা তীব্র আবেগ, একটা বদ্ধমূল দৃঢ় বিশ্বাস ক্রমশঃ আমায় ঠেলে দিচ্ছিল ধর্মান্তরিত হতে। হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে আমাদের বিবাহের সমস্ত বাধা দূর করতে।

বেলুড় মঠেই মৈত্রেয়ীর কাছে আমি প্রকাশ করেছিলাম আমার ধর্মান্তরিত হবার ইচ্ছা। ও প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেল, গভীর আনন্দে ও জানাল তাহলে কেউই আমাদের আর বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। সেদিন বিকেলেই আলিপুরের বাড়ীতে এসে সে খবরটা তার মাকে জানাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিচে নেমে আমার ঘরে এসে জানাল যে মিসেস সেন এবং উপস্থিত সব মহিলারাই প্রচণ্ড খুশী হয়েছেন এই প্রস্তাবে। আমরা ভাবমুগ্ধ হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম।

আমার ধর্মান্তরিত হবার অভিপ্রায় আমার কাছে শোনামাত্র নরেন্দ্র সেন বেশ রেগে গেলেন। শুধুমাত্র নতুনত্ব এবং কৌতুহলপূর্ণ উৎসবাদির আকর্ষণ ছেড়ে ধর্ম ও নীতির মূল ব্যাপারটা গভীরভাবে অনুধাবন করা আমার প্রাথমিক কর্ম কিনা এ প্রশ্ন আমাকে করলেন। তিনি নিজে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত এবং ধর্ম ত্যাগ করলে তাঁকে সামাজিক মর্যাদা হারাতে হবে এবং বাস্তবিকই আমারও কোন উদ্দেশ্য ছিল না তাঁকে এরকম কাজে প্ররোচিত করার।

এরকম সোজাসুজি জোরাল বিরোধিতায় মৈত্রেয়ী এবং আমি উভয়ই খুব ভেঙে পড়লাম। ঠিক করলাম যে অক্টোবর মাসটা পুরীতে কাটাব। সেখান থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে এলে আর কোন বিতর্কের অবকাশ থাকবে না।

এদিকে নরেন্দ্র সেন যিনি অনেক দিন ধরেই রক্তচাপে ভুগছিলেন, হঠাৎই তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাড়ীশুদ্ধ লোক বিপদের আশংকায় অস্থির হয়ে উঠল। গাড়ীতে বেড়ানো আর বিশেষ একটা হোত না। আমার বেশীর ভাগ সময়ই কাটত রুগীর ঘরে। উপন্যাস, দর্শন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই তাঁকে পড়ে শোনাতাম। শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় তিনি ভীষণই আত্মা, পরলোক এবং তাঁর রোগ নিয়ে চিন্তা করতেন এবং ওই সম্পর্কে পড়াশোনা করতে চাইতেন। আমি, শিবু ও মৈত্রেয়ী পালা করে তাঁর দেখাশোনা করতাম। শারীরিক কষ্ট তাঁর বিশেষ ছিল না তবে দিনের বেশীর ভাগ সময়ই তাঁকে চোখে কালো চশমা পরে শুয়ে থাকতে হোত।

আশেপাশে তখন অসংখ্য ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার জাতীয়তাবাদীকে জেলে পোরা হচ্ছিল। যখন তখন অশ্বারোহী পুলিশদের লাঠিচার্জ, ভবানীপুরে শিখদের ওপরে অত্যাচার, লুঠতরাজ। চোখের সামনে দেখেছি শিশুদের পর্যন্ত ধরে পেটাতে, স্ত্রীলোকদের আহত করতে। পুনরায় গৃহযুদ্ধের আশংকা দেখা দিচ্ছিল। আমার মনেও বিদ্রোহ দেখা দিল। যুক্তি তর্কের উর্ধ্বে উঠে আমার মধ্যে বৃটিশদের প্রতি ঘৃণা জন্মাতে শুরু করল। প্রত্যহ নতুন নতুন বর্বরতা খবরের কাগজ মারফত জেনে আমি রাগে ফেটে পড়ছিলাম। রাস্তায় যে কোন শ্বেতাঙ্গকেই আমি ঘৃণার চোখে দেখতাম। ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি করা প্রত্যেকটি জিনিষ আমি বয়কট করলাম এমনকি আমার প্রিয় তামাক পর্যন্ত। অবশ্য আলিপুরের বাড়ীতে নিজের জন্য আমাকে সামান্য জিনিষই কেনা কাটা করতে হোত।

শিখ পল্লী আক্রমণের কয়েকদিন পরে হারোও একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমার পূর্বের অনুমানই ঠিক। সে মোটা টাকা ধার চেয়ে বসল, একশ টাকা। আমার টাকাকড়ি থাকত চাটার্ড ব্যাংকে। আমি ওকে একটা চেক দিলাম। একটু পরোপকার করতে পেরে আমার ভালই লাগছিল। হতভাগ্য ছেলেটির তিনমাসের বোর্ডিং এর ভাড়া বাকি পড়ে গিয়েছিল এবং সামনের মাসে মাহিনার আগে খাবার কেনার টাকা পর্যন্ত হাতে ছিল না। আমার প্রচণ্ড খারাপ লাগছিল ভারতের একজন শত্রুকে সাহায্য করার জন্য। কারণ ততোদিনে আমি একজন প্রায় গোঁড়া দেশভক্ত বনে গিয়েছিলাম।

মৈত্রেয়ী আমাদের চা দিতে এসেছিল। আমি গান্ধী, বিপ্লব ইত্যাদি নিয়ে একটা বিতর্ক শুরু করার চেষ্টা করছিলাম। সমস্ত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মতো

হ্যারোও ঐ বিষয়ে রূঢ় নির্দয় মনোভাব পোষণ করতো। পুলিশ, সেনাবাহিনীর সন্ত্রাস, অত্যাচার ইত্যাদিতে সে ছিল মুগ্ধ। কিন্তু সদ্য সদ্য সে একশ টাকা ধার করেছে তাই আমার বিপরীত মনোভাব সে ব্যক্ত করতে পারে না। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম তার কাপুরুষতা।

হ্যারোও এর টাকা ধার করা ছাড়া আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল। সেটা ছিল, আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করা। আমার বাড়ীটা চিনে রাখা, আমি কিরকম কালা আদমীদের জীবন যাপন করছি এবং কতটা স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামে আছি এটা জানা। মৈত্রেয়ীকে দেখাটাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। সে যখন মৈত্রেয়ীকে আমাদের চা পরিবেশন করতে দেখল এবং আমার দিকে গোপন দৃষ্টি দিতে এবং হাসতে দেখল তখন পুরো ব্যাপারটাই সে বুঝল।

—অ্যালেন তোকে আমরা হারালাম। তোর আর কোন আশা নেই!

আমি ওর দিকে সোজা চোখে চোখ রেখে রেগে গিয়ে বললাম—এই সমাজে ঢুকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এ জগৎ জীবন্ত, এখানে সত্তাবান মানুষ আছে, যারা কষ্ট পায় কিন্তু অভিযোগ করেনা এবং যাদের এখনো কিছুটা অন্তত নীতিজ্ঞান আছে। এদের মেয়েরা পবিত্র, আমাদের মেয়েদের মতো প্রায় বারবধূ নয়। আমি একটা শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে বিয়ে করব! যারা কৌমার্য কি তাই জানে না? ত্যাগ বলতে কি বোঝায় তার কোন ধারণা যাদের নেই? আমাদের জগৎ, শ্বেতাঙ্গদের জগৎ একটা মৃত জগৎ। আমার ওখান থেকে কিছু নেবার নেই। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, এই সমাজে এই জীবনে প্রবিষ্ট হয়ে আমি যেন আমার পুরোন নির্বোধ স্বার্থ এবং অবাস্তবতার জীবনের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি। শুরু করতে পারি একটা নিখুঁত, পরিপূর্ণ, অর্থপূর্ণ ভালবাসার জীবন—আর এই শিক্ষা আমি পেয়েছি এদেরই সমাজে, এই বাড়ীতে।

যদিও তখন যে ধারণা আমি উদ্দীপনা ও সততার সঙ্গে প্রকাশ করেছিলাম তা আমার পরিষ্কার চেতনার নাগালে ছিল না। হ্যারোও কিন্তু প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেল। ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে কি উত্তর দেবে সে ভেবে পাচ্ছিল না, শ্বেতাঙ্গ সংস্কৃতির মৃত্যু, যা আমাকে বহুদিন বিচলিত করেছে সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই ছিল না। ওর বোধ হয় ইচ্ছে করছিল একগ্লাস হুইস্কি খেয়ে আমার বাড়ী থেকে চলে যেতে। কিছু না ভেবেই সে বলল—কি তোর ধর্ম?

—যা তোর ধর্ম তাইই কিন্তু আমার ধর্মকে আমি নতুন করে জেনেছি

এখানে, ভারতে। এই মাটিতে, যে মাটির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। যেখানকার মানুষ ক্ষুধার্ত কিন্তু ভালবাসার জন্য, স্বাধীনতার জন্য জ্ঞানের জন্য, সত্বার মুক্তির জন্য সতত নিরত। এই সান্নিধ্য ছাড়া খৃষ্টান ধর্মকেও আমি বুঝতে পারতাম না।

এ যাবৎ হারোও আমার কাছে কেবল শুনেছে প্রযুক্তিবিদ্যা, গণিতবিদ্যা ইত্যাদি আমার পড়াশোনার কথা, আজ হিন্দুইজম্, খৃষ্টানিজম্ সম্পর্কে আমার কথা শুনে সে অবাক হয়ে গেল। আমি অন্তরে অনুভব করতে পারছিলাম আমার এই যাবতীয় উদ্দীপনা এবং স্বতঃস্ফূর্ততার প্রাণশক্তি ছিল আমার ভালবাসা।

পরবর্তী কালে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আমার সমস্ত কাজ, ভাবনা সবই কি আমার ভাবপ্রবনতার কাছে দাসত্বের দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছিল! এটা হয়েছিল অনেক অনেক পরে, যখন আমি সত্য জানবার জন্য ঈশ্বরকে খুঁজেছিলাম ...হ্যাঁ!...সত্য!...হারোও বলল—আমি তোর সব কথা বুঝতে পারলাম না। ঈশ্বর তোকে বাঁচিয়ে রাখুন আর অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষে করুন।

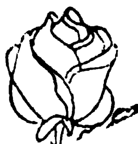
হারোও চলে যাবার পর আমি খানিকটা বিচলিত হয়েই ঘরে পায়চারি করতে লাগলাম। ভাবছিলাম যা চিন্তা করি তাই কি প্রকাশ করতে পারলাম। এমন সময় মৈত্রেয়ী ঘরে ঢুকে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল—যাক, তোমার বন্ধু শেষ পর্যন্ত গেছে......তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল।

ওকে আমার দুবাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধরেও এই প্রথমবার আমার ভয় হোল যে ওর ভালবাসাও হয়তো একদিন আমাকে ক্লান্ত করতে পারে। হারোও চলে যাবার পর, অন্ততঃ একঘণ্টা আমি একা থাকতে চেয়েছিলাম। ওর উপস্থিতি আমায় বিচলিত করেছিল। চাইছিলাম আমার বোধ শক্তি, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি এক পারম্পর্যে স্থাপন করতে।

কিন্তু বুঝতে পারলাম ও এতক্ষণ নজর রাখছিল কখন আমার বন্ধু চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে এসে আমার বাহুতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। মনে হচ্ছিল আমার নিজস্ব সত্বার একটা অংশ আমি যেন বিকিয়ে দিয়েছি। একথা ঠিক, মৈত্রেয়ীর কাছে নিজেকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিলাম, তার থেকে কখনও দূরে থাকিনি। ওর ছবি আমাকে অনুসরণ করেছে আমার নিদ্রার প্রান্ত অবধি। কিন্তু আমার একটা নিজস্ব নির্জনতারও প্রয়োজন আছে, যা

ও কথনোই অনুভব করতে পারত না। কেন, এক প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের মানসিক অবস্থা কল্পনা করতে অক্ষম হবে ?

ওকে জড়িয়ে ধরে ওর সুগন্ধি চুলে আমি ধীরে ধীরে আমার ঠোঁট দুটি স্পর্শ করলাম। এমন সময় হঠাৎই বাচ্চু এসে ঘরে ঢুকল এবং আমাদের ঐ অবস্থায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আর যাবার সময় বলে গেল —মাপ করবেন !



বাড়ী ফিরে এসে দেখি টেবিলের ওপর একটা চিরকুট। তাতে লেখা লাইব্রেরীতে এসো"।

মৈত্রেয়ী আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। বেশ ভয় মাখান কণ্ঠস্বরে বললো,

—বাচ্চু বোধ হয় সব জেনে গেছে।

আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে ওকে আশ্বস্ত করার চেণ্টা করতে লাগলাম। ওর হাতের মধ্যে আমার দুটো হাত চেপে ধরে ও এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমায় বলেছিল আমার ওই শান্তভাবের মধ্যে ও নির্ভরতা খুঁজছিল।

—বাবাকে কিছু জানানোর আগে আমাদের পরস্পরের কাছে আবদ্ধ হওয়াটা জরুরী। বাবা অসুস্থ। এসব কথা জানালে উনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

—একথা উঠছে কেন? আমরা কি অনেক আগে থেকেই পরস্পরের কাছে আবদ্ধ নই। তুমি আমাকে মালা দিয়েছ, আর আমি তোমাকে আবদ্ধ করেছি আমার বুকের মধ্যে।

—হ্যাঁ ঠিকই। কিন্তু শোন, আমাদের দুজনের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস আর নির্ভরতা জোরদার না করলে যদি কিছু নিন্দা হয় তার মুখোমুখি আমরা দাঁড়াতে পারব না। আমাদের ছন্দপতন হবে।

ও ভয়ার্ত চোখে চারপাশ দেখছিল। মৈত্রেয়ীর ইচ্ছা, আসক্তি এবং কৌলিন্যের সংঘাতকে উপলব্ধি করছিলাম। কত আর ঈশ্বরকে ডাকবো, আমাদের ভাগ্য সুনিশ্চিত করার জন্য! মৈত্রেয়ী বললো,—তোমার আংটির পাথরটা আমি নিজে পছন্দ করেছি। মৈত্রেয়ী শাড়ীর আঁচলের কোনে বাঁধা গিঁট খুলে একটা লম্বাটে অলঙ্কার দেখাল। গাঢ় সবুজ আর লাল রঙের ছিল ওটা। ও আমাকে আংটির অর্থ বোঝাল। হিন্দু বিবাহ রীতি অনুযায়ী ওটা সোনা আর লোহার মিশ্রণে তৈরি। দুটো সাপ যেন পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে। একটা লোহার রঙের অপরটি সোনালী। প্রথমটা পৌরুষের আর দ্বিতীয়টা নারীত্বের প্রতীক। মিসেস সেনের সিন্দুকের মধ্যে পারিবারীক অলংকারের বাক্সে একগাদা অলংকারের মধ্যে থেকে ও এটা বেছে নিয়েছে। মায়ের অজান্তে ও এটা নিয়ে এসেছিল। আমি ভাবছিলাম ও নিজেকে বাঁচাবার চেণ্টা কেন করছিল! পরে উত্তরটা পেয়ে যাই, আসলে ও ভয় পাচ্ছিল খৃস্টীয় অনুশাসনের অর্থাৎ নৈতিকতার নামে পাপকর্ম করার।

পারম্পরিক বন্ধন বা চুক্তি কিছুই এর ওপর নির্ভর করেনা। আসলে মেয়েদের হাতে পরিয়ে দেওয়া হয় একটা সোনা আর লোহায় জড়ানো বালা। যেহেতু মৈত্রেয়ীর তা পরার সাহস ছিলনা তাই আমার……

ও অনেক কথা বলছিল সেই সন্ধ্যায়। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। কিন্তু ওর ওই অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ এবং আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর আমার মানুষের সঙ্গে মানুষের মধ্যে সহজ সরল সম্পর্কের ধারণার সঙ্গে একটা বিরোধিতা করছিল। আমাদের ভালোবাসাকে একটা নিয়মাবদ্ধ প্রতিকের কাছে সমর্পণ করায় আমার মন সায় দিচ্ছিল না।

স্বর্ণকার যেদিন আংটিটা নিয়ে এল আমি উল্টে পাল্টে দেখলাম ছেলেমানুষের মতো। বাড়ীর কেউ ওয়াকিবহাল ছিল না শুধু রমু ও ঋতু আমার বিয়ে নিয়ে এ ব্যাপারে একজন ভারতীয়র সঙ্গে কথা বলেছিল। কিন্তু সবটাই ঘটেছিল সাধারণ হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে। আবার ইঞ্জিনিয়ার তখনও অসুস্থ ছিলেন। উনি ছুটি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন এবং মিসেস সেনের ওঁকে শুশ্রূষা করা ছাড়া অন্য কোনও কাজ ছিল না।

পরের দিন মৈত্রেয়ী খুব ক্লান্তির ভান করছিল। ঘণ্টাখানেকের জন্য লেকের ধারে ঘুরে আসবার জন্য একটা গাড়ী চাইল। ছবি আমাদের সঙ্গে যেতে চাইল। কিছুদিন ধরেই ছবির শরীর মন ভালো যাচ্ছিল না, সারাক্ষণই চুপচাপ থাকতো। খুব কম কথা বলতো। আর একদৃষ্টে শূণ্যে তাকিয়ে থাকতো অথবা সঙ্গীতহীন গান গাইতো। মিসেস সেন ওকে ছাড়লেন না এবং আমাদের সঙ্গে বাচ্চুর এক বোনকে দিয়েছিলেন। মহিলা ছিলেন বিধবা, খুব শান্ত প্রকৃতির। কাজ করতেন ক্রীতদাসের মত। কোনদিন গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়াবার সৌভাগ্য হবে উনি ভাবতেই পারতেন না। বেরোবার সময় আমি ড্রাইভারের পাশে বসলাম আর ওরা দুই যুবতী বসলো পিছনের সিটে। লেকে পেঁছে বিধবা মহিলাটি গাড়ীতেই রইলেন। গাড়ীটা রইল, রাস্তার কাছে, একটা বিরাট ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের তলায়। ড্রাইভার গেল লেমনেড খুঁজতে আর মৈত্রেয়ী আর আমি গেলাম জলের ধারে।

কলকাতায় যাবার জায়গার মধ্যে সব চেয়ে আমার ভালো লাগতো লেকের ধার। কারণ শহরটা ক্রমশঃ হয়ে উঠছিল একটা মানুষের জঙ্গল। শান্ত, বিশাল জলাশয়ের ওপর উড়ে আসতো ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। যদিও আমি জানতাম ওই লেকের ওপারে আছে রেল লাইন, অপর প্রান্তে রয়েছে শহরতলী। তবু আমার

সদ্য গজিয়ে ওঠা গাছপালাদের দেখে মনে হোত ওরা পাল্লা দিতে চাইছে পুরনো বড় বড় গাছেদের সঙ্গে। দু-একটা আলোর ব্যবস্থা তখন সবে মাত্র হয়েছে তাই রাত্রি এখানে ছিল অনেক গাঢ়। শহরের কোলাহল থেকে দূরে এই অঞ্চলটা আমায় ফিরিয়ে দিত আমার প্রথম কর্মজীবনের স্মৃতির স্নিগ্ধতা।

আমরা একটা ঘন গাছের কাছে এসে থামলাম। মৈত্রেয়ী আমার আঙ্গুল থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে রইল—অ্যালান আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার এটাই উপযুক্ত মুহূর্ত। মৈত্রেয়ীর দৃষ্টি ছিল দূরে, জলের দিকে। ঐ রকম নাটকীয় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রেক্ষাপট ছিল এমন যেন মধ্যযুগীয় কোন প্রেমের দৃশ্যের বর্ণনা। মৈত্রেয়ী যেন জল, তারা ভরা আকাশ, অরণ্য আর মাটিকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছিলে। ঘাসের ওপর ভর দিয়ে ও বসে ছিল। হাতে ধরা ছিল আংটিটা। সেই অবস্থায় মৈত্রেয়ী প্রতিজ্ঞার বাণী উচ্চারণ করলো :—

'মৃত্তিকা, আমি তোমার ওপর প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি অ্যালানের হবো। আমি ওর ওপর বর্ধিত হবো যেমন ঘাস তোমার ওপর বর্ধিত হয়। যেমন তুমি বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকো, তেমনি আমি ওর আসার অপেক্ষায় থাকবো। ওর দেহ থাকবে আমার জন্য যেমন তোমার জন্য থাকে সূর্যের আলো। আমি তোমার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি যে আমাদের সঙ্গ সমৃদ্ধ হবে কারণ আমি নিজে স্বাধীন ইচ্ছা পছন্দ করি। যদি কিছু খারাপ আসে তবে তা যেন ওর ওপর বর্ষিত না হয়ে আমার ওপর বর্ষিত হয়। মা মৃত্তিকা তুমি শোন, তুমি আমায় কোন মিথ্যা বোল না…যদি তুমি আমায় এতখানিই ঘনিষ্টভাবে অনুভব করো যেমন আমি তোমায় করি, তাহলে এই মুহূর্তে, আমায় এমন শক্তি দাও যেন আমি সব সময় ওকে ভালোবাসতে পারি। আমি ওকে এমন আনন্দ দিতে পারি যা অন্যরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। যেন দিতে পারি একটা সফল জীবন। আমাদের জীবন যেন ঘাসের মতন আনন্দদায়ক হয় যে তোমার থেকে বর্ধিত হয়। আমাদের চুম্বন যেন হয় প্রথম দিনের বর্ষার মত। আমার হৃদয় যেন কখনও অ্যালানের প্রতি ভালোবাসায় ক্লান্ত না হয় যেমন তুমি কখনও ক্লান্ত হও না। অ্যালানকে ঈশ্বর জন্ম দিয়েছেন কত দূরে কিন্তু আমার ছোট্ট মা আমাকে নিয়ে এসেছে ওর কত কাছে…'

আমি ওর কথা শুনছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত বোধগম্য হচ্ছিল। ও ছোট্ট মেয়ের মত বাংলা বলছিল। ও যে কি বলতে চায় আমি সঠিক অনুধাবন করতে

পারছিলাম না। যখন ও চুপ করলো আমার ভয় হচ্ছিল ওকে স্পর্শ করতে, ও এতখানিই তন্ময় হয়ে বসে ছিল। আমি ওর কাছে হাঁটু গেড়ে বসলাম, একটা হাত মাটির ওপর রেখে। ও-ই প্রথম কথা বলল।

—আমাদের এখন আর কেউ আলাদা করতে পারবে না অ্যালান। এখন আমি তোমার, সম্পূর্ণ তোমার।

ওর প্রতি অনুরাগে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, খুঁজছিলাম এমন কথা যা কোন দিন বলা হয়নি। কিন্তু কিছুই নতুন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিছুই খুঁজে পাইনি যা আমার অন্তরের উত্তেজনা প্রশমন করতে পারে। ওর আচরণে এমন একটা অদ্ভুত নির্দিষ্টতা ছিল যা আমার অনেকদিন মনে ছিল।

—একদিন তুমি আমাকে তোমার স্ত্রীরূপে বরণ করবে এবং তুমি আমাকে সেই জগৎ দেখাবে, তাই না ?

ও ইংরেজীতে এই রকম কিছু কথা বলেছিল। কিছু স্থূল জাতীয় কথা বলার জন্য ওকে খুব লজ্জিত দেখাচ্ছিল।

—আমি একদম বাজে ইংরাজী বলি অ্যালান। কি জানি কি বাজে কথা ভাবছো আমার সম্বন্ধে। আমি বলতে চাই যে এই জগৎ আমি তোমার সঙ্গে দেখতে চাই, দেখতে চাই এমন ভাবে ঠিক যে ভাবে তুমি এই জগৎকে দেখ। পৃথিবীটা কত বড় আর সুন্দর, তাই না ? কেন লোকেরা আমাদের চারদিকে এত যুদ্ধ করে ? আমি চাই অনুভব করতে। চাই যে সবাই আনন্দে থাকুক। কিন্তু না, আমি অর্থহীন কথা বলছি। আমি জগৎটাকে যেমন ভাবি সেটা কি তেমনই ! যেমন ভাবি !

ও হাসতে লাগলো। গত শীতে মৈত্রেয়ীকে যেমন দেখেছিলাম এখন সেই রকম দেখলাম। নিষ্পাপ, চমকপ্রদ। অনর্গল কথা বলছে। আপাতবিরোধী কিন্তু সত্য বিরোধী নয় এমন সব কথায় আনন্দ পাচ্ছে। সেই অভিজ্ঞতার সব চিহ্ন যা ওকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত করেছে, মনে হচ্ছিল যেন মুছে গেছে।

বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের ভালোবাসার বন্ধনই ওকে শান্ত করেছে, অবাধ সুখানুভূতি দিয়েছে। যখন আমাদের বন্ধন ওর দ্বারা স্বীকৃত এবং প্রচারিত হোল, ওর সব ভয় চলে গেল।

রাত্রি হয়ে আসছিল, তাই আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে ফিরে এলাম। এইবার, প্রথমবার আমি মৈত্রেয়ীকে আলিঙ্গন বা চুম্বন কিছুই করিনি। শালটাকে মাথা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গাড়ীতে বসে আমাদের সঙ্গী ঝিমোচ্ছিল। আমাদের দিকে

দেখল যেন দুষ্কর্মে সহযোগিতার আনন্দ নিয়ে। আমরা এগোচ্ছিলাম ধীরে ধীরে। আমি মৈত্রেয়ীর থেকে কিছু বড়। ও কিছু ছোট আর অবিশ্বাস্যকর সুন্দরী। ওর মুখশ্রী সৌজন্যপূর্ণ এবং স্বাধীনতা, জয়ের আনন্দের ছাপ ওর প্রত্যেকটা ভঙ্গীতে।

অনেক পরে আমি মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে জেনেছিলাম যে বাচ্চুর বোনই প্রথম যাকে জানানো হয়েছিল আমাদের প্রেমের কথা এবং সে যতটা সম্ভব তা গোপন রাখার চেষ্টা করেছিল। এই মেয়েটি একটি অমানানসই ব্যক্তিকে বিয়ে করার দরুণ দারুণ কষ্ট পেয়েছে। বিয়ে করেছিল দশ বছর বয়সে এক ব্যক্তিকে যাকে সে আগে কোনদিন দেখেনি এবং তাকে সে দারুণ ভয় করতো। ব্যক্তিটি তাকে নৃশংসভাবে বলাৎকার করেছিল এবং প্রতি রাত্রে তার কামোচ্ছাসের আগে ও পরে মেয়েটিকে মারধোর করতো। এই মেয়েটি সব সময় মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়েছে জাত-ধর্মের নিয়মের প্রতি ভয় না পেতে এবং সব রকম প্রতিরোধের বিরুদ্ধেও আমার সঙ্গ রাখতে। সে ছিল আমার পরম মিত্র এবং মৈত্রেয়ীর সব চাইতে ভালো বন্ধু। তবু ওকে আমি খুব কমই দেখেছি এবং দৈবাৎ ওর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি জানি না তার নাম কি। আমি আমার ডায়েরি অনেকবার পড়েছি ওর নামটা আবিষ্কার করার জন্য। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাইনি।

সেই রাত্রেই ছবি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লো। মিসেস সেন ওকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়ালেন। কেউ বুঝতে পারছিল না তার কি হচ্ছিল। লক্ষণ-গুলো ছিল অদ্ভুত; ও সব সময় চাইছিল জানলা বা বারান্দায় ঝুঁকে থাকতে। ওর বিশ্বাস ছিল ও নিচে কিছু দেখতে পাবে, রাস্তার ওপর, যা ওকে ইশারা করে ডাকছে।

সারা দিনের ঘটনার পর কিছুটা ক্লান্ত হয়েই আমি শুয়ে পড়েছিলাম। আমার নানান অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার কথা—জলের ধারে ঘুরে বেড়ান, রাজহাঁস, জোনাকি, কারণ আমার মন ছিল খুব বিশৃঙ্খল। ঠিক সেই সময় আমার দরজায় করাঘাত শুনে জেগে লাফ দিয়ে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—কে? কেউ উত্তর দিল না। স্বীকার করছি আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলান এবং আলো জেবলেছিলাম। দরজা খুলে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ঃ দরজায় মৈত্রেয়ী। ও দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। পা খালি যাতে আওয়াজ না হয় এবং পরণে হালকা সবুজ রংয়ের শাড়ী। আমি বুঝতে পারছিলাম না কি করবো।—আলোটা নিভিয়ে দাও, আমার ঘরে ঢুকে খুব নিচু গলায় বললো। তারপর আমার আরামকেদারার পিছনে

গিয়ে লুকোলো, মনে ভয় যদি ওকে কেউ বাইরে থেকে দেখে থাকে।

আমি আলো নিভিয়ে দিয়ে ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে বোকার মত জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে মৈত্রেয়ী? এত রাত্রে?

ও কোন উত্তর দিল না। চোখ বন্ধ করে, ঠোঁট চেপে ধরে আর খুব কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। মৈত্রেয়ী নিরাবরণ হোল। অল্প আলোর দীপ্তিতে স্নান করে আমার ঘর আলোকিত করছিল ওর শরীর। ঘটনাটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। প্রায়ই আমি আমাদের প্রথম প্রেমের রাত্রির স্বপ্ন দেখতাম, দেখবো বলে বিশ্বাস করতাম সেই শয্যা যেখানে আমি ওকে জানবো, কিন্তু কোনদিনই মৈত্রেয়ীর যৌবনপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাকৃত নগ্ন দেহের কল্পনা করিনি। আমার সামনে সেই রাত্রি। অন্য কোন পরিবেশে হয়ত আমাদের মিলন হবে এরকমই মনে হোত। কিন্তু ওর ঐ স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্ম আমার সব দুরাশাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। খুব আলতো ভাবে আমি ওকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলাম। ওর ঊর্ধাংশ ছিল নগ্ন। আমার হাত ওর নিতম্ব স্পর্শ করলো। কোমরে ওর শাড়ীটা তখনও আলগা ভাবে লেগে ছিল। ওর সুগঠিত নিতম্ব থেকে শাড়ীটা খসে পড়লো পায়ের কাছে। পবিত্রকে অপবিত্র করার জন্য আমি কাঁপছিলাম এবং ওর সামনে আমি নতজানু হয়ে বসলাম। ওর মূর্তি আমার কাছে এক অকল্পনীয় সৌন্দর্য নিয়ে এসেছিল। ও হাত দিয়ে আমার ঘাড় জড়িয়ে ধরলো। এক দিকে অজানাকে জানার আনন্দ অপর দিকে শুচিতাবোধ, ভয় এই দুই-এর দ্বন্দ্ব তখন ওর চোখে মুখে। অবশেষে ভয় ও অসহায়তাকে জয় করতে সক্ষম হোল। ওর সমস্ত শরীরে তখন এক নতুন ছন্দ। আমার বিছানায় শোবার জন্যে ওকে আমি সাহায্য করতে গেলাম। ও প্রত্যাখ্যান করে নিজেই বালিশে চুমু খেয়ে এগিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই ওকে আমার সাদা সুজনীর ওপর ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম একটা প্রাণবন্ত ব্রোঞ্জের মূর্তির মতন। ও কাঁপছিল, রুদ্ধশ্বাসে বার বার আমার নাম ধরে ডাকছিল। আমি জানলার খড়খড়িগুলো নামিয়ে দিলাম আর রাত্রি নেমে এল আমাদের ঘরে। পরে আমার আর কিছুই মনে নেই। ভোরের দিকে ও উঠে পড়ল। দরজাটা অতি সন্তর্পণে বুকের ধুকপুকুনি নিয়ে খুলে দিলাম। ও সরলভাবে বলল—আমাদের এই মিলন ঈশ্বর নির্দেশিত। তুমি দেখছ না আজকে ছবি আমার সঙ্গে শোয়নি?

যে সিঁড়িটা ওর ঘরের দিকে গেছে সেখানে আমি ওর পায়ের আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না।

সকালবেলা মৈত্রেয়ীই আমাকে চায়ের জন্য খুঁজতে এলো। ও বাগানের ফুল নিয়ে এসেছিল। ফুলগুলো ফুলদানিতে যখন ও সাজিয়ে দিচ্ছিল, ওর মুখের বিবর্ণতা আমাকে আঘাত করছিল। চুলগুলো অগোছালো হয়ে ওর ঘাড় ঢেকেছিল। পরে ও বলেছিল যে আমি ওর চুলগুলো এমন বিশৃঙ্খল করে দিয়েছিলাম যে ও আর গোছাতে পারেনি। ওর ঠোঁটে ছিল কামড়ানোর দাগ। আমি চূড়ান্ত স্বর্গসুখ নিয়ে আমাদের প্রথম দিনের রাত্রির চিহ্নগুলো স্মরণ করছিলাম। মৈত্রেয়ী ছিল উজ্জ্বল, সুন্দরী। ও বলেছিল ওর সমস্ত শরীর পুরোপুরি জেগে উঠেছিল। বলেছিল যে ছবির জন্য ও ভীষণই উদ্বিগ্ন ছিল এবং সারা রাত্রি ঘুমোতে পারেনি। একদিকে বাবার অসুখ আবার ছবির এই অবস্থা ওকে প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ফেলেছিল।

দিনটা যে কি ভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। নরেন্দ্র সেনের বদলী যিনি কাজ করছিলেন তার সঙ্গে সারা দিন ব্যস্ত রইলাম। ফিরে এসে দেখতে পেলাম মৈত্রেয়ী বারান্দার তলায় ডাকবাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে চুল আঁটবার বাঁকানো পিন দিয়ে তৈরী পাথরের মতন বোতাম দেওয়া একটা রিং দেখালো যা ওর আঙুলে পরা ছিল।

—রাত্রে তোমার দরজা বন্ধ রেখো না। এ কথা বলেই মৈত্রেয়ী চলে গেল।

প্রায় মধ্য রাত্রে ও এল। কিন্তু এবার আর ভয় পাচ্ছিল না। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে হাসছিল। আমি আনন্দ পাচ্ছিলাম এই দেখে যে যা ভুল হয়েছে তার জন্য ও বিষণ্ণ ছিল না। আন্তরিক ছিল ওর আঁকড়ে ধরা, আকুলতা ছিল ওর ডাকে এবং চমৎকার ছিল ওর সোহাগ। প্রথম থেকেই ওর জ্ঞান সম্বন্ধে আমি অবাক হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যে কিছুই ওকে সংকুচিত করছিল না যদিও সে সব রকম অশালীনতা থেকে বিরত ছিল। এই অল্পবয়সী মেয়েটি যে ভালোবাসা সম্পর্কে কিছুই জানতো না আবার তাকে ভয়ও পেত না। কোনও সোহাগই তাকে ক্লান্ত করছিল না, পুরুষের কোন আচরণই তাকে নিরুৎসাহ করছিল না। ওর সবরকম সাহস ও সমর্পণ ছিল। প্রত্যেকটা উদ্যমের মধ্যে ও পূর্ণ আনন্দ পেত এবং না জানতো বিরক্তি না শ্রান্তি। কাঁদত দুঃখে ও মিলন মুহূর্তের আনন্দে। গান গাইত পরে, ঘর জুড়ে নাচত ওর ঈশ্বরীয় হাল্কা ও নমনীয় পা দিয়ে। ও এমন ভালোবাসা দেখাত যে আমি বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম। ওর আঁকড়ে ধরার সুনির্দিষ্টতা, ওর দেহে

পরিবর্তনের ছন্দ যা আমাকে বিহ্বল করছিল এবং ওকে প্রত্যেক মুহূর্তে দেখাচ্ছিল আরও দুঃসাহসী। ওর আদরে আদরে আমি বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। ও এমন নিখুঁতভাবে আমার শরীরের ইচ্ছাগুলোকে উপলব্ধি করতো যা প্রথমদিকে আমাকে অস্থির করতো। ও জানতো ঠিক কোন সময়ে আমি ওর কাছে থাকতে চাইবো। আমি একটা ছোট্ট বেড ল্যাম্প যোগাড় করেছিলাম। ওটাকে আরামকেদারার পেছনে রেখে মৈত্রেয়ীর শাল দিয়ে ঢেকে রাখতাম। ঐ অবনমিত আলোয় ব্রোঞ্জের দেহটা একটা বর্ণালী নকশার রূপ নিতো। ও বেশীক্ষণ অন্ধকার সহ্য করতে পারতো না।

আমি ভাবতাম কখন ও ভালো করে ঘুমোত! রোজ ভোর হলেই চলে যেত। দু-তিন ঘণ্টা ধরে ধ্যান করত। পরের দিন অফিসে বসে পড়ার জন্য লিখত কবিতা ও চিঠি যা প্রকাশ করতো আমাদের প্রণয়। সকালে চা ওই করতো। সকালবেলা আমার দরজায় ধাক্কা দিয়ে জাগাত। যদি বাথরুমে আমার দেরী হোত ও আমার উপর গজগজ করত একটা বাচ্চার মতন। ভান করত বয়স্কা পিতা-মাতার মতন। একটা আত্মীয় সুলভ কণ্ঠস্বর যেন মায়ের মতন যা প্রথম দিকে আমার বিরক্তি উৎপাদন করত। আমি চাইতাম ও প্রণয়পূর্ণ হোক— কিন্তু ও আমাকে পরে মুগ্ধ করেছিল। আমি ভালোবাসার গভীরতা ও বিভিন্নতা আবিষ্কার করেছিলাম যে সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ ছিলাম। এই ভালোবাসার সুখানুভূতি না জেনেই আমি সেই ভালোবাসাকে কত না শাস্তি দিয়েছি!

প্রত্যেকদিন দুপুরের পর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। আমার নতুন উপরওয়ালা আমাকে যখন তখন অপমান করতো এবং অশালীন ভাবে উৎসাহ দিত। ভদ্রলোক ছিলেন একজন সদ্য আমেরিকা ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার—ভারতীয় ট্র্যাডিশানের এক বড় শত্রু। ভদ্রলোক ছিলেন বাঙালী অথচ ইওরোপীয়ান পোশাক পরতেন। একটা অদ্ভুত লোক ছিলেন তিনি। বাচ্চু নিঃসন্দেহে আমার সকল পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলো। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল— তোমাকে এত শুখনো দেখাচ্ছে কেন? কেন তুমি জানালার খড়খড়িগুলো বন্ধ করে ঘুমোও?

বাচ্চুর এই প্রশ্ন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল কতকগুলো জিনিস। বাচ্চু অত্যন্ত বিদ্বেষ ও হিংসা নিয়ে আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতো। মনে হচ্ছিল যে মৈত্রেয়ী যে প্রায় রাত্রে আমার ঘরে আসে সে ব্যাপারটা বাচ্চু সন্দেহ করে।

আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম সে যদি আমাদের বিরুদ্ধে সব জানিয়ে দেয়। তাই সিগারেট কিনে দিয়ে বা বই পড়তে দিয়ে ওর প্রতি আমি দারুণ সহানুভূতি দেখাতাম। ও বুদ্ধিমান ও উচ্চাকাঙ্খী ছেলে ছিল। ও ভারতীয় সিনেমা কোম্পানীদের জন্য চিত্রনাট্য লিখত যা নিত্যই প্রত্যাখ্যাত হোত।

ছবির অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছিল। প্রথমে ভারতীয় ডাক্তাররা ও পরে নামী ইংরেজ ডাক্তাররা কিছুই বলতে পারছিলেন না। কেউ কেউ ভাবছিল ও বোধ হয় উম্মাদ হয়ে যাচ্ছে। অন্যরা ভাবছিল ওর হিস্টিরিয়া হয়েছে। মিসেস সেনের পাশের ঘরে একটা ছোট্ট ঘরে ছবি থাকতো। খুব কম কথা বলত আর যেটুকু বলত তা শুধু রবি ঠাকুর সম্পর্কে অথবা সেই রাস্তা সম্পর্কে যা মৈত্রেয়ীর ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যেত। ওকে যদি একা থাকতে দেওয়া হোত তাহলে ও বারান্দায় চলে যেত রাস্তা দেখতে। তখন ও গান গাইতো। অথবা হাত দিয়ে অঙ্গভঙ্গি করতো বা কাঁদতো। রমু এবং বাচ্চুর বোন ওকে সব সময় পাহারা দিত। খুব আশ্চর্য যে ও শুধু মৈত্রেয়ীকে এবং আমাকে চিনতে পারতো আর কখনো কখনো নিজের মাকে। আমি ভাবতাম কি করে মিসেস সেন চুপচাপ আর হাসিমুখে থাকতেন!—ওঁর স্বামী চোখ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছিলেন, মেয়েটা পাগল হয়ে যাচ্ছিল—কি করে উনি এই বড় বাড়ীতে সব লক্ষ্য রাখতেন, আমাদের প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধা নজর করতেন,আমাদের চা থেকে শুরু করে দুবেলা খাবারের বন্দোবস্ত করতেন নির্দিষ্ট সময়েই! এইরকম একটা সময়ে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার রাতগুলো কাটানোর জন্য আমি নিজেকে দোষারোপ করতাম। আমি অধৈর্যভাবে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম যেদিন মিসেস সেন আমাদের এই পাগলামীর কথা জানবেন এবং আমাদের ক্ষমা করবেন। একটা কারণে আমার পুরী যাওয়াটা পিছিয়ে গিয়েছিল। আমার উপরওয়ালা ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া মৈত্রেয়ী এর বিরুদ্ধে ছিল এবং মিসেস সেন, আমার জন্য ভয় পেতেন। রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ রক্ত ঝরাচ্ছিল দক্ষিণ বঙ্গে।

ছবি একদিন আমার আংটিটা দেখতে পেয়েছিল এবং ওটা চাইল। আমি দ্বিধা করছিলাম। আমি মৈত্রেয়ীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে কখনই ওটা খুলবো না। মৈত্রেয়ীর সম্মতির প্রয়োজন ছিল এবং এদিকে ছবিও আংটিটার জন্যে কাঁদছিল। একটানা বায়না করছিল ওটার জন্য। যখন আংটিটা ও পেল তখন সেটা একটা রুমাল দিয়ে বেঁধে গলায় জড়িয়ে রাখল। আমি জানিনা কি

ওকে আকর্ষণ করেছিল। ওটাকে একভাবে আঙুলের মধ্যে ঘোরাচ্ছিল, উল্টে দেখবার চেষ্টা করছিল।

ডাক্তারী চিকিৎসায় ওর কিছুমাত্র পাগলামী সারলো না। তুকতাক জানে এমন লোককে ডাকা হোল। এক অল্পবয়সী মেয়ের এক বুড়ো কাকাকে ডাকা হোল। তিনি সারাদিন ধরে বিষ্ণুস্তোত্র পাঠ করে গেলেন এক অদ্ভুত সুরে যা আমাদের ইচ্ছাকে দুর্বল করে, মনকে একটা বিষণ্ণতায় ভরিয়ে দেয়। বাড়ীর সবাই এসেছিল শুনতে। নরেন্দ্র সেন একটা লম্বা চেয়ারের ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিলেন, মাথার তলায় একটা কুশন ও চোখে কালো চশমা। শিবু, বাচ্চু আর আমি ছিলাম মাটিতে বসে মেয়েদের সঙ্গে। আমি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। মানসিক আবেগ আমাদের সবাইকেই পেয়ে বসেছিল এবং ইঞ্জিনিয়ার নিজেও কাঁদছিলেন সেই বেদনায়। মৈত্রেয়ী ওর শালের মধ্যে মুখ লুকিয়ে চোখের জল ফেলছিল। যে সমবেত আবেগ মনকে অভিভূত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ আমি ঐ জায়গা ছেড়ে চলে গেলাম। একাই ঘরে রইলাম, কোন কাজই করতে পারলাম না। কীর্তনের সুর সমস্ত বাড়ী পেরিয়ে এসে আমার কানে বাজছিল। একটানা সেই সুর তখনও আমায় কষ্ট দিচ্ছিল আমার একাকীত্বেও।

সেই কাকা অন্য আর এক ভাবে ছবির মনকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রচলিত এক ওষুধ উনি সঙ্গে করে এনেছিলেন, সেটা কোন একজাতের লতা পাতা আর মধু দিয়ে তৈরী একধরণের লেই। ওটাকে দরকার ছিল মাথার একদম ওপরে চামড়ার ওপর লাগিয়ে দেওয়ার। আমার এরকম একটা কষ্টদায়ক সময়ে সাহায্য করা উচিত। কারোরই সাহস হয়নি ছবির চুল কেটে দেবার। আমার ওপরেই সেই দায়িত্ব এলো। ছবি এসব কিছুই বুঝতে পারছিল না। আমি ওর সামনের দিকে গিয়ে সোজা ওর দিকে তাকিয়ে চুলগুলো কাঁচি দিয়ে এলোপাতাড়ি কাটতে লাগলাম। অনর্গল ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম যাতে কাঁচির আওয়াজ ও না শুনতে পায়। বিছানার মাথার কাছে পিছন দিকে মৈত্রেয়ী চুলের গুচ্ছগুলো হাতে ধরেছিল এবং সেগুলো পর্দার ভেতরে লুকিয়ে রাখছিল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই মাথার তালুটা পরিষ্কার করে দিলাম আর মিসেস সেন সেখানে সেই গরম লেই ঢেলে দিলেন। ছবি আমাদের দেখল, মাথার তালুটা অনুভব করার চেষ্টা করল, তারপর সেই আংটি বাঁধা রুমালটা গলা থেকে খুলে আস্তে আস্তে কাঁদতে লাগল। চোখের জল অঝোরে গড়িয়ে

পড়তে লাগলো ওর সুন্দর কালো মুখের ওপর দিয়ে। ও দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল না বা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল না যদিও ও বুঝতে পেরেছিল যে ও অর্ধেক ন্যাড়া হয়ে গিয়েছে। ওর হঠাৎ হঠাৎ এই ধরণের মানসিক আক্রমণ হোত বিশেষ করে যখন ও চাইত উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে এবং তাতে কেউ বাধা দিলে।

দিনগুলো অত্যন্ত উত্তেজনার মধ্যে কাটছিল। অফিস থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতাম ইঞ্জিনিয়ার এবং ছবির খবর নেবার জন্যে। তারপর চান করে ও খেয়ে আবার ওপরে উঠে আসতাম ছোট মেয়েটার বিছানার পাশে বসে থাকবার জন্য। ও প্রায়ই বিকারগ্রস্থ অবস্থায় আমায় ডাকত। আর আমি কাছে এলেই কিছুটা শান্ত হোত।

সব রাত্রিগুলোই আমি মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কাটাতাম। সে নিজেকে পাগলের মত আমার কাছে উৎসর্গ করেছিল। ও আতংকগ্রস্থ হয়ে উঠেছিল সমস্ত ঘটনায় যা সারা বাড়ীতে চলছিল। যেন আমার কাছে এসে কিছুক্ষণের জন্য ও মুক্তি পেতো। সকাল বেলা যখন ঘুম থেকে উঠতাম তখন শরীর শ্রান্ত ও মনে বর্ণনাতীত ভয়। নরেন্দ্র সেন দিন দিন চোখ অপারেশনের তারিখ পিছিয়ে দিচ্ছিলেন এবং ডাক্তাররা ওঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যে দুঃখজনক ও ভীতিকর অবস্থা বাড়ীর ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল তা তাঁর অবস্থার উন্নতির পক্ষে সহায়ক ছিল না। আমিও ভয় পাচ্ছিলাম যে একটা সামান্য অসতর্কতায় আমাদের সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। মৈত্রেয়ী উদ্বিগ্ন হোত। ও রাতে যখন আমার ঘরে আসতো সবাই তখনও ঘুমিয়ে পড়েনি। ছবির ঘরের মধ্যেই আমার হাত জড়িয়ে ধরতো, আমার ঘাড়ে ওর দেহের সমস্ত ভার দিয়ে ভর দিত, হাতে চুম্বন করত। একটু খেয়াল করলেই যে কেউই সব বুঝতে পারতো।

বাচ্চুর নজর আমরা এড়াতে পারিনি। রমু এবং শিবু দারুণ সন্দেহ করত যে আমাদের একটা যোগাযোগ আছে কিন্তু কখনই ভাবতে পারেনি যে আমরা প্রেমিক প্রেমিকা।

মৈত্রেয়ী মাঝে মাঝে এমন একটা আচরণ জাহির করে ফেলতো যা আমাকে আতঙ্কজনক আবস্থায় ফেলতো। মৈত্রেয়ীর আগে বেরিবেরি হয়েছিল। তাই সন্ধ্যের দিকে ওর পা ফুলত এবং ডাক্তাররা ওকে মাঝে মাঝে ম্যাসাজ নেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সকালবেলায় রমু অথবা বাচ্চুর বোনেরা ওকে বিবস্ত্র

করে ওর সারা শরীরে একরকম দুর্গন্ধযুক্ত তেল মালিশ করতো যা অনেক ধোয়ার পরেও গা থেকে ওঠানো কঠিন হোত। মৈত্রেয়ী মাঝে মাঝেই হঠাৎই যন্ত্রণা বোধ করতো এবং তখনই সঙ্গে সঙ্গে মালিশের প্রয়োজন হোত। তখন পায়ে মালিশ করলেই চলতো এবং সে কাজটা বাচ্চু করতো। মৈত্রেয়ী ওকে ডেকে নিয়ে যেত নিজের ঘরে যা আমি সহ্য করতে পারতাম না।

এই ব্যাপারে মৈত্রেয়ীকে একদিন আমি যা তা বলেছিলাম। ও আমার দিকে বাক্যহীন হয়ে তাকিয়েছিল এবং বলেছিল যে আমার দ্বারা এই কাজ হবার নয়। নিঃসন্দেহে বাচ্চু একজন পেশাদার অঙ্গ-সংবাহক ছিল না। ওর বয়স আর ওর অকারণ হাসিতে আমি রাগে কাঁপতাম এই ভেবে যে ওর ঐ কালো, লোভী বড় বড় হাতগুলো মৈত্রেয়ীর গা স্পর্শ করে।

একবার এক সন্ধ্যেবেলা ও বাচ্চুকে ডেকেছিল ভেতরের বারান্দার ওপর থেকে। ও একটা ছুরির খোঁচায় কষ্ট পাচ্ছিল। বাচ্চু উপস্থিত ছিল না তাই ও ড্রাইভারকে ডেকেছিল। আমি প্রায় কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিলাম ওর এই দোষের জন্য চাবুক মারবো বলে। কিন্তু আমার নিজের চিন্তায় নিজেই লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম—কিছুক্ষণ পরে অবশ্য বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থেকে গোয়েন্দাগিরি করতে আমার লজ্জা হোল না; মৈত্রেয়ী তখনও আলো জ্বালায়নি। আমি তিক্ততার সঙ্গে কল্পনা করছিলাম সেইসব উপন্যাসের মনোরম কাহিনীর কথা যেখানে গাড়ীর ড্রাইভাররা তাদের মহিলা মালিকদের প্রেমিক। চিন্তা করতে থাকলাম মেয়েদের অবিশ্বাসী চরিত্র এবং অসততার অভ্রান্ত বাণীর কথা। হাজারটা ছোট ছোট চিন্তা যা এতদিন উপেক্ষা করে এসেছি তা আমার মনকে আক্রমণ করলো। একদিন মৈত্রেয়ীর ঘরে শিবু ঢুকে চাবি দিয়ে ঘর বন্ধ করে দিল। তারপর নিচ থেকে আমি ঝগড়া শুনতে পেলাম, সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর চীৎকার। যেন শরীরে শরীরে লড়াই। যখন তারা বেরিয়ে এল তখন শিবুর মুখ লাল আর বন্যতায় ভরা আর মৈত্রেয়ী মলিন। ওর চুলগুলো আগোছালো হয়ে পাক খেয়ে পিঠের ওপর পড়ে। এটা অবশ্য সত্য যে অল্প আগেই মৈত্রেয়ী আমায় জানিয়েছিল যে শিবু একটা ইতর। ও খুব অন্তরঙ্গভাবে মৈত্রেয়ীকে কাছে পেতে চেয়েছিল এবং মৈত্রেয়ী ওকে একটা চড় কষিয়েছিল এবং বাবার কাছে নালিশ করেছিল। কিন্তু নরেন্দ্র সেন তখন অসুস্থ ছিলেন। তাই শিবু ছিল তখন অপরিহার্য এবং ওকে বার করে দেওয়া অসম্ভব ছিল।

মনে করতে পারি মৈত্রেয়ী একদিন ওর অন্য আর এক কাকার কথা বলছিল। সে চেষ্টা করেছিল মৈত্রেয়ীকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করতে। কিন্তু সেইবার হঠাৎ ইঞ্জিনিয়ার এসে পড়েছিলেন। কাকাকে ওর হঠকারিতার জন্য ক্ষমা চাইতে হয়েছিল এবং চাকরিও খোয়াতে হয়েছিল।

মৈত্রেয়ী প্রায়ই আমার কাছে সেই ইন্দ্রিয়গত উত্তেজনাকে দোষারোপ করতো যা অন্যদের হৃদয়ে ও জাগিয়েছিল। এমনকি যাদের সঙ্গে ওর রক্তের সম্পর্ক আছে। ও চাইছিল ওর চারপাশে অন্য জিনিষকে সক্রিয় করতে যা ইন্দ্রিয়গত ইচ্ছার প্রকোপ বৃদ্ধির থেকে অনেক ভালো।

আমি অন্য আর একটা দৃশ্য দেখেছিলাম। এক সন্ধ্যেবেলা বাচ্চু অনেকক্ষণ মৈত্রেয়ীকে আটকে রেখেছিল বারান্দার তলায়। মৈত্রেয়ী মানসিক বিপর্যয়ের সঙ্গে টেবিলে এল। বাচ্চুর সাহস হয়নি টেবিলে আসার। ..... এইসব ঘটনাগুলো আমাকে ভীষণ মানসিক যন্ত্রনা দিত। আমার মনে হয়েছিল সবাই মৈত্রেয়ীকে চায় এবং সেও সবাইকেই প্রশ্রয় দেয় আমি সব অসম্ভব ব্যাপারের কল্পনা করছিলাম এবং নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছিলাম। আমার হিংসা আমাকে কোন ক্ষুদ্র অংশেই বাঁচাতে পারছিল না। আমি নিজেকে এই অসুস্থ ভাবনা থেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না যে মৈত্রেয়ী আরেকজনের বাহুর মধ্যে।

মৃত্যুবৎ হতাশার মধ্যে বাগান থেকে ফিরে এলাম। রাতের খাবারের সময় চেয়ারের তলায় আমার পা দুটোকে একপাশে সরিয়ে রেখেছিলাম। শোবার সময় একটা বড় কাঠের হুড়কো দিয়ে দরজা আটকে রেখেছিলাম ঠিক করে রেখেছিলাম যে মৈত্রেয়ীকে কিছুতেই আসতে দেবনা। আমি আবার জেগে উঠলাম যখন ও দরজায় টোকা দিল কিন্তু এমন ভাব দেখালাম যেন ঘুমিয়ে আছি এবং কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। ও আরও জোরে ধাক্কা দিতে থাকল, আমাকে আরও জোরে ডাকতে থাকল। আমার ভয় করছিল পাছে কেউ শুনতে পায় তাই খুলে দিলাম।

—কেন তুমি আমায় ঢুকতে বাধা দিচ্ছ? তুমি আর আমাকে চাও না? মৈত্রেয়ীর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, চোখে জল নিয়ে কাঁপছিল। আমি আবার দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং দুজনে বিছানায় এসে বসলাম। ওকে জড়িয়ে ধরলাম না, বরং আমার কষ্টের কথা ওর কাছে বললাম। দুহাত দিয়ে ও আমার ঘাড় বেষ্টন করে আমাকে আকুল চুম্বনে ঢেকে দিল,

নখ ফুটিয়ে দিল আমার মাংসের মধ্যে তবু আমি কথা বলেই চলেছিলাম। আমার নিদারুণ কষ্টের কথা যন্ত্রনার কথা আমি চেপে রাখতে পারিনি। আমার সব সন্দেহের কথা আমি বিষের মতো উগরে দিয়েছিলাম।

—আমার দুঃখ হচ্ছে যে কেন ও আমাকে বলাৎকার করেনি। এই বলে সহসা মৈত্রেয়ী কাঁদতে লাগলো।

—তোমার সম্পর্কে, তোমাকে যতখানি জানি—ইন্দ্রিয়গত ও বেপরোয়া তোমার ড্রাইভারের কাছে ব্যাপারটা খুবই সোজা ছিল। ঘৃণার চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আমি উত্তর দিলাম।

—তুমি আনন্দ অনুভব কর সব সময় এই সব অসম্ভব বিষয়ের কল্পনায়, গতানুগতিক এবং অদ্ভুত নোংরা মনে। এই বিকৃতভাব দীর্ঘ দিন ধরে তোমার মস্তিস্ক পরিপূর্ণ করে রেখেছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করলাম। ওকে নিষ্ঠুর অপমানে বিদ্ধ করলাম। আমি ওকে দারুণভাবে ঘৃণা করছিলাম, এই কারণে নয় যে ও আমাকে প্রতারণা করেছে, কারণ হোল ও আমাকে ওর ভালোবাসার প্রতি, ওর পবিত্রতারপ্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস করিয়েছে এবং সব কিছু ওকে দিয়ে, ওর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়ে, ওর সব ইচ্ছা আমাতে পরিণত করিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ। আমি এই ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম যে নিজেকে সমর্পণ করেছি এমন একজনের কাছে যে আমাকে প্রতারণা করেছে প্রথম থেকেই। সত্যি বলতে কি, আমি বিশ্বাস করছিলাম না যে ও আমার সঙ্গে সত্যি সত্যি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। আমি মৈত্রেয়ীর ভাবগতিক একটা সাধারণ প্রহসন হিসাবে বিচার করছিলাম। আমাদের বাড়ীর মেয়েদের পরিবর্তনশীলতা ও খেয়াল সম্পর্কে ভালোই জানতাম, কিন্তু এও জানতাম যে আত্মসম্মানবোধ ও পরিমিতিবোধ তাদেরকে যে কারোর কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে বাধা দিয়েছে। মৈত্রেয়ী আমার কাছে হেঁয়ালীপূর্ণ ছিল এবং আমি আগে থেকে ওর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না। আমার মনে হয়েছিল সে যেমন আদিম এবং বেপরোয়া ছিল তাতে ও অন্য যে কারোর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারতো দায়িত্বহীনতার সঙ্গে। আমার হিংসা ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল এবং গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা আমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম মৈত্রেয়ীর স্নিগ্ধতা, এবং পবিত্রতা। একটা বিরাট প্রতারণার থেকে বেশী আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। আমি

বুঝতে পেরেছিলাম মানুষের অনুভূতির ভঙ্গুরতা। খুব নিশ্চিত বিশ্বাস হয়তো সাধারণ একটা কাজের জন্য ভেঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু অধিকার, যা ঠিক ঠিক আন্তরিকতারসঙ্গে পাওয়া গেছে তা ভঙ্গুর হয়না। কিছুই ঠেকাতে পারছিলনা—সুখ, নিশ্চয়তা নির্ভরতা যা জমা হয়েছিল ভালোবাসা চলাকালীন, দুজনের একত্রে রাত্রি যাপনের সময়। সব হারিয়ে যাচ্ছিল যাদুর মতন। আমার মধ্যে শুধু অতি উত্তেজিত পুরুষোচিত অহংকার বেঁচে ছিল আর একটা ভয়ংকর ক্রোধ জেগে উঠেছিল আমার নিজের বিরুদ্ধে।

মৈত্রেয়ী আমার কথা শুনছিল, দেখাচ্ছিল খুব কষ্ট পাচ্ছে যা আমাকে আরও উত্যক্ত করছিল। ও ঠোঁট কামড়ে রক্ত বার করে ফেলেছিল। বড় বড় চোখ নিয়ে আমার দিকে দেখছিল যেন ও নিশ্চিত ছিল না যে এমন দৃশ্য সত্যাই ঘটছে।

পরে ও ফেটে পড়ল—তুমি আমাকে বলাৎকারের কথা বলছ? তুমি আমাকে কেন বুঝতে চাইছ না? তুমি আমার জন্য একদম চিন্তা কর না। তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে যে যদি আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় লুণ্ঠিত হবার জন্য, তাহলেও তুমি আমাকে ভালোবাসবে। আমি নিজেকেও বলতাম যে এইরকম কিছু হলে ভালোই হবে। তাহলে আমাদের মিলনে আর কোনও বাধা থাকবে না। অ্যালান, আমাকে বোঝ, আমরা মিলিত হতেও পারি না এবং নিজেদের ভুলেই নিজেরা মরতে চলেছি। এমনকি তুমি যদি নিজেকে ধর্মান্তরিত কর তাহলেও ওঁরা বিশ্বাস করবেন না যে তুমি আমাকে বিয়ে করছো। ওঁরা তোমার থেকে অন্য জিনিষের অপেক্ষায় আছেন। তুমি বুঝতে পার না? কিন্তু যদি কেউ আমার শ্লীলতাহানি করে তাহলে ওঁরাই আমাকে রাস্তায় ফেলে দিতে বাধ্য হবেন নয়তো সেই পাপ গোটা বাড়ীর ওপরেই পড়বে। ওঁদের থেকে বিতাড়িত হলে আমি তোমার স্ত্রী হতে পারবো, আমি খ্রীষ্টান হয়ে যাবো। একটা খ্রীষ্টানের পক্ষে লুণ্ঠিত হওয়া পাপ নয় এবং তুমি আমাকে তখনও ভালোবাসবে। সত্যি নয়? তুমি আমায় সব সময়ের জন্য ভালোবাসবে। অ্যালান, আমাকে অন্তত এটা বলো। তুমি আমাকে ভুলে যাবে না। তুমি জানো আমার জন্য কি অপেক্ষা করবে যদি তুমি আমায় ভুলে যাও।

আমি স্বীকার করছি যে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলম। মনে হোল যেন বিরাট দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম। আমার রাগ দূর হয়ে গেল এবং যা বলেছি তার জন্য কষ্ট পেতে থাকলাম। আমি মৈত্রেয়ীর কাছে হয়তো ক্ষমা চাইতাম কিন্তু আগেই চিন্তা করলাম ভুল সংশোধনের অঙ্গভঙ্গিগুলো এবং

এর প্রত্যেকটা আমার মনে হল ভুল, হাস্যকর এবং কুৎসিত।

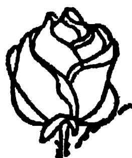
জানতাম না কি করতে হবে। চোখে আমার অনুশোচনা এবং আমার ভালোবাসার ভাব দেখানোর চেষ্টা করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও খুব কাঁদতে লাগলো। আমার ত্রুটি উপলব্ধি করে ও খুব বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরে পায়ের কাছে আছড়ে পড়লো। অনুরোধ করতে লাগলো ও যেন ভালোবাসতে পারে; যেন আমাদের ভুল আমাকে না ভয় পাইয়ে দেয়। আজ আমার মনে হয় ওর সব কথাগুলো ছিল মনখোলা, কিন্তু সেই মুহূর্তে ওগুলো আমাক আগুনের মত জ্বালাচ্ছিল ও যন্ত্রণা দিচ্ছিল। আমি মৈত্রেয়ীকে বাহুর মধ্যে টেনে নিলাম এবং চুপ করে জড়িয়ে থেকে স্তব্ধতার মধ্য দিকে বোঝাতে চাইলাম, যে আমি যা উচ্চারণ করেছি তা ভালোবাসার সম্পূর্ণ আগ্রহের কথা। ও আন্দাজ করতে পেরেছিল কতটা আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমার নিজের অন্ধতায় আমরা দুজনেই নতুন করে আমাদের বিয়ের কথা এড়িয়ে গেলাম। ব্যাপারগুলো আমার কাছে অত সোজা মনে হচ্ছিল না যতটা প্রথমে হয়েছিল। চরম বিচ্ছেদের ধারণা করার থেকে বরং বেশী পছন্দ করছিলাম আমাদের মিলনের স্বপ্ন দেখা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

জানালার পাশে কার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম বলে মনে হোল। আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে রইলাম। তারপর পায়ের শব্দ বারান্দার দিকে চলে গেল এবং কে একজন যেন করিডরের দরজায় ধাক্কা দিল। ভয় আমাদের হিম করে দিল। আওয়াজ কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়ে আবার ফিরে এল। এবার আমার জানলার খড়খড়ির কাছে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা বাচ্চু। নিঃসন্দেহে ও সিনেমা দেখে ফিরেছে। দরজাটার খিল খুলতে আমি দেরীর ভান করলাম যাতে মৈত্রেয়ী নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় পায়।

—তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ? ও জিজ্ঞাসা করল।

—কারুর সংগেই না! বললাম আমি রূঢ়ভাবে এবং দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলাম।

তখনই ওপর থেকে মিসেস সেনের কণ্ঠস্বর শুনলাম মৈত্রেয়ীর ঘরের সামনে।



আমার মনে হচ্ছিল যে সব কিছুই জানাজানি হয়ে গেছে। বিছানায় পড়ে সংগ্রাম করছিলাম, কিন্তু কিছুতেই চোখ বন্ধ করতে পারছিলাম না। দুপুরের দিকে মৈত্রেয়ী এলো। আমাকে না ডেকেই দরজার তলা দিয়ে একটুকরো কাগজ ঢুকিয়ে দিল: 'মা কিচ্ছু জানে না। কষ্ট পেয়ো না। আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।' আমার মনে হয়েছিল ও আমাকে ক্ষমা করেছে অথবা আমার শাস্তিটা স্থগিত রেখেছে। আমি মৈত্রেয়ীকে একটা লম্বা চিঠি লিখেছিলাম: রাত্রে আমাদের সাক্ষাৎ বন্ধ করা উচিৎ, ইঞ্জিনিয়ার এবং ছবির অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে। সত্যি বলতে কি, আমি জানতাম না কি করে আমাদের এই যোগাযোগের ইতি টানব। একদিন মৈত্রেয়ী ওর মাকে বলেছিল যে আমি ওর এক বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করছি এবং তাকে আমি বিয়ে করার কথা বলতে অস্বস্তি পাচ্ছিলাম। মিসেস সেন উত্তর দিয়েছিলেন যে এই ধরনের সঙ্গের ফল হোল শুধু মানসিক উত্তেজনা এবং দুঃখেই এর সমাপ্তি। সেই কামনার মধ্যে কোনদিন স্থায়ীত্ব এবং আনন্দ জন্ম নেয় না যখন তা ট্র্যাডিশান অনুযায়ী হয় না অর্থাৎ সংসারের নিয়মানুযায়ী যা নির্ধারণ করা হয় না। যারা ভালোবাসা এবং বিবাহের গভীরতা বোঝে না তাদের পক্ষে এগুলো হঠকারীতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা অল্প বয়স্করা যা কল্পনা করি বাস্তব তার চাইতে অনেক বেশী রূঢ়। বিবাহের অর্থ এমন নয় যে "একত্রে ফুল তোলা", এবং তা ক্ষণস্থায়ী ও প্রতারণাপূর্ণ আবেগের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়।

স্বীকার করছি, এই সমালোচনা থেকে মেনে নিয়েছিলাম যে আমাদের ভালোবাসা ছিল শুধু আবেগ-তাড়িত এবং আমরা কখনই পরস্পরের স্বপ্ন ছাড়া অন্য কারো কথাই ভাবিনি। মিসেস সেন আরও যোগ করেছিলেন যে বিবাহের ভিত্তি কখনই ভালোবাসা নয়। তার ভিত্তি হলো স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ, ভাগ্যের কাছে ছেড়ে দেওয়া। ভারতবর্ষকে আমি ভালোবাসলেও, ওনাকে শ্রদ্ধা করলেও এই ধারণা আমি গ্রহণ করতে পারিনি।

বুঝতে পারছিলাম যেদিন আমি মৈত্রেয়ীকে বিয়ে করতে চাইবো সেদিন কোন অনতিক্রম্য বাধা জেগে উঠবে আমার সামনে। চিন্তা করলাম, মৈত্রেয়ী যে সমাধান পছন্দ করেছে অর্থাৎ ওকে নিয়ে চলে যাওয়া তা ফলপ্রসূ হবে কিনা। ওর পিতামাতা দেখবে সামনে একটা ঘটে যাওয়া ব্যাপার। সুতরাং তখন আমাকে মেনে নিতে বাধ্য হবেন জামাই হিসেবে, যদিও অন্যরা কখনই মানতে পারবেন

না। আজ আমি খুব অল্পই বুঝি কতখানি দরকার ছিল মৈত্রেয়ীর সক্রিয় ভূমিকা।

দিন চলে যাচ্ছিল একইভাবে ভয় আর বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে। আমি সচেতন হয়ে থাকতাম সব কিছুতেই যা আমাকে ঘিরে ছিল এবং কখনই অবসর পেতাম না চিন্তা করার বা দৃশ্যগুলোকে খুঁটিয়ে মনে রাখার। আমার সেই সময়ের লেখাগুলোর এতই খারাপ অবস্থা যে যেন অন্য আর কারো জীবনের কিছু কথা।

সেই যন্ত্রনাদায়ক দিনগুলোর মধ্যেই একদিন এল মৈত্রেয়ীর জন্মদিন, ১৫ই অক্টোবর। ইঞ্জিনিয়ার চাইছিলেন যতটা সম্ভব জমকালো করে এই জন্মদিন পালন করা যায়, যদিও তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং ছবি চিন্তাশক্তিহীন অবস্থায় ছিল। মৈত্রেয়ী ওর ১৭ বছর পূর্ণ করলো। আমি জানি না কি অর্থ লুকিয়ে থাকে ভারতীয়দের কাছে এই বয়সটায়। ওর লেখা বই 'উল্লেখ' ছাপানো হয়েছিল কয়েকদিন আগে। সমালোচকরা নিয়েছিলেন বইটাকে সহানুভূতির সঙ্গে এবং নরেন্দ্র সেন নিমন্ত্রণ করেছিলেন কথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের সব নামজাদা লোকদের। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, যত লোকদের বাংলাদেশ চেনে এবং ইওরোপে পরিচিত, সবাই উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন চট্টোপাধ্যায়—শ্রীকান্ত এর লেখক এবং নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর। ও'র মুগ্ধকর ছন্দ, ঈশ্বরীয় সৌন্দর্য আমাকে অনেকদিন ধরে আবেগ মথিত করে রেখে ছিল। অগাষ্ট মাসের এক অনুষ্ঠানে ওনাকে দেখে মৈত্রেয়ী আমার কথা একদম ভুলে গিয়েছিল কয়েকদিন ধরে। অনেকদিন ধরে শুধু ও'র কথা বলেছিল মৈত্রেয়ী। ও চাইত সাক্ষাৎ করতে, শিখতে 'নৃত্যের গোপন কথা'। ও অপেক্ষা করতো 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ম্যাগাজিনের সব রচনাগুলোর জন্য। তাতে ছাপা হোত অনেক শ্রদ্ধাশীল ব্যাক্তির রচনা যেমন অচিন্ত্য বাবু, এক মৌলিক ও আলোচিত কবি।

উৎসবের প্রস্তুতি দেখে আমি একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি জানতাম যে ঐ দিন মৈত্রেয়ীকে একটুও কাছে পাব না। ও আমার অধিকারে থাকবে না এবং ওর অহংকার ও প্রভাব দেখিয়ে ও সব অতিথিদের মুগ্ধ করার চেষ্টা করবে। আমি কিছু বই কিনেছিলাম ওকে সকালেই দেব বলে। প্রস্তুতি পর্বের দরুণ খুব কমই বিশ্রাম নিতে পেরেছিল আগের দিন রাত্রে। সিঁড়ির ধাপগুলো ও দেওয়ালগুলো পুরনো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। গদির ওপর চাদর দিয়ে পরিস্কার করে সাজান হয়ে ছিল, যার ওপর

অতিথিরা খালি পায়ে এসে বসবেন। সব মেয়েরাই প্রচণ্ড রকম পরিশ্রম করেছিল। পুরনো চিত্র দিয়ে সিঁড়ি সাজাতে গিয়ে মৈত্রেয়ী কবির একটা চমৎকার প্রতিকৃতি আকস্মিকভাবে ফেলে দিয়েছিল। যে চিত্র রবীন্দ্রনাথ নিজেই ওকে উৎসর্গ করেছিলেন। ঘটনাটা মৈত্রেয়ীকে খুবই কষ্ট দিয়েছিল। ও এর মধ্যে একটা অশুভ পূর্বলক্ষণ দেখতে পেয়েছিল। চিত্রের ফ্রেমটা টুকরোয় পরিণত হয়েছিল এবং ক্যানভাসটা সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গিয়েছিল।

ভোরবেলা মৈত্রেয়ীকে দেখতে পেলাম লাইব্রেরীতে। আমি ওকে বইগুলো দিলাম, প্রত্যেকটা নিষ্পাপ উৎসর্গতার সঙ্গে। ওকে জড়িয়ে ধরে প্রার্থনা করলাম ওর জন্য একটা শান্ত জীবন আর সকল সৌভাগ্য যা ওর প্রাপ্য। এইসব গতানুগতিক কথা বলার সময়ে আমার চোখ জলে ভরে উঠেছিল। ওকে দেখাচ্ছিল অন্যমনস্ক। অন্য দিনের চাইতে সেদিন অনেক বেশী হাল্কাভাবে ও আমার বাহুর মধ্য থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

বিকেলের দিকে আমি সিল্কের তৈরী বাঙ্গালী পোশাক পরেছিলাম এবং সব নামী দামী ব্যক্তিদের নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলাম। ইঞ্জিনিয়ার তাঁর আরামকেদারায় ঠায় বসে ছিলেন। সব নিমন্ত্রিতেরা বসেছিলেন সেই গদির ওপর। মিসেস সেন এবং বাড়ীর মহিলাদের দেখাশোনা করার অন্যান্য মেয়েরা পাশের ঘরে ছিলেন। শিবু ছিল একতলার করিডরে, নতুন অতিথিদের গাইডের কাজ করছিল।

মৈত্রেয়ী, বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে ঐ একা যে আমাদের ঘরে এসেছিল তার 'উল্লেখ' এর কপি বিলি করবার জন্য এবং বয়ে নিয়ে এসেছিল তার নম্রতা। মৈত্রেয়ীকে মলিন দেখালেও প্রশংসনীয় আর আকর্ষণীয় ছিল ওর চেহারার স্বাভাবিক মাধুর্য ; নীল সিল্কের শাড়ীথেকে বেরিয়েআসা তার সেই নগ্ন বাহু দুটো···আমি যন্ত্রনা বোধ করছিলাম। কেউ জানত না আমার কি অবস্থা ছিল। সুন্দর উদয়শংকর এসে উপস্থিত হলেন। পর্দার থেকে সামনাসামনি দেখতে ওঁকে অত সুন্দর লাগছিল না। উনি ছিলেন আমার জানা সবচাইতে মুগ্ধকর মানুষ। ওঁর শরীরটা ছিল পুরুষোচিত কিন্তু আশ্চর্যরকম স্থিতিস্থাপক। ওঁর চালচলনে, দেখার মধ্যে একটা নারীসুলভ কমনীয়তা ছিল, কিন্তু তা কোন ভাবেই তাঁকে অসুন্দর করছিল না। মৈত্রেয়ী ওঁকে দেখে লাল হয়ে উঠল। ওঁকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলো। অতিথিরা এমনভাবে ওঁর চারপাশ ঘিরেছিলেন যে উনি একগাল

খেতে পারছিলেন না। আমার কষ্ট আমি লুকনোর চেষ্টা করলাম। এই নর্তকের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব থেকেও বেশী বিশালতা ছিল। আমি অনুভব করেছিলাম যে ওঁর মধ্যে এমন একটা যাদুশক্তি আছে যা সবারই মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে এবং শুধু অনুরাগী মৈত্রেয়ীই নয় যে সহজেই অভিভূত হয়ে পড়েছিল। আমার ওঁকে অপছন্দ হয়নি। আমার ইচ্ছা করছিল ওঁর প্রতি মৈত্রেয়ীর গুরুত্ব দেওয়াটাকে উদ্ঘাটন করা। এক ধাক্কায় আমি আমার ভালোবাসা থেকে পরিত্রাণ পাবো। আমার সমস্ত আসক্তি সেই মুহূর্তে লোপ পাবে যখন আমি দেখবো আমার জায়গা অধিকার করেছে আর এক ব্যক্তি। যদি মৈত্রেয়ী উদয়শংকরের ঐ যাদুশক্তির বিরুদ্ধে না দাঁড়াতে পারে তাহলে পরিত্যাজ্য হওয়াই ওর প্রাপ্য।

আমি মরমে মরে গেলাম যখন একঝলকে দেখলাম মৈত্রেয়ী করিডরে উদয়-শংকরের কাছে বসে ভয়ে ভয়ে কিছু প্রশ্ন করছে যা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম কি শান্ত হয়ে আমি ঐ দৃশ্যটা বিবেচনা করছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সিঁড়িতে আমি মৈত্রেয়ীর সামনাসামনি হলাম। ও লুকিয়ে আমার বাহু ধরে বলল; নাচের গোপন কথা আমি উদয়শংকরের থেকে শেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু উনি আমাকে কিছুই ব্যক্ত করতে পারলেন না। এটা একটা বিরাট বোকামি। উনি নাকি ছন্দ বোঝেন না। যখন উনি কথা বলেন তখন মনে হয় উনি যেন বই থেকে পড়ে যাচ্ছেন। আমরা ভালো করতাম যদি ওঁকে নিমন্ত্রণ না করতাম। অনুষ্ঠানে উনি নেচে ছিলেন ঈশ্বরীয় ঢঙে পরে আমি ওঁকে প্রশ্ন করলাম এবং উনি শুধু অস্পষ্টভাবেই বললেন, যেন একটা স্থূল কারিগর। এটা কি সম্ভব যে নৃত্য ওঁকে বুদ্ধিমান করেনি?……

আমি জানতাম না মৈত্রেয়ীর এই কথাগুলোর জন্য আমি ওকে কিভাবে ধন্যবাদ দেব। ও আমাকে লাইব্রেরীতে নিয়ে গেল এবং আমার হাত ধরে আকুল হয়ে বললো—আমি তোমায় পছন্দ করি অ্যালান, আমি তোমায় সবার চাইতে বেশী পছন্দ করি।

আমার ইচ্ছে করছিল ওকে সজোরে জড়িয়ে ধরি কিন্তু হঠাৎই এক চিৎকার শুনতে পেলাম। আমরা দৌড়ে ওপরে গেলাম। মিসেস সেন ওঁর মেয়েকে ডাকছিলেন এবং অন্য মেয়েরা ভয়ে চীৎকার করছিল। ভয়ংকর ভয়ে আমরা দুজনে দৌড়ে গেলাম যেন একটা সর্বনাশ অনুভব করছিলাম। আমরা দেখলাম ছবি বারান্দা থেকে রাস্তায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। মেয়েরা চেষ্টা করছিল ওকে

ধরবার। এই উৎসবের দিনে বলতে গেলে ছবি একাই ছিল ওর ঘরে। ও ওর সুন্দর একটা শাড়ী পরে নিয়েছিল—সাধারণতঃ ও ছোট স্কার্ট পরতো। শাড়ী পরে ওকে আরও বয়স্কা দেখাচ্ছিল। ওকে সামনে রাখা হয়েছিল অনুষ্ঠান দেখবার জন্য। কিন্তু করিডরে প্রথম পদক্ষেপেই ও অত লোকজন দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ও বারান্দায় চলে গিয়েছিল যেখানে উদয়শংকর কয়েক মিনিট আগেই উপস্থিত ছিলেন। বারান্দায় গিয়ে ওর অভ্যাসমত গান গাইতে গাইতে ও রাস্তার দিকে ঝুঁকে ছিল। দুই মহিলা ওকে দেখতে পেয়েছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে যখন ও রেলিংএর ওপর উঠে পড়েছিল এবং লাফ দিতে যাচ্ছিল। ও ভীষণভাবে হাত-পা ছুঁড়ছিল। করিডরে লোক ভর্তি হয়ে গিয়েছিল এবং ইঞ্জিনিয়ার তাঁর শান্ত ভাব হারিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ভীষণভাবে ঝগড়া করছিলেন। আমি ছবিকে কোলের মধ্যে নিয়ে ওর ঘরে নিয়ে গেলাম ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিনতে পারলো। ও আমার বুকের উপর জড়িয়ে ছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল—অ্যালান। অ্যালান। আমি ওকে বিছানার ওপর বসিয়ে দিলাম এবং মলিন মুখে ও হঠাৎ আমাকে বলল—মৈত্রেয়ী কোথায়? ওরা ওকে বেচতে চায়?

উৎসবের পরের দিন প্রচুর কথাবার্তা আর প্রচুর খাওয়া দাওয়ার পর সবাই ক্লান্ত। মৈত্রেয়ী অনেক উপহার পেয়েছিল, বিশেষ করে বই। উৎসবের দিনই সকালে কেউ একজন একটা বিরাট ফুলের তোড়ার সঙ্গে একটা খাম পাঠিয়েছিল। যখন ও হাতের লেখাটা দেখল তখন ও কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়ে ফেলল ও আশ্চর্য হয়ে গিয়ে ভয় পেয়ে গেল। তখনই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনে আমার ঘরে এসে আশ্রয় নিল। খামটা আমাকে দিয়ে বলল—এটা তোমার অফিসে লুকিয়ে রাখ এবং লক্ষ্য রেখ যেন কেউ এটা না দেখে। লাল হয়ে গিয়ে বলল—তোমার কাছে পরে চেয়ে নেব।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। উদ্বিগ্ন হবার মত কোন কারণও খুঁজে পেলাম না। আমার কাছে একটা বাংলা চিঠি রেখে গেল যা আমি পারতাম শুধু ছিঁড়ে ফেলতে অথবা কোন বন্ধুকে অনুবাদ করার কথা বলতে। এখনও আমার কাছে চিঠিটা আছে। আমার কখনই ওটা পড়বার সাহস হয়নি। প্রায়ই আমি ভাবি ওর কোন ভক্ত ওকে পাঠিয়েছিল ঐ ফুলের তোড়া এবং কেন মৈত্রেয়ী মিথ্যে করে ওর মাকে বলেছিল যে ওটা এসেছিল ওর স্কুলের এক বন্ধুর কাছ থেকে যে এই উৎসবে যোগ দিতে পারেনি ।

দিন এবং রাত্রিগুলো একটানা কেটে যেতে লাগল। উৎসবের প্রায় এক সপ্তাহ পরে এক ঝড় উঠল। সেই শেষের সময়টার খুঁটিনাটি সব কিছু আমার মনে রাখা উচিৎ ছিল। কিন্তু আমার কাগজে আমি শুধু আমার জীবনের সারসংক্ষেপটুকুই খুঁজে পাচ্ছি। সেই সারাংশ কিছু কম ব্যক্তির কথা আলোচনা করেনি। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে আমি কখনই তখন আমার নিকটবর্তী ভবিষ্যতের কথা ভাবিনি।

রোজ সন্ধ্যায় আমরা লেকে যেতাম এবং প্রায়ই ছবিকে নিয়ে যেতাম। ইঞ্জিনিয়ার নিজেই আমাদের উৎসাহ দিতেন, মৈত্রেয়ী এবং আমি—আমাদের বিনোদনের জন্য আমাদের শেষের এই সপ্তাহগুলো কাটাচ্ছিলাম এক অসুস্থ ব্যক্তির বিছানার পাশে, মানসিক আলোড়নের মধ্যে। এটা সত্যই যে মৈত্রেয়ী দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সেই ১৫ই অক্টোবরের চীৎকারের পর ছবি শান্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তবু অতদিন ঘরের মধ্যে কাটানোর পর ওরও দরকার ছিল বাইরে যাবার। প্রত্যেকদিন গোধূলিতে আমরা বেরিয়ে যেতাম আর ফিরতাম রাত্রি নটা-দশটায়। ছবি প্রায় কথাই বলত না এবং সাধারণতঃ জলের একেবারে ধারে বসে থাকত, হয় গান গাইত অথবা কাঁদত—দৃষ্টি স্থির। আমরা ওর কাছেই থাকতাম এবং নিজেরা বক্‌বক্ করতাম। লুকিয়ে দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করতাম। যেন আচ্ছন্ন হয়ে মৈত্রেয়ী বলতো—একদিন তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। তুমি আমাকে পৃথিবী দর্শন করাবে।

ও আন্তরিকভাবে পালিয়ে যাবার কথা ভাবতো, বিশেষ করে ওকে যখন শোনালাম যে ব্যাঙ্কে আমার যথেষ্ট টাকা গচ্ছিত আছে। আমার মাসিক চারশ টাকা মাইনের প্রায় কিছুই খরচ হোত না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সেদিন ছিল ২৫শে অক্টোবর, লেকেই ছবি খুব অসুস্থ বোধ করতে লাগলো এবং ওকে ধরে পাড়ের ওপর শুইয়ে দিলাম। আমরা ওর কাছেই বসে রইলাম এবং ওর সঙ্গে কথা বলতে থাকলাম নরমভাবে আর চেষ্টা করতে থাকলাম ওকে হাসাবার। কিছুদিন ধরেই ও অকারণে হাসছিল এবং ডাক্তারদের মতে ওর ঐ হাসিখুশিভাব ছিল ভাল লক্ষণ।

হঠাৎ ছবি ওর দিদিকে প্রশ্ন করল—কেন তুমি অ্যালানকে ভালোবাসো না?

আমাদের হাসি পেল। ছবি প্রায়ই এরকম অর্থহীন কথা বলতো এবং আমরা ওকে ভয় পেতাম না।

—ওকে তো আমি দারুণ পছন্দ করি। হাসতে হাসতে বললো মৈত্রেয়ী।

—যদি তুমি পছন্দ কর তাহলে ওকে আদর করো।

মৈত্রেয়ী আরো জোরে হাসতে লাগলো এবং বললো যে ওর মতন একটা বুদ্ধিমতী মেয়ের কখনই এমন বোকার মতন কথা বলা উচিৎ নয়।

—ভালোবাসা বোকামি নয়। ছবি আন্তরিকভাবে কথাটা বললো।—যাও ওকে আদর কর। ঠিক আছে, দেখ আমি কেমন করে আদর করছি।

ছবি উঠে এসে আমাকে এক গালে আদর করলো। হাসতে হাসতে মৈত্রেয়ী আমাকে আদর করল আর এক গালে।

—এখন তুই খুশী তো? জিজ্ঞাসা করল মৈত্রেয়ী।

—তোর আদর করা উচিত ঠোঁটে।

ঠিক করে কথা বল। জোরেই বলে উঠলো লাল হয়ে যাওয়া মৈত্রেয়ী।

আমি খুশী হয়েছিলাম এই দেখে যে আমার ছোট্ট বোন ছবি যাকে এত পছন্দ করতাম সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল আমাদের ভালোবাসা। আমি মৈত্রেয়ীকে অনুরোধ করলাম আমার ঠোঁটের উপর চুমু খেতে। ও চাইল না। তখন যথেষ্ট ঠাণ্ডা। মৈত্রেয়ীর গায়ে শাল ছিল। আমি জানতাম কি ভাবে ওকে উত্তেজিত করে, বাধ্য করা যায়। শালের তলা দিয়ে আমার হাত ওর বাঁ দিকের বুক স্পর্শ করলো। আমার দুঃসাহসী আঙুলের তলায় ওর হৃদস্পন্দন অনুভব করতে পারছিলাম। মৈত্রেয়ী এই সোহাগের ভারসাম্য রাখতে না পেরে আমার বুকের উপর তক্ষুনি আছড়ে পড়লো। ছবি এলোমেলোভাবে দিদিকে জড়িয়ে ধরতে গেল। ছবির হাত আমার হাতে ধাক্কা খেল। আমি চেয়েছিলাম ওর অজান্তেই যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে আনবো। ও হাসতে আরম্ভ করল্যো এবং জোরে চেঁচিয়ে উঠল উল্লসিত হয়ে।

—দেখলি অ্যালানের হাত কোথায় ছিল?

—বোকার মতন কথা বলিস না। ওটা আমার হাত, শুকনো গলায় বলল মৈত্রেয়ী।

—যেমন আমি জানতাম না। যেমন আমি বুঝতে পারিনি অ্যালানের আংটিটা…

ছবির মুখে রূঢ় সত্য আমাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন করে তুললেও যেহেতু ছবি প্রায়ই এরকম উল্টোপাল্টা বলতো আমি ভাবতে পারিনি যে এই ঘটনা পরে গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে।

মৈত্রেয়ী আমার ঠোঁটে চুমু খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিল। তখন রাত্রি হয়ে গেছে, আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। বাড়ী পৌঁছনোর আগেই আমরা সবকিছু ভুলে গেলাম।

সেই রাত্রে মৈত্রেয়ী আমার ঘরে আসেনি। আমি জানিনা পরের সারাটা দিন কিভাবে কেটে গিয়েছিল। সন্ধ্যে ছটায় আমি বাঙ্গালী পোষাক পরে লেকে যাবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। কেউ আমায় খুঁজতে এল না। একটু সাহস নিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা আজকে সন্ধ্যায় বার হবো কিনা। ও উত্তর দিল এমন একটা কণ্ঠস্বরে যা আমার কাছে মনে হলো উদ্ধত। এই ধরণের কণ্ঠস্বর হয়ত ওর ছিল না। ওকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে গাড়ী যেন গ্যারাজ করে দেওয়া হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাচ্চুর সঙ্গে দেখা হোল করিডরে। ও আমাকে বলেছিল যে মিসেস সেন মৈত্রেয়ী, ছবি কাউকেই অনুমতি দেননি লেকে যাবার। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এক রহস্য আমাকে ঘিরে ধরছে। এই রহস্য ভেদ করা দরকার। আমি মৈত্রেয়ীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম কিন্তু সফল হলাম না। উদ্বেগ এবং যন্ত্রনা নিয়ে ঘরেই রইলাম।

রাতের খাবারের জন্য যেমন বাড়ীর লোকরা ডাকতে আসতেন আজ আর কেউ এলেন না। ডাকতে এল বাড়ীর চাকর। টেবিলে দেখলাম শুধু মিসেস সেন আর মৈত্রেয়ী। তারা কেউ কোন কথা বললেন না। আমি শান্ত থাকতেই চেয়েছিলাম এবং মনে হয় তাতে দারুণভাবে সফল হয়েছিলাম। মিসেস সেন আমাকে সোজাসুজি দেখার চেষ্টা করছিলেন। আমি ওর স্থির এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারছিলাম না যা আমার হৃদয় ভেদ করে যাচ্ছিল। ওঁর মুখে লেগেছিল একধরণের আশ্চর্যজনক একাগ্রতা এবং ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। ঠোঁট দুটো পান খেয়ে লাল; যেমন সাধারণত থাকত। উনি খুব নম্র এবং চুপচাপ ভাবেই দেখছিলেন। তারপর একবার ঘুরে এসে নতুন করে বসে, কনুই দুটো টেবিলের উপর ভর দিয়ে আমায় পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। হয়তো উনি মনে মনে ভাবছিলেন সম্মান এবং সচ্চরিত্রতার তলায় কেমন করে ওঁকে আমি এতদিন ধরে ঠকিয়ে আসছিলাম। ওঁর উগ্র ও শ্লেষপূর্ণ ভাবগতিকের মধ্যে আমি ভাবছিলাম উনি মনে মনে প্রশ্ন করছিলেন কেমন করে আমি 'এমন কাজ' করলাম? আমি জানতাম না 'এমন কাজ' বলতে মিসেস সেনের মতে কি বোঝায়। কিন্তু উনি যে এই প্রশ্নই করতে চাইছেন

সেটা আমি বেশ ব্ঝতে পারছিলাম এবং ভাব দেখাচ্ছিলাম যে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যেই আছি। আমি ও'র সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তাকিয়েছিলাম সোজাসুজি, জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেমন আছেন উনি, কেন আর কেউ রাতের খাবার খেতে আসেননি ইত্যাদি।

মৈত্রেয়ী টেবিলের তলায় নিজের পা দিয়ে আমার পা জোরে চেপে রেখে ওর আবেগ ও ভয়কে প্রকাশ করছিল। তারপর অনুভব করলাম ওর নরম ত্বক আলতো করে আমার ত্বকে ঘসে যাচ্ছে। এই ভাবে ও আমাকে ওর আসক্তি ও উষ্ণতায় ভরিয়ে দিতে চাইল যা আমি কোনদিনই ভুলব না। এমনকি যদি ওর থেকে আলাদা হয়ে যাই। দূরে চলে যাই তবুও···

মিসেস সেনকে কেউ ডাকল। সেই আমরা একা হলাম। মৈত্রেয়ী তার আবেগ চাপতে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলল—ছবি মাকে সব বলে দিয়েছে। কিন্তু আমি অস্বীকার করেছি। ভয় পেয়ো না। আমি তোমারই আছি। যদি তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলে কিছ্ু স্বীকার কোর না। নইলে···

ওর চোখে জল এল এবং অভ্যাসমত আমার হাত ধরতে গেল। তখনই মিসেস সেন আসছিলেন। নিচু গলায় ও আমাকে শুধু বলার সময় পেল —কাল এসো, সকালে লাইব্রেরীতে। মৈত্রেয়ীর মুখ থেকে সেই ছিল আমার শোনা শেষ কথা।

ওর মা ওকে নিয়ে গেলেন, আর আমি চলে গেলাম আমার ঘরে—আত্ম-বিশ্বাসহীন, দিশাহারা, ভাবতে পারছিলাম না পরের দিন কি ঘটবে।

ঘুমোতে পারিনি। আমার আরামকেদারায় বসে পাইপের পর পাইপ টেনে গেলাম। ক্রমশঃ সকাল হয়ে এল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি ও এল। ও এসে ভুলিয়ে দেবে সব দুশ্চিন্তা সব উদ্বেগ। ভুলে যাব সব প্রতিযোগিতার কথা যার সম্মুখীন আমি হয়েছিলাম ওর জন্য, সেই সব সন্দেহ যার জন্য আমি কষ্ট পেয়েছিলাম। ভাবছিলাম প্রকাশ করতে পারবো আমার ভেতর যে ভালোবাসা বেড়ে উঠছে যার কোন সীমা নেই আর যা মৈত্রেয়ী কোন দিন চিন্তা করতে পারে নি। অধৈর্যভাবে সকালের জন্য অপেক্ষা করছিলাম যখন ওকে বলব যে এক রাত্রি আলাদা থাকায়, এক ভীতি-প্রদর্শন আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসা শিখিয়েছে এবং শুধু আজকেই আমি জেনেছি ও আমার কতখানি প্রিয়, আজকে যখন আমি ওকে হারানোর ভয় পাচ্ছি।

আমি কাঁদছিলাম একা একাই, ওকে হারানোর ভয় নিয়ে। আমার ভীষণ

কণ্ট হচ্ছিল। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমরা আলাদা হয়ে গেলেও আমি বে'চে থাকতে পারবো। ওকে ভালোবেসেছিলাম সেই সময় থেকে যখন থেকে ওকে জেনেছি যে ও আমার এবং কেউ আমাকে বাধা দেয়নি ওর সঙ্গে কথা বলতে, ওর দিকে এগিয়ে যেতে—আর আজ একটা বাধা, একটা বিপদ হঠাৎ এল আমাদের দ্‌জনের মাঝখানে। মনে হচ্ছিল অপেক্ষা করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যাবো। কখন আমি ওকে দেখতে পাবো ?

রাত্রিবেলায় অনেকবার বাগানে পায়চারি করতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে সর্বদাই আলো জবলছিল। ওপর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল আর মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছিল। শোনা যাচ্ছিল, বিলাপ আর কান্না। কার গোঙানি ? মৈত্রেয়ী, ছবি, বাচ্চুর বোন, কে ? ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছিলাম না। চূড়ান্ত অসহায় হয়ে পড়লাম। ঘরে এসে আরামকেদারায় বসে খ‍ুঁজতে লাগলাম মৈত্রেয়ীর সেই কথাগুলোর যথার্থ অর্থ—ছবি সব বলে দিয়েছে। ওর মানসিক ভারসাম্যহীনতার মধ্যে ও কি বলতে পারে ? ও কি দেখে এবং বুঝে থাকতে পারে ? হয়ত রাতে কোন দিন দিদিকে লক্ষ্য করেছিল।

পরে জেনেছিলাম যে ছবির বিশ্বাস এবং বক্তব্য ছিল একেবারেই তুচ্ছ। সেই সেদিন যখন মিসেস সেন ছবির মাথা ধ‍ুয়ে দিচ্ছিলেন তখন ছবি একটানা কে'দেই চলছিল। মিসেস সেন ওকে জিজ্ঞেস করলেন ও কেন কাঁদছে। ও উত্তর দিল যে ও যন্ত্রণা পাচ্ছিল কারণ কেউ ওকে পছন্দ করে না কিন্তু মৈত্রেয়ীকে সবাই পছন্দ করে : সবাই মৈত্রেয়ীর জন্মদিনে এসেছিলেন এবং উপহার দিয়েছিলেন। —অ্যালান বিশেষ করে পছন্দ করে মৈত্রেয়ীকে—ও যোগ করল। মিসেস সেন জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন করে তুই জানলি ?

—অ্যালান ওকে আদর করে। আমাকে কেউ আদর করে না······।

ছবি এমন ভাবে কাঁদতে থাকলো এবং কণ্ট পেতে লাগলো যে মিসেস সেন ওকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন। ছবি যা দেখেছিল তা সব বলে তবে শেষ করল : লেকে আমরা একসঙ্গে ছিলাম, হাসছিলাম, চুম্বন বিনিময় হচ্ছিল, বাহুর মধ্যে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে ছিলাম······। আমি ভেবেছিলাম যে ছবি কিছুই পর্যবেক্ষণ করেনি।

মিসেস সেন তৎক্ষণাৎ মৈত্রেয়ীকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে ছবি যা বলেছে তা সঠিক কিনা। তারপর উনি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন গাড়ী গ্যারাজ করার জন্য এবং মেয়েকে নিয়ে চত্বরের ওপর উঠে গেলেন। উনি মৈত্রেয়ীকে

প্রতিজ্ঞা করালেন তাঁদের পূর্বপুরুষ ও ঈশ্বরের নামে। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে গেলেন। মৈত্রেয়ী সব অস্বীকার করল। ও শুধু স্বীকার করল যে ও আমাকে মাঝে মাঝে মজা করে চুমু খেয়েছে এবং আমি তার বদলে ওকে চুমু খেয়েছি ওর কপালে। মৈত্রেয়ী ওঁর হাঁটু ছুঁয়ে মিনতি করলো যে তিনি যেন ইঞ্জিনিয়ারকে কিছু না বলেন।—আমি কোন ক্ষতিই সহ্য করবো না যেহেতু আমি দোষী নই। সবাই যদি বলে তাহলে ও আমার সঙ্গে আর দেখা না করাটা নিশ্চই মেনে নেবে এবং যে অন্যায় ও করেছে তার শাস্তি ও পাবে। পরে শুনেছিলাম ও চিন্তা করেছিল যে আমার সঙ্গে সময়মত পালিয়ে যাবে। মৈত্রেয়ী বাবাকে খুব ভয় পেত। উনি ওঁর ঘরে মৈত্রেয়ীকে আটকে রাখতে পারতেন অথবা কয়েকদিনের মধ্যেই ওর বিয়ে দিয়ে দিতে পারতেন আমার সঙ্গে দেখা করা বা পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করার আগেই। সেই রাত্রে ওকে মায়ের ঘরে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। মিসেস সেন ইঞ্জিনিয়ারকে সব কিছুই খুলে বললেন এবং পরে চিন্তা করতে থাকলেন এই প্রেমের ঘটনাটা কিভাবে লুকনো যায়…। এই অভিশাপ সমস্ত বাড়ীর ওপর পড়বে এবং এর কলঙ্ক ওঁদের সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এইসব খুঁটিনাটি আমি জেনেছিলাম পরের দিন অথবা তার পরের দিন বাচ্চুর কাছ থেকে। কিন্তু সেই রাত্রে আমি আরও খারাপ কিছুর কল্পনা করলাম। আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে ছবি ওর দিদিকে দেখেছে আমার ঘরে আসতে এবং সব ওর মাকে বলে দিয়েছে।

সকাল হবার আগেই আমি লাইব্রেরীতে মৈত্রেয়ীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম সব খবর জানবো বলে। দিন হাওয়া পর্যন্ত তাকের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। না এলো মৈত্রেয়ী না বাচ্চুর বোন, না রমু যাদের দিয়ে একটা খবর অন্তত ও পৌঁছে দিতে পারে। সাতটা নাগাদ মিসেস সেন নিচে নামলেন চা তৈরীর উদ্দেশ্যে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ঘরে ফিরে এলাম।

অপেক্ষা করছিলাম জলখাবারের জন্য যদি কেউ ডাকে। কেউ এলো না। তারপর ইঞ্জিনিয়ার আমার ঘরে এলেন—কালো চশমায় চোখ ঢাকা, বেতালা হাঁটা এবং হাতদুটো কাঁপছে দুর্বলতায়।

—প্রিয় অ্যালান, আমি ঠিক করেছি এবার অপারেশনটা করিয়েই নেব যা ডাক্তাররা অনেকদিন থেকে বলে আসছেন।

ওঁকে মনে হলো খুব আবেগতাড়িত কিন্তু কণ্ঠস্বরে একটা বন্ধুবৎ

আন্তরিকতা বজায় ছিল।

—অন্ততঃ দু'তিন মাস আমার ক্লিনিকে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। আমি চিন্তা করেছি আমার স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ী মেদিনীপুর পাঠিয়ে দেব। তুমিও শ্রান্ত, কিছু দিন পাহাড়ে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে এস।

—কখন যাবো আমি ? এমন শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম যে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সত্যি বলতে কি আমি ঠিক পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছিলাম না যে কি ঘটতে যাচ্ছে।

—আজকেই। উত্তর দিলেন ইঞ্জিনিয়ার।

—আমি দুপুরের খাওয়া সেরেই ক্লিনিকে চলে যাচ্ছি।

চশমার কাচের আড়াল থেকে আমায় পর্যবেক্ষণ করলেন। এ কথা সহ্য করার মত শক্তি কি করে খুঁজে পেলাম জানিনা যদিও মনে হচ্ছিল আমার শরীরের সমস্ত রক্ত শিরা উপশিরা ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে।

—ঠিক আছে আমি উত্তর দিলাম।—কিন্তু জানি না কোথায় যাবো। আমাকে একটা আস্তানা খুঁজতে হবে, এইসব জিনিস নিয়ে যেতে হবে। এই বলে আমি আমার দুটো ট্রাংক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র দেখালাম।

ইঞ্জিনিয়ার সৌজন্যপূর্ণ হাসি হাসলেন।

—তোমার মত একটা উদ্যমী ছেলে সব সময়েই অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারে। তুমি যদি এক্ষুণি বেরিয়ে পড় তো দুপুরের খাওয়ার আগেই একটা আস্তানা খুঁজে বার করতে পারবে। বাচ্চু ট্রাকে করে তোমার সব জিনিষ পত্তর দিয়ে আসবে। পাহাড়ে যাবার আগে তোমার কোন বন্ধুর বাড়ীতেই থাকতে পারো। ফিরে এসে আরো ভালোভাবে গুছিয়ে নিতে পারবে······

উনি উঠে পড়লেন। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছিল। আমি চাইলাম তক্ষুণি চলে যেতে কিন্তু মিসেস সেন যিনি করিডর থেকে সব কিছু শুনেছিলেন, আমার ঘরে ঢুকলেন এবং স্মিতহাস্যে বললেন—তুমি না খেয়ে যেতে পারবে না।

—আমি কিছু খেতে পারবো না। নিস্তেজ গলায় বললাম।

—আমি তোমায় খাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। উনি বলে চললেন একই নরম গলায়।—চা তৈরী হয়ে গেছে।

মনে হচ্ছিল যে কোন সময়ে জ্ঞান হারাতে পারি। আমি চলে গেলাম। আমি মৈত্রেয়ীকে আর দেখিনি। জানতে পারিনি ওপরে ওর ঘরে ও কি করছিল

তখন··· ।

ইঞ্জিনিয়ার চলে গেলেন এবং আমি চুল টেনে ধরে, হাত কামড়ে ধরে পাগলের মত কান্নায় ফোঁপাতে লাগলাম। ইজিচেয়ারে নিজেকে সমর্পন করলাম। শ্বাস রোধ হয়ে আসছিল যন্ত্রণায়। জানিনা সেই যন্ত্রণাকে কি বলা যেতে পারে সেটা প্রেমের জন্য খুন হবার যন্ত্রণা নয় বা কষ্ট নয় কিন্তু একটা সমগ্র অনুভূতির ক্রিয়াশক্তি যেন হারিয়ে যাওয়া। আমি যেন হঠাৎ এসে পড়লাম একা একটা কবরখানার ভেতর, আমার কাছে কেউ নেই যে আমার গোঙানির আওয়াজ টুকুও শুনবে বা আমায় সান্ত্বনা দেবে। আমি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছিলাম।

রমু চোখে জল নিয়ে আমার ঘরে ঢুকে ঝট্‌পট্‌ একটুকরো কাগজ দিল। তাতে লেখা, "ওরা কেউ চায় না আমি তোমার দেখা পাই। নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে দিও না। নিজেকে ভেঙে পড়তে দিও না। সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও। সবাইকে দেখাও তোমার শুদ্ধতা। একটা মানুষের মতন মানষ হও। তুমি শীগ্‌গীরই আমার কাছ থেকে একটা খবর পাবে—মৈত্রেয়ী।"

হাতের লেখাটা বিশৃংখল। লেখাটা আগোছালো ইংরাজীতে। কাগজে কালির দাগ। তাড়াতাড়ি কাজটা হাতের ফাঁকের মধ্যে লুকলাম। মিসেস সেন ঘরে ঢুকলেন, পিছনে একজন চাকর।

—আমি তোমাকে অনুরোধ করবো। নরম সুরে বললেন উনি। হয়ত সেই কণ্ঠস্বরে তখনও ছিল সমবেদনার সুর। উনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন এবং ছেলে বলে ডাকতেন। ওঁর দুই মেয়ের পরে একটা ছেলের কামনা করা উচিত ছিল।

আমি পারলাম না ওঁর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, ক্ষমা চাইতে, ওঁর বাড়িতে আমাকে আশ্রয় দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে। দরজার কাছে উনি স্থির দাঁড়িয়েছিলেন সোজা এবং চুপচাপ। ঠোঁটে লেগেছিল অল্প বিদ্রূপ মেশানো ঠাণ্ডা হাসি।

—যাবার আগে বাচ্চাদের একটু দেখতে পারি? ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে নরেন্দ্র সেন ঘরে ঢুকলেন।

—মৈত্রেয়ী কষ্ট পাচ্ছে। বললেন উনি।—ও এখন ঘর থেকে নেমে আসতে পারবে না।

তারপর স্ত্রীকে বললেন—ছবিকে একবার ডাকো। মিসেস সেন

চলে গেলেন। যখন মিঃ সেন আর আমি একা, তখন আমায় একটা বন্ধ খাম এগিয়ে দিলেন। বললেন—আমি তোমায় অনুরোধ করবো এটা এই বাড়ী থেকে চলে যাবার পর পড়তে। যতটুকু যা আমি করতে পেরেছি তোমার জন্য এখানে, এই ভারতে, পারলে তার সম্মান দিও ; যতটুকু আমার প্রাপ্য ততটুকুই···

উনি আমাকে উত্তর দেবার সময় না দিয়েই চলে গেলেন। যন্ত্রচালিতের মতো আমি চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম।

ছবিকে দেখামাত্র তুলে নিলাম কোলের মধ্যে আর কাঁদতে কাঁদতে ওকে দোলাতে লাগলাম।—কি করলে ছবি? কি করলে তুমি? বেচারি বাচ্চাটা কিছুই বুঝল না কিন্তু আমাকে কাঁদতে দেখে নিজেও কাঁদতে লাগলো এবং আমার মুখে চুমু খেলো। ওর শরীরের উপর আমি মাথাটা নুইয়ে দিলাম এবং যন্ত্রের মতন দোলাতে থাকলাম, যেন আমি সংজ্ঞাহীন, কোন কিছু বলার ক্ষমতা নেই, শুধু বলছি।—কি করলে ছবি? কি করলে?

ওকে মনে হোল যেন জ্ঞান ফিরে পেল এবং আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো—কিন্তু আমি, কি আমি করলাম? কেন তুমি কাঁদছো অ্যালান? তুমি কেন কাঁদছো?

আমার মুখটা মুছবো বলে ওকে নামিয়ে দিলাম মাটিতে। মিসেস সেন এবং ওঁর স্বামী দরজার কাছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুজনেই বরফের মতন ঠাণ্ডা, মনে হোল ওঁরা যেন আমায় বলছেন—এবার যাবার সময় হলো। চলে যাও।

আর একবার ছোট্টটাকে দুগালে আদর করলাম এবং মন ঠিক করে ওঁদের আমার শুভেচ্ছা এবং নমস্কার জানালাম।

—গুড্ বাই অ্যালান। বলেই ইঞ্জিনিয়ার হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

করিডরের দিকে এগিয়ে গেলাম, ভাব দেখালাম যেন কিছুই দেখছি না। ছবি কাঁদতে কাঁদতে আমার পিছনে দৌড়তে লাগলো—কোথায় যাচ্ছ তুমি অ্যালান? ওর মাকে জিজ্ঞাসা করল—ও কোথায় যাচ্ছে?

—অ্যালান অসুস্থ। ও চিকিৎসা করাতে যাচ্ছে। ওকে ধরে জবাব দিলেন মিসেস সেন নিচু গলায়।

বারান্দা পেরিয়ে নেমে গেলাম, চোখ আমার ছিল বারান্দার দিকে। দেখতে পেলাম মৈত্রেয়ীকে। আমার নাম ধরে কাঁদছিল। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল আর আতংক নীল মুখ। দেখলাম উল্টে পড়ে গেল জ্ঞান হারিয়ে আমি ওপরে উঠতে

গেলাম। ইঞ্জিনিয়ার আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন।—তুমি কি কিছু ভুলে গেছ?

—না, কিচ্ছু না।

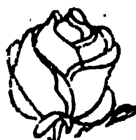
ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলাম, লাফ দিয়ে প্রথম গাড়ীটায় উঠলাম। আর একবার বাড়ীটার দিকে তাকাতে চাইলাম কিন্তু তখন চোখ ভর্ত্তি জল। কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। গাড়ীটা স্টার্ট দিয়েই বাঁক নিল। আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

যখন সম্বিৎ ফিরে এল, দেখলাম গাড়ীটা পার্ক স্ট্রীটে। খামটা ছিঁড়ে ফেললাম এবং মিঃ সেনের চিঠিটা পড়লাম শ্বাসরুদ্ধ হয়ে। কোন ভূমিকা না করেই উনি লিখেছেন ইংরাজীতে। পাতার কোনায় উনি লিখে রেখেছেন "একান্ত গোপনীয়"।

"তুমি একজন বিদেশী। আমি তোমায় জানি না। যদি তোমার জীবনে পবিত্র কিছু থাকে এবং বিবেচনা করতে সক্ষম হও, আমি তোমায় অনুরোধ করবো আমার বাড়ীতে আর কখনও না আসতে। আমার বাড়ীর কারও সঙ্গে দেখা করতে এবং কাউকে কিছু লিখতে। যদি তুমি আমার সাথে দেখা করতে চাও, আমাকে অফিসে পাবে। যদি কোনও দিন আমায় লিখতে চাও তাহলে এমন কিছু লিখবে না যা এক অজানা ব্যক্তি আর একজন অজানা ব্যক্তিকে লিখতে পারে অথবা একজন অধস্তন তার উপরওয়ালাকে লিখতে পারে। আমি তোমায় অনুরোধ করবো এই চিঠির কথা কারও কাছে প্রকাশ না করতে এবং পড়ার পরে ছিঁড়ে ফেলতে। আমার এই ব্যবহারের কারণ তোমার কাছে মনে হয় পরিষ্কার যদি তোমার স্থূল রুচির মধ্যে অতি সামান্যও বিচক্ষণতা বর্তমান থাকে। তুমি নিশ্চই বুঝতে পারছো তোমার নিজের অকৃতজ্ঞতা এবং আমার ক্ষতি যা তুমি আমার ওপর চাপিয়ে দিলে।

নরেন্দ্র সেন।"

বিঃ দ্রঃ—তোমাকে অনুরোধ করবো যে অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টায় বিরক্তিকর কিছু দেখিয়ো না। তুমি কেবলই নতুন কিছু মিথ্যা যোগ করতে পার যা তোমার নোংরা চরিত্র তোমায় এতদিন করিয়েছে।



হারোও বাড়ী ছিল না। কিন্তু ওর গৃহকর্ত্রী ওর শোবার ঘরের দরজা খুলে দিলেন। পাখাটা সম্পূর্ণ জোরে চালিয়ে দিয়ে, আমি ওর বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথাটা ঠাণ্ডা করার দরকার ছিল। গৃহকর্ত্রী মিসেস রেনে খুবই বিচলিত বোধ করছিলেন, আমাকে কি প্রশ্ন করবেন তাও বুঝতে পারছিলেন না।

ওনাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বললাম—আমার কোন বিপদ হয়নি, উদ্বিগ্ন হবেন না। মিঃ সেনের আজ অপারেশন হবে, তার জন্যই চিন্তিত আছি।

নিজের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। হারোও বা এই মহিলা কাউকেই কিছু আমার বলতে ইচ্ছে করছিল না। পরবর্তীকালে হারোওর স্মৃতিচারণ আমার অসহ্য লাগবে। ও ওর সমস্ত ইয়ার বন্ধুদের কাছে আমার 'কাহিনী' রসিয়ে রসিয়ে বলার জন্য ছুটবে। মেয়েরা আমায় সান্ত্বনা দেবার জন্য ছুটে আসবে। ওদের সঙ্গে মদ খেতে আর রাত কাটানোর জন্য অনুরোধ করবে। আমি কোন সান্ত্বনা কারো কাছ থেকে সহ্য করতে পারবো না। এই সমস্ত লোকেদের কাছে মৈত্রেয়ীর নাম উচ্চারণ করতে আমার ইচ্ছা করছিল না। আমার কিছু ভাল লাগছিল না। আমি সম্পূর্ণভাবেই আমার বেদনার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। কোন কিছুই স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারছিলাম না। শুধু পুরনো বোধ বুদ্ধি দিয়ে এইটুকু বুঝতে পারছিলাম যে আমি আর মৈত্রেয়ী আজ বিচ্ছিন্ন। অসম্ভব! অসম্ভব! যখনই তার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতো—মৈত্রেয়ীর দেহ বারান্দায় শায়িত, আমি আতঙ্কে কেঁপে উঠতাম। অন্য চিন্তায় মনকে নিযুক্ত করার চেষ্টা করতাম, অন্য স্মৃতি আনার চেষ্টা করতাম—জুঁই ফুলের মালা, লাইব্রেরী, চন্দননগর···মনটা একটু শান্ত হতেই সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠল শেষ দৃশ্য : খাবার টেবিলে মিসেস সেনের বিদ্বেষভরা দৃষ্টি, মিঃ সেনের কথা—যদি কিছু ভালো করে থাকি তোমার, তার জন্য যদি আমায় সামান্য কৃতজ্ঞতা জানাতে চাও···।

ঘণ্টা খানেক বাদে মিসেস রিবেরিও এসে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি খেতে চাই—চা, হুইস্কি, বিয়ার···। আমি সব কিছু প্রত্যাখ্যান করলাম এমন এক ভঙ্গীতে অথবা হয়ত আমার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে বৃদ্ধা মহিলা গুরুতর চিন্তিতভাবে আমার বিছানার দিকে এগিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞাসা

করলেন—অ্যালান তুমি কি অসুস্থ ?

জানিনা কি উত্তর দিয়েছিলাম। বোধ হয় বলেছিলাম, গত কয়েক মাস বড্ড কাজের চাপের মধ্যে ছিলাম···এই গ্রীষ্মে কোথাও বেড়াতে যাইনি··· মিঃ সেনের জন্য আমি খুবই বিচলিত, এই রকম কিছু উত্তর হয়ত দিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওনার কোন ঘর খালি আছে কি না। আমি কিছু দিন বাইরে ঘুরে এসে ভাড়া নেবো। খালি ঘরের কথা শুনে ভদ্রমহিলা খুব খুশী হলেন এবং তক্ষুনি আমায় পাশের ঘরটা দেখতে বাধ্য করলেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আমি কেন আলিপুরের বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছি। ওনার কৌতুহল আমায় ক্লান্ত করছে দেখে উনি প্রসঙ্গ পাল্টে আমার জ্বর সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এবং আমায় পাহাড়ে কোথাও বেড়াতে যাবার পরামর্শ দিলেন—দার্জিলিং, শিলং অথবা সমুদ্রের ধার—পুরী বা গোপালপুর যেখানে গিয়ে ফাদার জুসতুস সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে ছিলেন। ওনার সব কথা শুনলাম এবং সব কিছুতেই সায় দিলাম যাতে কথা না বাড়ে। তিনি ফয়ার থেকে স্টেটস্‌ম্যান কাগজ নিয়ে এসে হোটেলের ঠিকানা দেখতে শুরু করলেন আর আমায় জানাতে থাকলেন।

হারোওর বিছানায় শায়িত আমার দেহ, যে সিগারেটগুলো আমি খাচ্ছিলাম সেগুলো থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে যাওয়া ধোঁয়া, এই অনর্গল বকে যাওয়া ভদ্রমহিলা সবই অবাস্তব মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি স্বপ্ন দেখছি। মৃত্যুই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমাকে মরতেই হবে।

মনে হচ্ছিল এই রকম পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমি কয়েক দিন থাকলেই পাগল হয়ে যাবো। আমাকে পালাতে হবে। আমাকে পালাতে হবে এক প্রগাঢ় নির্জনতার মধ্যে। সব ভুলতে হবে, সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন নিজেকে ভোলার। ঠিক করলাম পরের দিনই আমি চলে যাবো।

মিসেস রিবেরিওকে বললাম—অনুগ্রহ করে একবার মিঃ সেনকে ফোন করবেন—south 1147, বলুন উনি যেন এখানে আমার জিনিসপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

অন্য সময় হলে হয়ত রিবেরিও একজন 'কালা আদমি'কে ফোন করতে চাইতেন না কিন্তু যেহেতু ওনার বাড়ীতেই ভাড়া থাকবো, তাই উনি তাড়াতাড়ি ছুটলেন ফোন করতে। সম্ভবত শিবুই ফোন ধরেছিল।

—আমি আপনার ঘরটা পরিষ্কার করে দিই। বলে চলে গেলেন রিবেরিও। ওনাকে যেতে দেখে আমি বাস্তবিকই খুশী হলাম। কান্না আর আমি চেপে

রাখতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে হোল আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। একটা আর্শির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি নিজেকে চিনতে পারছিলাম না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার চেহারায় আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছিল। বোধ হয় সেই দিন থেকেই আমি বুঝেছিলাম মানুষের বাহ্যিক রূপের কোনই মূল্য নেই। মানুষের মুখে তার চরিত্রের কিছুই লেখা থাকেনা। হয়ত শুধু চোখ দুটোই একমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা করলেও করতে পারে।

অসীম ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে আমি বিছানায় আশ্রয় নিলাম। শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ছাদের দিকে শূন্যে দৃষ্টি মেলে রইলাম। এমন সময় দারুণ আনন্দে হৈ হৈ করতে করতে হারোও এসে ঢুকলো। ঘরে ঢুকেই সমস্ত ঘটনা জানতে চাইল। আমি প্রচণ্ড মাথা ধরেছে বলে ওকে সামান্য দু-একটা কথায় ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবস্থা করলো এবং দৃঢ় ভাবে জানালো হুইস্কি খেলে সব যন্ত্রনারই উপশম হয়। ও নিজের ঘর থেকে হুইস্কির বোতল নিয়ে এল। আমি এক বার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড দুঃখ বোধে পুনরায় আক্রান্ত হলাম। ঠিক এই সময় বাচ্চু এসে ঘরে ঢুকলো। প্রচণ্ড আবেগে আমি ওকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম। ওকে আমার প্রেমের দূত বলে মনে হচ্ছিল। বাচ্চুর পরণের ধুতি ছিল ময়লা, খালি পা। আমার ঘরের অন্যান্যরা ওর দিকে বিতৃষ্ণার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল। ও কিন্তু সহজভাবেই কুলীদের পরিচালনা করছিল। আমি অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিলাম কখন শেষ হবে ওর কাজ আর আমি জানতে পারবো মৈত্রেয়ীর অবস্থা—ওখানে কি ঘটেছে। আমি কুলীর পয়সা মিটিয়ে ওকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গেলাম। যাবার আগে মিসেস রির্বেরিওকে আমাদের দুজনের জন্য চা পাঠাতে বলে দিলাম। হারোও রাগে ফেটে পড়ছিল। ও চাইছিল একা আমার সঙ্গে তখন কথা বলবে। ও বুঝতেই পারছিল আলিপুর থেকে আমার চলে আসার ব্যাপারটা অত সোজা ছিল না। ও অবশ্য আমাদের বিরক্ত করতে আসেনি।

বাচ্চু আমার জন্য এক কপি 'উল্লেখ' নিয়ে এসেছিল। বইটায় মৈত্রেয়ীর শেষ কথা "আমার ভালোবাসাকে, আমার ভালোবাসাকে"—মৈত্রেয়ী, লেখা ছিল। আমি বিষণ্ণ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—শুধু এই? বাচ্চু আমাকে বইএর শেষ পাতাটা দেখতে বললো। লেখা ছিল 'চিরবিদায় প্রিয়তম। আমি এমন কিছু

বলিনি যাতে তুমি দোষী হও। শুধু এইটুকুই বলেছি যে তুমি আমার কপালে চুমু খেয়েছিলে। এটুকু আমায় স্বীকার করতেই হয়েছিল কারণ উনি আমার মা। অ্যালান আমার বন্ধু, আমার প্রেম, বিদায়—মৈত্রেয়ী'।

দুঃখে যন্ত্রণায় আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। হাতের লেখাটাই বার বার দেখছিলাম। বাচ্চু চুপচাপ সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎই সে বলতে শুরু করলো—সবই জানাজানি হয়ে গেল। অবস্থা চরমে উঠলো। সত্যি কথা বলতে কি আপনারা ভীষণই অসাবধানী ছিলেন। ড্রাইভারও আপনাদের একাধিকবার দেখেছে, আপনার ঘরেই। ও শিবু আর রমুকেও বলেছিল। কেউই সাহস পায়নি আপনাদের সাবধান করে দিতে।

আমি আপন মনেই প্রশ্ন করছিলাম বাচ্চু কি শুধু ওইটুকুই বুঝতো, জানতো? সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারছিলাম এসব নিয়ে এখন আর চিন্তা করে কোন লাভ নেই। বাচ্চু আবার বলতে শুরু করলো—ছবি যেন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলো যখন দেখলো মৈত্রেয়ী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ও বার বার জিজ্ঞাসা করছিল অ্যালান কোথায় গেল, অ্যালান কোথায় গেল। মার শাড়ী ধরে টানছিল আর বার বার এক প্রশ্ন করে চলেছিল। আমি যখন ওকে বললাম যে আমি আপনার কাছে যাচ্ছি তখন ও আপনাকে একটা চিঠি লিখে দিল।

স্কুলের খাতার পাতা ছিঁড়ে ছবি ওর সবচেয়ে যত্ন করে সুন্দর হাতের লেখায় বাংলায় লিখেছিল, "প্রিয় অ্যালান তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পারবে? জানিনা কেন আমি ওসব কথা বলে ফেলেছিলাম। মনে হয়নি যে কোন অন্যায় করছি যেহেতু আমি মনে করিনা তুমিও ভালোবেসে কোন অন্যায় করেছ। মৈত্রেয়ীর কষ্ট চোখে দেখা যাচ্ছেনা। তুমি কিছু কর যাতে ও এত কষ্ট না পায়। তোমার ভালোবাসা এখন কোথায় গেল? কেন আমি মরছিনা? আমি মরে যেতে চাই।"

—ও লেখার সময় প্রচণ্ড কাঁদছিল আর আমি যেন অতি অবশ্যই আপনাকে চিঠিটা দিই, এই কথা বার বার বলছিল। ও চায় আপনি ওকে টেলিফোন করুন। ও এখন সুস্থ হয়ে গেছে…

বাচ্চু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

—কি হোল বাচ্চু?

—আপনাকে দেখে আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

বাচ্চু যথেষ্ট করুণ মুখ করে কথাগুলো বলছিল কিন্তু ওকে আমার একজন অপরিচিত ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। ও প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো

—আমি যখন জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম তখন মৈত্রেয়ী নিচে নেমে এসে আপনার জিনিসপত্র স্পর্শ করে করে দেখছিল। ওকে সবাই মিলে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল। ও চিৎকার করে কাঁদছিল আর জবরদস্তি করছিল দেখে ওকে মিঃ সেন এমন মারলেন যে ওর মুখ ফেটে রক্ত পড়তে শুরু করলো। টেনে হিঁচড়ে ওকে দোতলার ঘরে নিয়ে যেতেই ও আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

আমি মানসচক্ষে মৈত্রেয়ীকে দেখতে পাচ্ছিলাম—রক্তাক্ত মুখ, পাগলের মতো ধস্তাধস্তি করছে আর মার খাচ্ছে। কিন্তু ওর ক্ষত, কষ্ট আমাকে যত না যন্ত্রণা দিচ্ছিল, ওর উপস্থিতি ওর সান্নিধ্য যে ক্রমশঃ বহু বহু দূরে চলে যাচ্ছে এই ভাবনাই আমায় ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলছিল।

—ওরা ওকে ওর শোবার ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। যাতে ও আপনার সঙ্গে শেষ দেখাও না করতে পারে। আপনি যে সমস্ত বই উপহার দিয়ে ছিলেন সব কেড়ে নিয়েছিল। যতক্ষণ ও অজ্ঞান হয়ে ছিল ততক্ষণ ওর মাথায় জল ঢালছিল আর যেই জ্ঞান ফিরে আসছিল সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হচ্ছিল মার। কারণ জ্ঞান ফিরলেই ও বলে উঠছিল 'আমি ওকে ভালোবাসি, আমি ওকে ভালোবাসি'। আমি নিচ থেকে এইটুকুই শুনতে পাচ্ছিলাম। ছবি এসে আমায় আরও বলেছিল যে ও নাকি বলছিল, 'ও দোষী নয়, ওর কোন দোষ নেই, তোমরা ওকে কেন শাস্তি দিচ্ছ'?

মৈত্রেয়ী এইরকম কেন ভাবছিল কে জানে। কারণ ওর বাবা, মা এযাবৎ আমার প্রতি কোন কিছুই করেন নি। মিঃ সেন আমায় মারধোর করতে পারতেন। উল্টে তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'good bye Allan'!

—মৈত্রেয়ীকে ঘরে নিয়ে যাবার আগে ও আমায় চুপি চুপি বলেছিল আজ আপনাকে ও টেলিফোন করবে। নিশ্চয় পারেনি? ওকে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আমি ওর মাকে বলতে শুনছিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা ওর বিয়ে দিয়ে দেবেন।

বাচ্চুর কথাগুলো শুনে আমি আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলাম। বাচ্চু আমার অবস্থা লক্ষ্য করে নতুন উদ্যমে বলতে শুরু করলো—হ্যাঁ ওঁরা মৈত্রেয়ীর সঙ্গে এক অধ্যাপকের বিয়ে ঠিক করছেন। মেদিনীপুর থেকে ফিরে এসেই ওদের বিয়ে হবে। আপনি জানেন ওঁরা মেদিনীপুরে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ জানি।

—ওরা পশু। সবাই পশু। আপনার ঘেন্না হয় না?

—কেন ওদের ঘেন্না করবো? আমিই তো অন্যায় করেছি। ও'দের দোষ কোথায়? দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে তা হোল আমায় আশ্রয় দেওয়া।

—ও'রা আপনাকে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন। আপনি জানেন?

আমি মৃদু হেসে ছিলাম। আমার কাছে এগুলো বৃথা অপ্রয়োজনীয় আলোচনা মনে হচ্ছিল। আজ আমি যে পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে গেছি তা যদি না হোত তাহলে আমার সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি নিয়ে ও'রা বোধহয় আমার চেয়েও বেশী চিন্তিত হতেন।

বাচ্চু আমার চোখে জল দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

—আমার মা অত্যন্ত অসুস্থ—আমার কাছে একটা পয়সা নেই—আমি ভাবছিলাম আপনার কাছ থেকে ধার চাইব। বেঙ্গল ফিল্ম কোম্পানীর কাছ থেকে পাওনা টাকা পেয়ে গেলেই···

আমি জানতাম বাচ্চুর মার কোন অসুখ হয়নি এবং তিনি তাঁদের আত্মীয়, কালীঘাটের এক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে যত্নেই আছেন।

—তিরিশ টাকায় তোমার চলবে?

আমি ওর উত্তরের অপেক্ষা না করে একটা চেক লিখে দিলাম। ও ক্ষীণ-কণ্ঠে একটা ধন্যবাদ দিয়ে আবার মৈত্রেয়ী প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো। আমি ওকে নিরুত্তাপ গলায় বললাম—বাচ্চু আমার প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে···

বিকেলে হারোওর কাছে খবর পেয়ে মেয়ের দঙ্গল এসে হাজির হোল। ফয়ারে গ্রামোফোন বাজিয়ে গান শুরু হোল, হুইস্কি, সোডার অর্ডার গেল। আমাকে সান্ত্বনা দেবার পর্বটা বেশ বাড়াবাড়ি রকমের শুরু হোল। হারোও ওদের বলেছিল যে আমি স্নায়বিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং কলকাতা ছাড়ার আগে আমায় সব ভোলাতে হবে। গারতি আমায় বললো—তারপর অ্যালান এখানে একা একা মদ খাচ্ছিস? তোর প্রেমিকাকে কাছে পাচ্ছিসনা বলে দুঃখ হচ্ছে?

ও আমার কোলের ওপর বসে পড়লো। ওর দেহের স্পর্শ আমার এত খারাপ লাগছিল যে ওকে আমি উঠে যেতে অনুরোধ করলাম।

—আমি ক্লান্ত আর অসুস্থ গারতি।

—দেখিস বাবা কোন বাঙালী মেয়ের প্রেমে পড়িসনি তো? জানিস ওরা

খারাপ কাজ করলে কি দিয়ে গা ধোয় ? জানিস ? জানিস না তো, তবে শোন ওরা গোবর দিয়ে গা ধোয়। গোবর মেখে গঙ্গায় স্নান করে।

সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো। মিসেস রিবেরিও পাশের ঘর থেকে ফয়ারে এসে বললেন—ছেলেটাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাওতো…অ্যালান আর একটা হুইস্কি নাও। দেখবে তোমার ভাল লাগবে।…চোখের অপারেশন এমন কিছু ব্যাপার নয়।

—মিসেস রিবেরিও আপনি ভাবছেন অ্যালান চোখের অপারেশনের চিন্তায় কাঁদছে ? খুব ভুল করেছেন…ওর সুন্দরী প্রেমিকা আর একজনের সঙ্গে কেটে পড়েছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে আমি চিৎকার করে বললাম—চুপ কর।

—দয়া করে আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলো অ্যালান। তুমি এখন তোমার আলিপুরের বাড়ীতে নেই। নিগ্রোদের বাড়ীতে…

ক্লারা গারতির হাত ধরে ওকে চুপ করানোর জন্য বললো—ছেড়েদে গারতি। অ্যালানকে একটু শান্তিতে থাকতে দে।

—সব জায়গায় আহারে, বাছারে বলে তোরা সবাই ওকে মাথায় তুলেছিস। মেয়েদের মতো কাঁদছে। ও সান্ত্বনা খুঁজুক বাঙালী মেয়েদের আঁচলের তলায়। আমি একজন খ্রীস্টান…ও কোন সাহসে আমাকে অপমান করে ?

—কিন্তু অ্যলানও তো খ্রীস্টান।

—তোরা বিশ্বাস করিস ও এখনও খ্রীস্টান আছে ? গারতি হাসিতে ফেটে পড়লো। হাসতে হাসতে হারোওর কাছে গিয়ে বসলো।

—তুই কি বলিস হারোও ? মনে পড়ছে ও যখন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য নিয়ে, গরুর মাহাত্ম্য নিয়ে লেকচার মারতো ? এসব মনে পড়ছেনা তোদের—আর এখন আমি চুপ করবো-না ?

হারোও ভীষণ দোটানায় পড়ে গেল। মিসেস রিবেরিও সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি উঠে পড়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম—চললাম। গারতি অদ্ভুত মুখ ভঙ্গী করে বললো—কোথায় ? মন্দিরে পুজো করতে ?

একটা জঘন্য রাত্রী কাটালাম। শুতে যাবার আগে অবধি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। অজস্র সিগারেট খেলাম। বাঙালী মানুষদের চলাফেরা,

কথাবার্তা, দেশী চলতি ভাষায় চিৎকার সবকিছু আমায় মৈত্রেয়ীর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। ভেবেছিলাম ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে বিছানায় পড়লেই ঘুমিয়ে পড়বো। কিন্তু কোথায় ঘুম! বিছানা বালিশ যন্ত্রনায়, কষ্টে দলে-মুচড়ে ফেললাম। একটার পর একটা ঘটনা, একটার পর একটা স্মৃতি আমায় পাগল করে দিচ্ছিল। অমলুক, সাদিয়া, হসপিটাল, আলিপুর, লেক, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মৈত্রেয়ীর চেহারা, মিঃ সেনের কণ্ঠস্বর 'Good bye Allan'; মিসেস সেন—'চা খেয়ে নাও অ্যালান'···আমি কি পাগল হয়ে যাবো!

রাতে অন্ধকারে গীর্জার ঘণ্টার শব্দ রাত্রির বয়স জানিয়ে দিচ্ছিল। পাশের ঘর থেকে হারোওর নিরবিচ্ছিন্ন নাক ডাকার আওয়াজ। আমি মৃত্যুর কথা ভাবলাম। আমি যদি গঙ্গায় ডুবে মরি তাহলে হয়ত মিঃ সেন বুঝতে পারবেন ওনার মেয়েকে আমি সত্যিই ভালোবাসতাম কি না। পরের দিন কাগজে এই খবর দেখে হয়ত মৈত্রেয়ী অজ্ঞান হয়ে যেতো। মিসেস সেনের অনুশোচনা আসতো। মিঃসেনও হয়ত বুঝতেন আমি মনে প্রাণে মৈত্রেয়ীকে ভালোবাসতাম। মৃত্যু এবং মৃত্যুর পূর্ববর্তী প্রস্তুতি পর্বের চিন্তা করতে করতে আমি ভোরের দিকে একটু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম এমন সময় হারোও এসে বললো আমার ফোন এসেছে।

আমি পাগলের মতো দৌড়লাম। টেলিফোন তুলেই আমি মৈত্রেয়ীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ওর গলার আওয়াজ আমার কাছে ছিল তৃষ্ণায় কাতর চাতক পাখির কাছে বৃষ্টির জলের মতো। ওর কথার জবাব দিতে পারছিলাম না পাছে হারোও শুনতে পায় এই ভেবে। খাপছাড়া ভাবে ও কথা বলছিল। এত আস্তে কথা বলছিল আমি সব কথা স্পষ্ট শুনতেও পাচ্ছিলাম না। নিশ্চই বাড়ীর অন্য কেউ যাতে না শুনতে পায় সেই জন্য ও অত নিচু স্বরে কথা বলছিল। ওর কণ্ঠস্বরে এক আকুতি ছিল যার সঙ্গে খাঁচায় বন্ধ পাখীর আর্ত রবেরই তুলনা করা চলে।

—অ্যালান, তুমি আমায় চিনতে পারছো? আমি, আমিই বলছি। আমি একই রকম আছি অ্যালান। যাই ঘটুক···মানুষের মতো মানুষ হও অ্যালান। কাজ করে যাও। হতাশ হয়োনা। আমি আর পারছিনা···অ্যালান আমায় ক্ষমা কোর। আমি আর পারছিনা···। শোন, তোমায় একটা কথা বলি···

হঠাৎই ও চুপ করে গেল। কেউ নিশ্চই ওকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে।

আমি বৃথাই চেঁচাচ্ছিলাম—মৈত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী। হ্যালো, হ্যালো। কেউ আর সাড়া দিলনা।

ঘরে ফিরে আছড়ে পড়লাম বিছানায়। দেওয়ালগুলো যেন ক্রমশ সরে এসে আমায় চেপেট দিচ্ছিল। আমার ঘরের এক কোণে পড়ে থাকা আলিপুরের বাড়ীর আরাম কেদারা আমায় ব্যঙ্গ করছিল। ওই চেয়ারে কতবার মৈত্রেয়ী বসেছে। প্রত্যেকটা আসবাব আমাকে ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতির কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। কিছুতেই সেই সব ভাবনার হাত থেকে মুক্ত পাচ্ছিলাম না যেগুলো রাতারাতি আমায় মানুষ থেকে ছেঁড়া কাগজে পরিণত করে ছিল।

হারোও এসে জিজ্ঞাসা করলো—মিঃ সেন কেমন আছেন? অপারেশন হয়ে গেছে?

আমি কিছু না ভেবেই উত্তর দিলাম—না হয়নি। আজই বোধ হয় হবে।

বিছানায় বসে বসে আবার সিগারেট ধরালাম। মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছে শুধু হাত দুটো ছাড়া যে দুটো ক্রমাগত কেঁপেই চলে ছিল। বেলা দশটা বেজে গেল এইভাবে। এমন সময় একটি লোক সাইকেলে করে এসে আমায় একটা চিঠি দিল। লোকটি আমার কোন কথার জন্য অপেক্ষা না করেই সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। চিঠি খুললাম, নরেন্দ্র সেনের চিঠি।

মহাশয়,

আমি বুঝতে পারছি আপনার আত্মসম্মান বোধ বলতে কিছু নেই। আপনার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে ঘাসের মধ্যে চরে বেড়ান সাপের মতো। ঠিক সময় যার মাথাটা থেঁতলে না দিলেই যে প্রথম সুযোগেই ছোবল মারবে। এখনও চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়নি, আপনি ভদ্রলোকের মতো কথা দিয়েছিলেন যে আমার বাড়ীর কারো সাথে, কোনরকম যোগাযোগের চেষ্টা আপনি করবেন না। আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং অকারণ একটি শিশুকে কষ্ট দিচ্ছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ইতিমধ্যেই আপনি তার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেয়েছেন। পুনরায় যদি আপনি এই রকম প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনাকে যথাশীঘ্র সম্ভব দেশে পাঠানোর চেষ্টা আমি করবো। আমি ভেবেছিলাম আপনার যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞান আছে এবং আপনি এই শহর ত্যাগ করেছেন। আমি টেলিফোনেই আদেশ দিয়েছি যাতে আপনার আজ থেকেই চাকরীর পরিসমাপ্তি ঘটে। সুতরাং আপনার পক্ষে যেটুকু করণীয় পড়ে আছে তা হোল আপনার প্রাপ্য মাহিনা বুঝে নেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে শহর ছেড়ে যাওয়া

শুরু করা। আপনার অকৃতজ্ঞতার একটা সীমা থাকা উচিৎ।

নরেন্দ্র সেন

এই চিঠি পড়ার পর আমার বোধ শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেল। চাকরীর কথা নয়; আমি নিজেই ঠিক করেছিলাম পদত্যাগ করবো। নরেন্দ্র সেনের সঙ্গে কথা বলা, অফিসে দেখা হওয়া ইত্যাদি আর সম্ভব ছিল না। বুঝতে পারছিলাম মৈত্রেয়ী এই ধরণের অসাবধানী কাজ করতেই থাকবে এবং তার ওপর অত্যাচার চলতে থাকবে ক্রমশঃ বেশী মাত্রায়। আর আমি কোনভাবেই ওকে সাহায্য করতে পারবো না। আমি খামটা মুড়ে পকেটে নিয়ে শুধু আমার হেলমেটটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মিসেস রিবেরিও জিজ্ঞাসা করলেন—লাঞ্চে আসবেন তো?

—নিশ্চই।

—আপনার প্রিয় খাবার বানাচ্ছি। হ্যারোওই বললো আপনি কি কি খেতে ভালোবাসেন। দেখবেন ভালো লাগবেই...

মৃদু হেসে আমি বেরিয়ে এলাম। কোথায় যাবো, কি করবো কিছুই ঠিক নেই। সত্যই যদি কলকাতা ছাড়তে হয় তার জন্য কিছু টাকা ব্যাংক থেকে তোলার দরকার ছিল। আমি নিশ্চই মিঃ সেনের হুকুম মতো চলবো না। আমি চলে যাবো তার একটাই কারণ এছাড়া মৈত্রেয়ীকে বাঁচাবার আর কোন রাস্তা আমার জানা ছিল না। রয়েড স্ট্রীট থেকে ক্লাইভ স্ট্রীটের দূরত্ব যথেষ্টই ছিল তবুও আমি হেঁটেই ব্যাংকে এলাম।

টাকার নোটগুলো সব একটা প্যাকেটে করে ফোলিও ব্যাগে নিলাম আর খুচরো পয়সাগুলো পকেটে রাখলাম। হাওড়া স্টেশনের দিকে এগোলাম। হাওড়া ব্রীজের ওপর থেকে দেখলাম অসংখ্য নৌকা, গঙ্গার নোংরা জল। হঠাৎই মনে হোল আত্মহত্যা কাপুরুষতা। স্টেশনের স্টল থেকে একটা লেমনেড খেলাম। তখন ভর দুপুর। স্টেশনের ডান দিকের রাস্তা ধরলাম। এই রাস্তা আমি জানতাম বেলুড়ের দিকে গেছে। রাস্তায় গাছের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে আমার নিজেকে অনেকখানি ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল। স্টেশনে থেকে হুগলী অবধি যে মোটরগুলো ভাড়া খাটতো তারা আমাকে পেছনে ফেলে হুস হুস করে চলে যাচ্ছিল। কখনো কখনো কোন গাড়ী আমার কাছে এসে থেমেও পড়ছিল। ড্রাইভাররা বোধ হয় অবাক হয়ে যাচ্ছিল শহরের বাইরে কোন ইওরোপীয়ানকে পায়ে হেঁটে একা একা যেতে দেখে। একটা ঝুপড়ি মতো

দোকানে একবার থামলাম। এক বৃদ্ধা লেমনেড, পাউরুটি ইত্যাদি বিক্রি করছিল। আমি একটা ঠাণ্ডা পানীয় খেতে খেতে দরিদ্র বৃদ্ধার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছিলাম। আমি মৈত্রেয়ীর প্রিয় শব্দগুলো ব্যবহার করছিলাম। আর সেগুলো উচ্চারণের সময় আমার এক অদ্ভুত তৃপ্তি হচ্ছিল।

'প্রায় আড়াইটায় আমি বেলুড়ে পেঁছিলাম। পথে বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছিলাম। জামা কাপড়ে কাদা লেগে বিভৎস মূর্তি হয়েছিল। স্বামী মাধবানন্দ আমার উদভ্রান্তের মতো চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় সেই যখন মৈত্রেয়ীদের গাড়ীতে করে এখানে প্রথম এসেছিলাম তখন থেকে। গঙ্গার ধারে গিয়ে জামা কাপড় শুখিয়ে নিলাম। ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে চোখে সোজা রোদ্র নিয়ে আমার মনে পড়তে লাগলো মৈত্রেয়ীর সঙ্গে এখানে বেড়াবার নানান স্মৃতি। পকেট থেকে ডায়েরি বের করে লিখতে শুরু করলাম শুধু নিজেরই জন্য। আবার সেই পুরনো টীকাগুলো পড়লাম যেগুলোকে মনে হচ্ছিল আপন রক্তে লেখা। এক জায়গায় লেখা ছিল 'সব শেষ হোল। কেন? আমার মনের মধ্যে বিশাল মরুভূমি'। মঠ থেকে ভেসে আসছিল এক প্রার্থনা সংগীত। সেই সংগীতের সুরে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।...মৈত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী, তোমায় আর কোন দিন দেখতে পাব না।'

আমার কি হয়েছে স্বামীজী জানতে চাইলেন। তিনি যখন শুনলেন যে আমি কলকাতা থেকে হেঁটে এসেছি এবং সারাদিন কিছুই খাইনি তিনি তখনই আমায় ফিরে যেতে আদেশ করলেন। তিনি বললেন আমার আবার ম্যালেরিয়া হতে পারে। তিনি জানতেন আগের বছর আমার ম্যালেরিয়ায় কি অবস্থা হয়েছিল। তাঁর কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনা ছিল। তিনি কি আমার এই অন্ধ আবেগের কাছে আত্মসমর্পণকে ঘৃণা করছিলেন? জাগতিক যন্ত্রণার যারা দাস তারা এই হিন্দু সাধুদের সহানুভূতি পাবার অনুপযুক্ত। ওনাদের জাগতিক মোহমুক্তির আদর্শ ওনাদের বাস্তবের রূঢ়তার থেকে অনেক উর্ধে স্থাপন করেছে। ওনাদের অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিকতা ওনাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে জগৎ ও জীবন থেকে। আমি বেলুড় মঠে কোন সান্ত্বনা খুঁজতে যাইনি, গিয়েছিলাম আমার স্মৃতির মৈত্রেয়ীকে, প্রকৃত মৈত্রেয়ীর অস্তিত্ব অনুভব করতে।

স্বামীজীর কথায় আমি একটুও ক্ষুব্ধ হইনি বরং আমি আরও সত্যি করে জানতে পারলাম আমার নিঃসঙ্গতাকে। যেসব ফল, মিষ্টান্ন উনি আমার জন্য আনিয়ে ছিলেন সেগুলোর জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আমি আবার যাত্রা শুরু করলাম।

কিন্তু আমি কলকাতার রাস্তা ধরলাম না। এগিয়ে চললাম রাণাঘাটের দিকে। সন্ধ্যা হয়ে এল। গঙ্গার ধারে একটা পাথরের ওপর বসে সিগারেট ধরিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গঙ্গার জল দেখতে লাগলাম। নিস্তরঙ্গ সেই জল অবিশ্রান্ত বয়ে চলেছে কলকাতার দিকে। কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে ততক্ষণে আমাকে ঘিরে ধরেছে। প্রথমে তারা আমাকে দেখে কুকুরের ডাক ডাকছিল তারপর অশুদ্ধ ইংরাজীতে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে চিৎকার করছিল, 'white monkey', 'white monkey', কিন্তু যখন ওরা দেখল যে আমি রাগ করছিনা, তারা আমার দিকে এগিয়ে এল। ওরা হয়তো লক্ষ্য করেছিল আমার চোখের জল, আমার চিন্তান্বিত বিষণ্ণ মুখ। ওরা একটু ইতঃস্তত করে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি ওদের সঙ্গে বাংলায় কথা বললাম এবং ওদের মধ্যে কিছু খুচরো পয়সা বিতরণ করলাম। ওরা আনন্দে হইহই করে প্রায় একটা শোভাযাত্রা করে আমায় গ্রামের প্রান্ত অবধি পেঁৗছে দিল। দুপুরে বৃষ্টির ফলে সন্ধ্যা ছিল নির্মল কিন্তু ভারী আর বিষণ্ণ। আমার হাঁটতে ভাল লাগছিল। বড় রাস্তায় আমি একা। মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ী হেডলাইট জ্বালিয়ে আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। গাড়ীগুলো যাচ্ছিল কলকাতার দিকে। কদাচিৎ দুএকজন পথচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছিল। ভাবছিলাম ভারতের লোকেরা কি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। সেই নির্জন রাস্তায়, সন্ধ্যা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমার আলিপুরের সন্ধ্যাগুলোর কথা মনে পড়ছিল। গলার কাছে ব্যথা করে উঠল। ঢোঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছিল। দূরে একটা দোকানের আলো দেখা যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি পা চালালাম। দোকান থেকে এক প্যাকেট সিজারস্ সিগারেট কিনলাম, কারণ একমাত্র সিজারস্‌ই সেখানে পাওয়া যায়। দোকানের ভেতরে একটা গ্যাসের আলো জ্বলছিল আর কয়েকজন পথিক হুঁকো খেতে খেতে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

জানিনা রাত কটা অবধি আমি হেঁটেছিলাম আর যে গ্রামগুলো পার হয়েছিলাম তাদের নামই বা কি ছিল। অন্ধকারে আমি হেঁটে চলেছিলাম এক অন্ধ মোহের বশে। এইভাবে আমি আমার চিন্তাগুলো থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হতে পারছিলাম। মনে হচ্ছিল মৈত্রেয়ীর প্রতি ভালোবাসাই ওই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা যোগাচ্ছিল। রাস্তার ধারে মাথায় ছাউনিওয়ালা একটা জলের কল ছিল। আমি একটু জল খাবার জন্য সেখানে থেমেছিলাম, কিন্তু চওড়া বাঁধানো বেদীতে বসা মাত্রই জগতের সমস্ত ক্লান্তি আমাকে আক্রমণ করলো। নিজের অজান্তেই আমি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম মাথার তলায় টুপিটাকে বালিশ করে। কখন যে ঘুমিয়ে

পড়েছিলাম জানিনা। মৈত্রেয়ীর স্বপ্নে ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। লোকালয় থেকে বহু দূরে নির্জন জায়গা; প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমি কাঁপছিলাম। আবার কখন যে আমি শুয়ে পড়েছি জানিনা কয়েকজন লোকের জল তোলার আওয়াজে ঘুম ভাঙলো। আমাকে অবাক দৃষ্টিতে সবাই দেখছিল, কিন্তু কেউই আমায় কিছু প্রশ্ন করতে সাহস করলো না। যদিও আমার জামাকাপড় ছিল কর্দমাক্ত, জুতো ছিল ছেঁড়া তবু তো আমি 'সাহেব'!

জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিলাম। একটু ভালো লাগছিল। আবার চলা শুরু করলাম। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোক চলাচল শুরু করলো। আমি মাথা নিচু করে হেঁটে চলে ছিলাম। তালগাছের শ্রেণীর মধ্য দিয়ে গঙ্গা দেখা যাচ্ছিল। শুধু ওই নদীটিকে দেখার জন্যই আমি মাঝে মাঝে থামছিলাম। বহমান নদীর দৃশ্য আমাকে এক অবর্ণনীয় সান্ত্বনা দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই জল চলেছে মৈত্রেয়ীর শহরে, মৈত্রেয়ীর কাছে। আমার নিজের শারীরিক কষ্ট সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম না। এতটুকু দুর্ভাবনা ছিল না মিসেস রিবেরিও বা হ্যারোও কি ভাববে, চিন্তা করবে সে সম্পর্কে। শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল বাচ্চু নিশ্চই আমার খোঁজ নিতে এসে জানবে যে আমি সকালে বেরিয়ে আর ফিরিনি, একটা দিন পার হয়ে গেছে। ও নিশ্চই মিঃ সেনকে জানাবে। মিঃ সেন আমার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার অন্তত ভাববেন আমার সঙ্গে কি ব্যবহার উনি করেছেন।

রাণাঘাটের কাছে রাস্তার ধারে একটা পান্থশালায় আমি কিছু খেয়ে নিলাম। খাদ্যের মধ্যে ছিল ভাত, তরকারী, মাছের ঝোল। উপস্থিত ক্রেতাদের আশ্চর্য করে দিয়ে আমি মাটিতে বসে হাত দিয়ে ভাত মেখে খেলাম। ইতিমধ্যে তারা আমায় বাংলায় কথা বলতেও দেখেছে। আমার পোশাক নোংরা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুলে চিরুনি পড়েনি তবুও আমি তো শ্বেতকায়! খাওয়া সেরে আমি আবার পথে নামলাম। সন্ধ্যা অবধি হেঁটে চললাম। দিনটা ছিল সূর্যের কিরণে উত্তপ্ত। প্রতিটি জলের কলের কাছে আমাকে থামতে হচ্ছিল জল খাবার জন্য আর মুখে চোখে জল দেবার জন্য। আকাশে তারা ফুটতে শুরু করলো। হাঁটতে হাঁটতে আমি একটা এঁদো পুকুরের ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম গাছের বাগানের ধারে এসে পড়লাম। আর পারছিলাম না। আম গাছের তলায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড মশার কামড় উপেক্ষা করার শক্তি দিল আমার শ্রান্তি।

পরদিন বেশ বেলায় আমার ঘুম ভাঙলো। হাত পা সব মনে হোল অবশ হয়ে গেছে। তবু আবার রাস্তায় নামলাম। সারা দিন ধরে আবার হাঁটা শুরু হোল। ক্রমশঃ মস্তিস্ক জড় হয়ে গেল। বিশেষ কিছু আর মনে করতে পারছিনা। শুধু মনে পড়ছে যে আমি একটা গরুর গাড়ীর চালককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি কোথায় এসে পড়েছি, জায়গাটার কি নাম আর কি করে রেল স্টেশনের দিকে যেতে পারবো। লোকটি আমায় বর্ধমানের কাছে একটা ছুট স্টেশনে নিয়ে গিয়েছিল। তখন বেশ রাত। কলকাতা যাবার প্রথম ট্রেন আসে ভোরবেলা এবং এখানে থামেও না। প্রায় মাঝরাত্রে একটা লোকাল ট্রেন বর্ধমান যায়। আমি একটা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটলাম।

বর্ধমান স্টেশনের তীব্র আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বহুক্ষণ অন্ধকারে থাকার ফলে হয়ত ওইরকম হয়ে ছিল। বহুকাল রোগে ভোগা রুগীর মতো দারুণ কোলাহলের মধ্যে আমি জেগে উঠলাম। এইবার আমি একটা ইণ্টার ক্লাসের কাউণ্টার খুঁজছিলাম। আসলে আমার লজ্জা করছিল কয়েকজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইংরাজদের দেখে যারা লক্ষ্ণৌ মেল ধরবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

শীতে জড়সড় হয়ে আমি শুধু চায়ের পর চা খেয়ে যাচ্ছিলাম এবং চেষ্টা করছিলাম গত বাহাত্তর ঘণ্টার ঘটনাগুলোকে পর পর মনে করতে। কিছুতেই সব পর পর সাজাতে পারছিলাম না বড় বড় ফাঁক দেখা দিচ্ছিল। আমার স্মৃতি ঠিক কাজ করছিল না। ওই শূণ্যস্থান গুলো পূরণ করার জন্য আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম! ঠিক করলাম আর কিছু ভাববো না। সব কিছুই চলে যাবে, যেমনটি চন্দ্রার। এই সান্ত্বনা বাক্যটা পরবর্তীকালে সারা জীবন মনে রেখেছিলাম।

হাওড়া স্টেশনে নেমে প্রচণ্ড ভয় হতে লাগল। ভয় হচ্ছিল আলিপুরের কারোর সঙ্গে না দেখা হয়ে যায়। হঠাৎই মনে পড়ে গেল মিঃ সেনের পরিবারের সবারই এখন মেদিনীপুরে থাকার কথা। অন্য সময় হলে এই ঘটনা, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার দূরত্ব বাড়ার জন্য হয়ত যন্ত্রণা দিত, কিন্তু আজ আশীর্বাদ বলে মনে হ'ল।

যে সময় আমি আমার গাড়ী থেকে বাড়ীর সামনে নামলাম, তখন পার্ক স্ট্রীটের পুলিশ অফিসার আমার নিখোঁজ হওয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেছেন। আমার ওই প্রায় পাগলের মত মূর্তি দেখে মিসেস রিবেরিও

অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন।

—হায় ভগবান কোথা থেকে আসছেন? এ কি চেহারা আপনার! south 1147 আপনাকে অনবরত টেলিফোনে ডাকছে, আর সেই ছেলেটি, যাকে আপনি বাচ্চু বলে ডাকেন, সে কতবার আপনার খোঁজ করতে এল।

মিসেস রিবেরিওকে ছেড়ে আমি মুখ হাত পা ধুতে চলে গেলাম। একটা স্নান, সেই সময় আমার একমাত্র চাহিদা ছিল। হারোও অফিস থেকে টেলিফোন করে মিসেস রিবেরিওর কাছে আমার খোঁজ নিচ্ছিল। আমি ফিরেছি শুনে সে তৎক্ষণাৎ একটি ট্যাক্সি নিয়ে আমাদের বোর্ডিং হাউসে এসে উপস্থিত হোল।

—কোথায় ছিলি? কি করছিলি? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়। এত চিন্তা করছিস কেন তোরা। মৃদু হেসে আমি জবাব দিয়েছিলাম।

—তুই? তুই কেমন আছিস?

—গতকাল মেয়েরা সবাই এসেছিল। সবাই দারুণ চিন্তিত। আমাদের ইচ্ছে পৌত্তলিকদের হাত থেকে তোকে মুক্ত করা উপলক্ষ্যে চায়না টাউনে একটা পার্টির ব্যবস্থা করবো—কিন্তু কী হোল! ও হ্যাঁ ওই "নিগ্রো" ছেলেটি আবার এসেছিলো তোর খোঁজ নিতে। মনে হোল একটু রেগে গেছে···আমায় বিরক্ত করছিল, আমি দূর করে দিয়েছি।

ঠিক দুপুরের খাওয়ার পর আশুতোষ মুখার্জী রোডের একটা লাইব্রেরী থেকে বাচ্চু আমায় ফোন করলো। জানলাম ইতিমধ্যে অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটে গেছে। অতি অবশ্যই সে আমার সঙ্গে এক্ষুণি দেখা করতে চায়। আমি ওকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসতে বলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

—আপনি কোথায় ছিলেন?

—পরে সব বলব। আগে বল ওখানে কি হয়েছে······

বাস্তবিকই অনেক কিছু ঘটে গেছে। মৈত্রেয়ীর বিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু সে নাকি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, সে ফুলশয্যার রাত্তিরে তার স্বামীর কাছে স্বীকার করবে আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের সমস্ত কথা। সমগ্র পরিবারের সম্মানে এটা যথেষ্টই আঘাত দেবে। তার স্বামী নিশ্চয়ই তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে এবং গোটা শহরে কেচ্ছা রটবে। এই কথা

শোনামাত্র মিঃ সেন সজোরে একটি ঘ‍ুঁষি মারেন এবং ও মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর একটানা লাথি মেরে যেতে থাকেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর স্ট্রোক হয় এবং মিঃ সেনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন তিনি চোখে কিছ‍ুই দেখতে পাচ্ছেন না। যদি রক্তচাপ দ‍ু একদিনের মধ্যে কমে তাহলে তার চোখে অপারেশন হবে। কিন্ত‍ু তাঁর অবস্থা নিয়ে চিকিৎসকগণ দ‍ুশ্চিন্তিত। এদিকে মৈত্রেয়ীকে তার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। ঘরে বন্ধ করার আগে মিসেস সেন ড্রাইভারকে ডেকে এনে, ড্রাইভারকে দিয়ে তাঁর সামনে মেয়েকে বেত মারার আদেশ দেন। ড্রাইভার একটানা বেত মেরে গিয়েছিলো যতক্ষণ না মৈত্রেয়ী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। মিসেস সেন বাচ্চ‍ুকেও বলেছিলেন মৈত্রেয়ীকে চাব‍ুক মারতে, কিন্ত‍ু সে তা অস্বীকার করে এবং সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ছ‍ুবি ঘ‍ুমের ওষ‍ুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, ফলতঃ সেও এখন হাসপাতালে।

মৈত্রেয়ী বাচ্চ‍ুর হাতে আমাকে একটা খাম পাঠিয়ে দিল। গোলাপী খামটার ভেতরে জলপাই গাছের একটা ম‍ুকুল সমেত দ‍ুটো পাতা তার প‍ুরে দেওয়ার সময় হয়েছিল। আর একটি ছোট্ট কাগজে পেনসিল দিয়ে লেখা ছিল, "অ্যালেন এই আমার শেষ উপহার।"

আমি একটা ঘোরের মধ্যে বাচ্চ‍ুর কথাগ‍ুলো শ‍ুনে গেলাম। পরিস্থিতির গ‍ুর‍ুত্ব এবং তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বোঝবার চেষ্টা করছিলাম। বাচ্চ‍ু মৈত্রেয়ীকে কিছ‍ু লিখে দেওয়ার জন্য অন‍ুরোধ করলো। আমার নরেন্দ্র সেনের কাছে প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়লো। আমি বললাম—কী প্রয়োজন? আর কী দরকার আছে? আরও কি কি যেন সব বলেছিলাম…

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে আমি ভুল বকছি। আমার চারদিকে সব কিছ‍ু ঘ‍ুরছে।

আমি যদি পারতাম! যদি আমি পারতাম! আমি, আমি কি ওকে ভালবাসি? বাচ্চ‍ু বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি চীৎকার করে বললাম—আমি ভালবাসতে চাই। তার আগে ওকে ভালবাসার উপয‍ুক্ত হতে চাই আমি। মিসেস রিবেরিও দৌড়ে এলেন। হতভম্ব হয়ে আমার কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

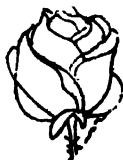
—আমি মৈত্রেয়ীকে ভালবাসতে চাই। আমি ওদের কী করেছি? আমার বির‍ুদ্ধে ওদের কী বলার আছে? আমার বির‍ুদ্ধে আপনাদের সকলের কী বলার আছে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেদিন সকালে টেলিফোনে মৈত্রেয়ীর কথাগুলো—"চিরবিদায় অ্যালেন, চিরবিদায় প্রিয়তম। অন্য জীবনে আমরা নিশ্চয়ই ফিরে পাব আমাদের ভালবাসা। দুজনে দুজনকে নিজের করে পাব। তখন তুমি আমায় চিনতে পারবে তো? আমার জন্য অপেক্ষা করবে তো? আমায় ভুলো না অ্যালেন। আমি তোমার জন্য কিন্তু অপেক্ষা করবো।'

আমি ওকে কিছুই উত্তর দিতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম—মৈত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী, আমার মৈত্রেয়ী…

আমাদের বিচ্ছেদের সপ্তম দিনে আমি চলে গেলাম। চলে যাবার আগের দুই রাত্রি আমি কাটিয়েছিলাম মিঃ সেনের বাড়ীর সামনের রাস্তায়। সারাক্ষণ আমি চেয়েছিলাম মৈত্রেয়ীর শোবার ঘরের জানালার দিকে। জানালা অন্ধকার। একবারের জন্যেও আলো জ্বলেনি।

আমার যাত্রার দিন ছবি মারা গেল।



কয়েক মাস হিমালয়ের কোলে, রাণীক্ষেত আর আলমোড়ার মাঝামাঝি এক বাংলোয় কাটালাম। হতাশা, উৎসাহহীনতা আর বুক-চাপা স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল সময়।

দীর্ঘদিন দিল্লী, সিমলা, নৈনিতাল ঘুরে চারপাশে কেবল লোকজনের, বিশেষ করে সাদা মানুষের ভীড়ে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে এসেছিলাম। আমার আজকাল লোক সমাগমকে বড় ভয় করে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, ওরা অভিবাদন জানালে প্রত্যুত্তর দিতে প্রবৃত্তি হয় না, বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে একদম ভাল লাগে না। আমার এখন চাই বিশ্রাম, কেবল বিশ্রাম। ওরা আমার সেই বিশ্রামের বাধা বিশেষ। নির্জনতাই এখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা, আমার বাঁচবার একমাত্র উপায়।

আমার মনে হয়, একাকীত্বের কি জ্বালা, তা কত হতাশাব্যঞ্জক এবং তিক্ত হতে পারে, তা খুব কম লোকই আমার মত করে উপলব্ধি করতে পেরেছে। মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচমাস আমি কেবলমাত্র একটি লোকেরই মুখ দেখেছি, সে হোল এই বাংলোর পরিচারক। আর কেউ আমার ঘরে আসত না। ওর সঙ্গেও আমি খুব কমই কথা বলতাম, যখন ও আমার খাবার নিয়ে আসত বা জল ভরে রেখে যেত। আমি আমার সমস্ত সময় অরণ্যে কাটাতাম। আলমোড়া অঞ্চলে হিমালয়ের পাইনের এক বিখ্যাত বন আছে। আমি সেই বনে ঘুরে বেড়াতাম। এমাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত আমার ভালবাসার জনকে নিয়ে নানা কল্পনায় মশগুল থাকতাম। সে সব কত অলীক স্বপ্ন, কল্পনা,—মৈত্রেয়ী আর আমি, যেন কত সুখে, কত আনন্দে এই বনের নির্জনতাকে সাক্ষী রেখে একাত্ম হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কখনো বা ফতেপুর সিক্রির মৃতপুরীতে, কখনো বা জঙ্গলের এক পরিত্যক্ত কুটিরে, শুধু সে আর আমি।

সারাদিন, সারারাত, দিনের পর দিন আমি আমাদের দুজনকে ঘিরে কত স্বপ্ন, কত ছায়াময় চিত্রকল্প—সারা পৃথিবীর থেকে দূরে, একান্ত একান্তে একাত্ম হয়ে থাকার কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকতাম। বিগত দিনের কত ভুলে যাওয়া স্মৃতি, কত ছোট ছোট তুচ্ছ অথচ মধুময় ঘটনা আবার জীবন্ত হয়ে উঠত আমার অন্তরে। কত গভীর, কত নিবিড়, কত ললিত গীতিময় সে সব [illegible] সব তুচ্ছ জিনিষকে আগে কখনো কোন মূল্যই দিই নি।

সে গুলো এখন আমার অন্তর্দৃষ্টিতে জ্বলজ্বলে ভাস্বর হয়ে উঠছিল। আমি যেন মৈত্রেয়ীকে ভেঙে ভেঙে গড়ছিলাম, সেই পাইন- চেস্টনাটের ছায়ায় আমার, পাহাড়ে, জঙ্গলের পথে পথে। আমি আমার সেই অপূর্ব ভাবনার অন্তরংগতায় এমন আপ্লুত আবিষ্ট হয়ে থাকতাম, যে মাঝে মাঝে আমার ভয় হত, এই স্বপ্ন যদি ভেঙে যায়, আমি আমার এই যন্ত্রণাবিশিষ্ট শারীরসত্বা নিয়ে বাঁচব কি করে। আমি জানতাম, এবং নিশ্চিন্তই ছিলাম যে, মৈত্রেয়ীও তার আলিপুরের ছোট্ট ঘরে বসে বসে আমারই মত গভীর চিন্তায় মগ্ন, আমাদের চাওয়া-পাওয়া, আমাদের মিলন, কিংবা আমাদের বিচ্ছেদ অথবা মৃত্যু!

কোন কোন শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় আমি বনের পথে বেরিয়ে পড়তাম, হয়ত একটা টিলার ওপর উঠে দূরে কোন অঝোরে নেমে আসা ঝর্ণার শুভ্র নির্ঝর দেখে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠতাম—"মৈত্রেয়ী মৈত্রেয়ী" যতক্ষণ না আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি—আমি আমারই শব্দের প্রতিধ্বনি পাহাড়ে, পাহাড়ে ধ্বনিত হতে শুনতে পেতাম। যেন এক স্বপ্নের পথ ধরে, অবর্ণনীয় সুখ আর প্রশান্তি বুকে নিয়ে বাংলোয় ফিরে আসতাম; মনে হোত, মৈত্রেয়ী নিশ্চয়ই আমার ডাক শুনতে পেয়েছে, ঐ আকাশের মধ্য দিয়ে বাতাস ও ঝর্ণার ধারায় ভেসে ভেসে আমার প্রাণের আর্তি নিশ্চয়ই তার কানে গিয়ে পোঁছেছে।

আমি জানি না, মানুষের মনের কোন পর্যায়কে তার সঠিক আত্মসত্বা বলা যায়; এই দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে সম্পূর্ণ নির্জনতার সমুদ্রে অবগাহন করতে করতে আত্মসত্বা বলতে, বোধহয়, আমার একটা অনাত্ব ধারণা জন্মাচ্ছে। বেশ কিছুদিন হল, যেন মৃত্যু আর আমি পরম বন্ধুতে পরিণত হয়েছি,—যেন প্রচণ্ড আশাবাদী দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করে চলেছি, সে তো আমার কাছেই রয়েছে, বন্ধুর ইচ্ছেই আমারও চরম ইচ্ছে,—তাড়াহুড়োর কিছু নেই, বেশ ইওরোপীয়ান টেক্‌নিকের প্রেম, ভালোবাসার প্যারোনিয়ারিজম্‌—যেন মৃত্যুই আমাকে উদ্ধার করার জন্য বুক চিতিয়ে বীরদর্পে হাজির হয়ে রয়েছে আমার পাশে, যেমন করে ইওরোপীয়ানরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা রেখেই মনে করেছে, এই পোড়া দেশের জন্যে ওরাই সভ্যতাকে মাথায় করে নিয়ে এল। আমার এখন সব কিছুই বৃথা, নিরর্থক বলে মনে হয়—সবই অলীক, সবই মায়ার ভ্রম মাত্র। সব কিছুই। কেবল আমার সেই কয়েকমাস ছাওয়া নিরন্তর প্রেম, তার সুখস্মৃতি আর আজকের আমার এই যন্ত্রণার দুর্দশার অনুভূতিটা ছাড়া। আমার এই যে আত্ম-অনুশোচনার অনুভূতি, এটা শুধু মৈত্রেয়ীকে হারানোর

জন্যেই নয়, আমি আমার আশ্রয়দাতা গুরুর প্রতি যে অন্যায় ও পাপ করেছি, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদা অতুলনীয়া মায়ের প্রতি, ছোট ছবির জীবনের প্রতি, সেই ছোট্ট মেয়েটা, যাকে আমি চরম বিপদের মধ্যে ফেলে এসেছিলাম, সে সবের জন্যেও আমার এই মানসিক যন্ত্রণা। এই সমস্ত দুশ্চিন্তা আমার বুকের ভেতর চেপে বসে যেন আমার শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। এখন নিজেকে ঘুম পাড়ানোর জন্য আমার বোধ হয় ঘুম-পাড়ানী মাদকের দরকার, যাতে না স্বপ্ন, না কোন জ্ঞান, না মৃত্যু, না পাপ, না বিচ্ছেদ—কিছুই উপলব্ধি করতে পারি।

আমার ডায়েরির পাতা নিত্য বেড়েই চলেছে, কিন্তু ২৩শে অক্টোবর তারিখটায় পেঁছিতে আমার বড় ভয়, অস্বস্তি। সত্যি কথা বলতে কি ঐ তারিখটা আমার জীবন থেকে যেন মুছে গেছে। একটা বড় খামে আমি কিছু জিনিস সীল করে রেখেছিলাম—মৈত্রেয়ীর কয়েকটা চিঠি, ইঞ্জিনিয়ারের চিঠি, ছবির চিঠি, একটা শুকনো গোলাপফুল, একটা চুলের কাঁটা, মৈত্রেয়ীর কিছু হিজিবিজি কাটা কাগজ, বেশির ভাগই ফ্রেঞ্চ গ্রামারের নোট লেখা,—এক কথায়, আমার প্রিয়তমার সঙ্গে নিবিড়তম অধ্যায়ের কিছু চিহ্ন। (আমি আজকাল মাঝে মাঝেই খামটা খুলে সেগুলো দেখি আর সেই জীবনকাহিনীর শেষ অধ্যায়টা লক্ষ্য করি। এই মধুময় স্মৃতিটুকুর কথা কি আমি লিখে বোঝাতে পারব!)

আমার ডায়েরিতে আমি লিখে রেখেছি, আমার অকপট সরলতা, পক্ষপাত-শূন্যতা এবং সেণ্টিমেণ্টাল অহমিকার জন্য আমি কি ভাবে, কত পর্যায়ে দীর্ঘ দিন ধরে ঠকে আসছি। বাংলোয় থাকা কালে আমি কোন চিঠি পেতাম না, ফলে কাউকে চিঠি দেবার দায়ও ছিল না। বাংলোর পরিচারক মাসে একবার, বড়জোর দুবার নৈনিতাল সহরে যেত জিনিসপত্র সওদা করতে এবং এই বন-বাদাড়ে একেবারেই মেলে না এমন বস্তু কিনে আনতে। তখন আমি মাঝে মাঝে দু-এক লাইনের চিঠি দিতাম ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে, বা কখনো হ্যারোওকে টেলিগ্রাম করে জানাতাম যে আমি এখনো বেঁচে আছি।

খৃষ্টমাস নাগাদ আমার কাছে হঠাৎ একটা 'সারপ্রাইজ' এল, তাতে আমি বুঝতে পারলাম এখনো কি ভাবে আমার খোঁজ খবর চলছে, এবং আমার পক্ষে এখনো কলকাতায় ফেরা কতখানি বিপজ্জনক। আমার ব্যাঙ্কে খোঁজখবর করে বাচ্চু ইতিমধ্যে জেনে গেছে যে আমি এই পাহাড় অঞ্চলে আছি। সে নৈনিতালের পোস্ট মাস্টার মশাইয়ের প্রযত্নে একটা চিঠি দিয়েছে। বাংলোর পরিচারক যখন আমার নাম লেখা খামটা আমার হাতে এনে দিল, তখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছিল

না যে সত্যিই চিঠিটা আমাকেই লেখা। ও ভেবেছিল অ্যালেন দীর্ঘদিন হোল আর এখানে নেই, নিশ্চয়ই সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দূরে কোথাও চলে গেছে। আমি আমার ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম। আমি প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপছি, যেন আমি মিঃ সেন বা মৈত্রেয়ী বা মিসেস সেনের হাতে ধরা পড়ে গেছি। বাচ্চু লিখেছে, ওরা পরিবারবর্গ মিলে মেদিনীপুরে কাটিয়েছে। সেখান থেকে মৈত্রেয়ী নিজেই আমাকে তাড়াহুড়ো করে কয়েক লাইন বিচ্ছিন্ন ভাবে লিখে পাঠিয়েছে। ও ঐ খামের মধ্যে কয়েকটা বন ফুলও পাঠিয়েছে, হয়তো গ্রামের পথে ঘুরতে ঘুরতে কোথাও থেকে তুলেছিল। আমি বুঝেছি, ও আমার এই নেহাৎই বস্তুবাদী, ইন্দ্রিয়াসক্ত, পার্থিব, মানুষের আসল চেহারাটা দেখে খুবই দুঃখ পেয়েছে। ও নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনায় আর একজন অ্যালেনকে সৃষ্টি করেছে এবং যার সঙ্গে এ পৃথিবীতে বাস্তবে অসম্ভব যাবতীয় স্বর্গীয় কল্পনা দিয়ে এক অপরূপ রূপকথা গড়ে তুলেছে যা এ বস্তু জগৎ থেকে বহু-উর্ধ্বে, বহুদূরে এক অপার্থিব স্বপ্নময় সত্তা।

ও আমায় লিখেছে—"আমি তোমায় হারিয়ে কি করে বাঁচব! তুমি যে আমার সূর্য, তোমার কিরণ ধারায়ই যে আমার প্রাণ সত্তা!"—আর একটা টুকরো কাগজে লেখা—"তুমি বাতাস," "তুমি ফুল",—ও আরও লিখেছে—"এই ফুলের গুচ্ছ গুলোকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে আমি তোমার একান্ত নিবিড় আলিঙ্গন অনুভব করি"—আর এক জায়গায় লেখা,—"প্রতি রাতেই তুমি আমার কাছে আস, যেমন করে তোমাকে আমাদের আলিপুরের বাড়ীতে পেতাম আর আমি তোমার কাছে কনে বউ সেজে যেতাম। তুমি আমাকে নারীত্বে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলে। আর তুমি, তুমি আস অজস্র মণিমুক্তা সজ্জিত সুবর্ণ দেবতার মতো, অসীম অপার সুষমায়, আমি তোমার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হই, আর তুমি আমাকে বুকে তুলে নাও। তুমি আমার কাছে শুধু প্রেমিক নও, তুমি আমার দেবতা, আমার সূর্য, আমার জীবন সর্বস্ব।...

আমিও যেন এক অদ্ভুত পৌরাণিক কালের স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে পড়ছি। একটা ব্যাপার ভেবে আমি ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছি এবং সংকুচিত বোধ করছি যে আমার মত সামান্য রক্ত-মাংসের মানুষকে, মানুষ দেবতা বানায় কি গুণে? আমি ভাবতে লাগলাম কোন্ নিরন্তর আদর্শের মহিম অনুভূতি মানুষকে দেবত্বে উত্তীর্ণ করে, কোন মহীয়সী প্রেম মানুষকে সূর্যের মহিমা দান করে। আমি নিজেকে যেন এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রূপে আবিষ্কার করলাম। আমিও তো

কল্পনায় সব সময়ই আলিপুরে মৈত্রেয়ীর সঙ্গেই আছি, কত নিবিড় ভাবে আমার সমস্ত পৌরুষ দিয়ে ওকে দুহাতে জড়িয়ে রেখেছি। যতই অলীক হোক, আমার মধুর স্বপ্ন নিয়তই আমাকে ঘিরে রইল। সমস্ত আকুলতা, সমস্ত আন্তরিক আর্তি দিয়ে যেন আমরা এক অনন্ত সম্পূর্ণতায় একে অন্যকে ঘিরে রয়েছি নিরন্তর। মৈত্রেয়ীর পুরাণ-কল্পনা আমাকে দেবপ্রতিম করে তুলেছে, একটা অবাস্তব আদর্শ মাত্রে পর্যবসিত করেছে। অথচ আমি আমার মধ্যে তার কল্পনার সেই "সূর্য"কে বা তার স্বপ্নের "ফুলকে" খুঁজে পাচ্ছি না যাতে আমি তার যোগ্য হয়ে থাকতে পারি ; আমি তো নেহাৎই রক্ত-মাংসের মানুষ, সব দোষ-ত্রুটি, আবেগ উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়েই।

আমার বুকের ভেতরটা যেন দুমড়ে মুচড়ে উঠছে। কেন মৈত্রেয়ী আমার থেকে এত দূরে চলে গেল ? যদি ভবিষ্যতে আবার যোগাযোগ করার জন্য পাগলই হবে, তাহলে ওকে ভুলে যাবার জন্যে আমায় অনুরোধ করেছিল কেন ? ও আজ আমাকে যেমন করে ভাবছে, কে ওর মাথায় এই রকম আমাকে দেবতা বলে ভাবার অনুপ্রেরণা দিল ? আমি তো দেবতার দূরত্ব চাই না, আমি তো বাস্তবে, এখনি তাকে একান্ত করে কাছে পেতে চাই। সব থেকে বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল, সেই পরম মধুর একান্ত করে পাওয়ার সুখ-স্মৃতিগুলো। ওর রক্ত-মাংসের অস্তিত্বটাকে নিয়ে আমি কত ভাবে, কত আশ্লেষে আদর করেছি, খেলা করেছি। সে যেন আমার সমস্ত চাওয়ার, সমস্ত ইচ্ছার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। তার দেহ, তার মন তার সব কিছু, যার মধ্যে আমি নিজেকে বারবার আবিষ্কার করি,—আমার স্মৃতিতে যেন সব কিছু চলচ্চিত্রের মত দৃশ্যমান। আমি পৃথিবীর কোন সম্পদের বিনিময়েই এই স্বপ্নকে ভুলতে রাজি নই। এটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমার আদর্শ, আমার অপার্থিব সত্তা। কিন্তু আমি কেবল স্বর্গীয়, অপার্থিব আদর্শের প্রতিরূপ হয়ে থাকতেও রাজি নই।

বাচ্চু আমাকে আরও কিছু নতুন খবর পাঠিয়েছে। অপারেশনটা সাকসেসফুল হয় নি, এবং ইঞ্জিনিয়ারকে আবার নতুন করে দু-মাসের ছুটি নিতে হয়েছে। মিসেস সেনের চেহারা একেবারে ভেঙে গেছে। তাঁর মুখের ভাব হয়েছে প্রশান্ত সন্ন্যাসিনীর মতো। মৈত্রেয়ী ভয়ে শঙ্কায় খুব শুকিয়ে গেছে। সে কিন্তু সমস্ত রকম বিয়ের প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। কলকাতায় ফিরে আসা[illegible] থেকে ও নাকি ক্রমাগতই আমার রয়েড স্ট্রীটের বাসায় ফোন করার চেষ্টা করেছে। ওর ধারণা আমি এ সহরেই রয়েছি

কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই ওর সংগে দেখা করছি না। বাচ্চু নাকি একদিন আমার পুরনো বাসায় গিয়েছিল। মাদাম রিবেরিও ওর কাছে আমার সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করে বলেছেন যে উনি আর আমাকে তার ওখানে থাকতে দিতে রাজি নন। আমি দুতিন সপ্তাহ বাইরে থাকবো বলে এসেছিলাম, কিন্তু তারপর থেকে চার মাসের ওপর হয়ে গেল, আমি বেঁচে আছি কিনা সে খবর পর্যন্ত কেউ জানে না। আমি কেবল হারোওকেই কটা ঠিকানাবিহীন টেলিগ্রাম করেছিলাম। ইঞ্জিনিয়ার শিবুকে প্রচণ্ড ধমক দিয়েছেন, সে মিসেস সেনের অবাধ্য হয়েছিল বলে। বেচারা ছেলেটার বড় দুঃসময় চলেছে। বিয়ের সময়ের চুক্তি অনুযায়ী ওকে এখন অনেকগুলো টাকার ঋণ পরিশোধ করতে হবে, ততদিন পর্যন্ত রমু আলাদা থাকবে। রমু এখন তার মা-বাবার কাছে, আর ও আছে একটা অল্পভাড়ার ছাত্রাবাসে। দিনের পরদিন শুধু চায়ে পাঁউরুটি ভিজিয়ে খেয়ে পয়সা জমাচ্ছে, ঋণ পরিশোধ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রমুকে নিয়ে আসবে।

বাচ্চু চিঠিটা শেষ করেছে, কবে নাগাদ ফিরব ঠিক করেছি সে কথা জিজ্ঞেস করে। সে ঝেড়ে জ্ঞান দিয়েছে, আমি যেন নিজের কেরিয়ার নষ্ট না করি, অথবা তুচ্ছ একটু ভালবাসাবাসি খেলা নিয়ে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট না করি। সব মানুষেরই জীবনে এরকম একটু আধটু হয়, তাই বলে কেউ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে হিমালয়ে গিয়ে বসে থাকে না; শক্ত হাতে এ সব মোকাবিলা করতে হয়। এটা কোন সমাধানই নয়। শেষে সে আবার যোগ করেছে, "কবে ফিরছ?"

আমারও ভেতরে অনেকদিন ধরেই এই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে, কবে ফিরছি, কিন্তু আমার কলকাতার জীবনের কথা আমি কিছুতেই ভাবতে বা মেনে নিতে পারছি না। তা ছাড়া, কলকাতায় ফিরে হবেই বা কি! আমার তো সেখানে কোন কাজকর্ম নেই। আমাকে আমার আগের অফিস থেকে কোন কাজের সার্টিফিকেট দেয় নি। কাজেই নিষ্কর্মা বেকার হয়ে ওখানে গিয়ে কোনই লাভ নেই। আমার পকেট বরং এই নির্জন পাহাড়ে কম খরচে এখনো বছর খানেক থাকার অনুমতি স্বচ্ছন্দে দিতে পারে। কিন্তু তারপর? আমি তো ফতুর হয়ে যাব। তখন আমায় অনেক দূরে, যেমন জাভা বা অন্য কোথাও চলে যেতে হবে এবং সেখানে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে…। অবশ্য এ ভাবা নেহাৎই ভাবার জন্যে ভাবা। সত্যি সত্যিই আমি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা মন থেকে মেনে নিতে পারছি না, নেহাৎই যদি বিদেশে একটা

চাকরি বাকরি না জুটে যায়। আমার সমস্ত কর্মক্ষমতা, সমস্ত উচ্চাশা, জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্যই যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, হারিয়ে গেছে। এখন সে সবের স্বপ্নও বরং আমাকে দুঃখ এনে দেয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলায়। বাংলোর বারান্দায় বসে বসে আমি কেবল পাইনের বন, পাহাড় কল্পনা করি, আর ধ্যান-মগ্ন হয়ে থাকি···এই সুন্দর অমলিন বনটার চাইতে মনোরম সুন্দর আর কিই বা আছে? অথচ কেউ তাদের প্রশ্ন করে না, কেন তারা বাড়ে, কেউ তাদের অতুলনীয় সৌন্দর্যকে দুচোখ ভরে দেখে না, কেন? কেন? আমি গাছ হতে চাই, গাছ হয়ে মহাসুখে, শান্তভাবে হাওয়ার ভরে হেলতে দুলতে চাই, গঙ্গার পাড়ে, জলের ধারে···। আমার আর কোন ভাবনা নেই, কোন অনুভূতি কাজ করছে না, কোন স্মৃতি আর ভারাক্রান্ত বা বিব্রত করছে না···। জীবনের কোন সাড়াই আর জাগছে না, যা আমাকে আবার জনসমাজে ফিরে যেতে প্রলুব্ধ করতে পারে। আমি যেন পাথর হয়ে গেছি, উজ্জ্বল স্ফটিক—স্ফটিকের আলো আছে, উজ্জ্বলতা আছে, কিন্তু প্রাণহীন পাথর···। নিষ্প্রাণ···।

আমি আসার সময় একখানা বইও নিয়ে আসি নি। আমার মাথার মধ্যে কেবল কতকগুলো ভাবনা কাজ করছিল, যাতে আমি নির্জন একাকীত্বের জীবনে কিছুটা স্বস্তি ও শান্তি পেতে পারি। আমার এই দীর্ঘ নির্জনবাসে কেবল সামান্য কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হয়েছি, যারা আমার সমান, ব্যথার ব্যথী বরং আমার চেয়েও গভীর অথচ প্রাণবন্ত, স্বাধীনচেতা। চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকার চেয়ে আমি মুক্ত প্রকৃতির বুকে মুক্ত মন নিয়ে ঘুরে বেড়াতেই বেশি ভালবাসি। কিন্তু আসলে আমি নিজের কাছে সব দিক দিয়ে বন্দী···আমার ভাবনার জগতে কয়েকটা দিক নিষিদ্ধ প্রদেশ, যেমন, ২৩শে অক্টোবরের স্মৃতি···।

মার্চের সুরুতে, একদিন, বেশ একটু বেশি রাতেই, হঠাৎ বাংলোয় এক অজানা অতিথি এসে উঠল। ডাকাডাকিতে জেগে উঠে বাংলোর পরিচারক তাকে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিল। কিন্তু তার খিচুড়ি ভাষা এতই দুর্বোধ্য যে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে আমার ডাক পড়ল। হিমালয়ান ফারের বিশাল কোটটা গায়ে চাপিয়ে বেরুলাম, আমাকে প্রায় এক মঙ্গোলিয়ান মাউণ্টেনিয়ার বলে মনে হচ্ছিল। বারান্দায় একটা লম্বা-ইজি-চেয়ারে এক ভদ্র মহিলা আধ-শোয়া অবস্থায় বসে আছেন, দেখেই বোঝা যায় বেশ ক্লান্ত। ট্রেঞ্চ-কোটে ঢাকা চেহারায় খেয়ালই করিনি তার চুলগুলো বাদামী—লালচে এবং হাত দুটো বেশ

বড়সড়। মাত্র কয়েকটা হিন্দুস্থানী শব্দ তাঁর সম্বল। আমাকে দেখেই তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্বস্তিতে। এখনও তিনি হাঁপাচ্ছেন। তিনি জানালেন যে তিনি রাণীক্ষেত থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসেছেন, পথ হারিয়ে ফেলে নানা দিক দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে, একটা বেশ বড় ঝরণা পেরিয়ে শেষে এই বাংলো খুঁজে পেয়েছেন। তিনি আমায় তাঁর এই একা দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বিশদভাবেই বললেন। শুনে বুঝলাম কাজটা তাঁর উচিৎ হয়নি। তাঁর নাম জেনিআইজাক্,আসছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন থেকে এবং বেশ কয়েকমাস ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি হিমালয়ের বুকে একটা এমন ধর্মস্থান খুঁজে বেড়াচ্ছেন যেখানে তিনি ঈশ্বরের সন্ধান পেতে পারেন।? প্রথম কথাতেই বুঝলাম, তিনি এ জগৎ সম্পর্কে খুবই নিস্পৃহ, শান্ত, স্থির, ঐ একটি উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁর আর জগতের কোন কিছুর প্রতিই আকর্ষণ নেই। বাংলোর পরিচারক বারান্দার বড় আলোটা জ্বালতে আমি তাঁকে আরো ভাল করে দেখতে পেলাম। তিনি নিতান্তই তরুণী, নীল চোখ, সুন্দর গোল মুখ, কিন্তু একেবারেই ভাবলেশহীন, বেশ লম্বা চওড়া চেহারা,গলার স্বর যেন ছোট্ট মেয়ের মত, হাত দুটো বেশ লম্বা, বিশাল বুক—রীতিমত স্বাস্থ্যবতী। পরনে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকের বিচিত্র পোষাক, পুরো মাউন্টেনিয়ারের চেহারা। ভদ্রমহিলা ঠাণ্ডা প্রায় জমে গিয়েছিলেন। পরিচারক বেশি করে চা এনেছিল, তিনি সবটাই খেয়ে ফেললেন, আর মাঝে মাঝে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। তিনি প্রায় একটানা দুদিন ধরে হেঁটেছেন। তিনি হেঁটে বদ্রীনাথের মন্দিরে যাবার জন্য বেরিয়েছেন, প্রায় তিরিশ দিন এদিক ওদিক ঘুরে মাইখালি পেঁছান। পথের দিশার কথা শুনে আমি চমকে গেলাম। ও পথটাতো এখন পুরো বরফে ঢাকা! ঘন কুয়াশার মধ্যে জমাট ঠাণ্ডায় হাঁটতে গিয়ে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। ওঁকে এখন হরিদ্বার হয়ে যেতে হবে বলে জানালাম। মোটামুটি আমার যতটা জানা আছে, সেটাকে মূলধন করেই বললাম, ওকে প্রথম কোট দ্বারায় যেতে হবে, সেখান থেকে ট্রেনে হরিদ্বার যাওয়া যাবে। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি ঐ সব জায়গায় যাচ্ছি, না এখন বেশ কিছুদিন এই বাংলোতেই থাকব। বড় সমস্যাজনক প্রশ্ন! আমি শুকনো অনাগ্রহী গলায় জবাব দিলাম, আমি এখনো কিছু ঠিক করিনি, তবে মনে হচ্ছে কিছুদিন থেকে বিশ্রাম নেব, তাছাড়া, এই নির্জন পাহাড়ে সুন্দর পাইনের বন, আমার ভীষণ ভালো লেগে গেছে। এখানে বড় একটা কেউ আসে না।

পরের দিন আমি প্রতিদিনের নিয়ম মত সকালেই বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়ে, বনে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঘুরে, কেক রুটি যা ছিল খেয়ে, ঝর্ণার জল যেটুকু সম্ভব মুখে দিয়ে, বেশ রাত করেই বাংলোয় ফিরলাম। ঢুকতেই পরিচারক জানাল, 'মেম্‌সাব' অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এবং আমি ফিরলেই দেখা করতে বলেছেন। বেচারা জোন আইজাক্‌ তার দু'চারটে হিন্দুস্থানী শব্দের বিদ্যে নিয়ে নিশ্চয়ই খুব ফাঁপরে পড়েছিলেন। আমি ও'র দরজায় টোকা দিলাম। জ্বরের ঘোরে বসে যাওয়া গলায় ভেতরে যাওয়ার ডাক এল। বুঝলাম, তিনি রীতিমতই অসুস্থ, আর শঙ্কিত হলাম যে পাহাড়ী জ্বরের প্রকোপ এখন বেশি। বড় পাজি রোগ। জ্বরে কাঁপছেন, কিন্তু ভয় পান নি। তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় হিন্দুস্থানী কথাবার্তার একটা তালিকা করে দিতে অনুরোধ জানালেন, এক কাপ কোকো খেতে চাইলেন। পরিচারক ভাষা না বোঝার ফলে কিছুই আনতে পারে নি···।

আশ্চর্য, এই নির্জন পাহাড়ের বুকে একেবারে একা, এখানকার ভাষা জানা নেই, পথের হদিশ জানা নেই, কোন দিক থেকে সাহায্য পাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তবু কত নিশ্চিন্ত, নির্ভীক,—এই অসুখের মধ্যেও। তিনি আমায় জানালেন, গত দু তিন সপ্তাহ ধরেই তাঁর এই রকম ঘুরে ফিরে জ্বর আসছে। তিনি অসুস্থ হয়ে আলমোড়ায় এক ভুটানীর কুঁড়ে ঘরে বিশ্রাম নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মনে ভয়ের লেশ মাত্র নেই। আমি তাঁকে বললাম, এ ভাবে কিছু না জেনে শুনে অপ্রস্তুত ভাবে ভারতবর্ষের বনে পাহাড়ে ঘুরতে আসা তাঁর উচিৎ হয় নি। তিনি বোধহয় লজ্জায় একটু লাল হলেন, কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিলেন—আমি অনন্ত ব্রহ্মকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

আমি এক বিরাট হাসিতে ফেটে পড়লাম। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই হাস্যকর, মজাদার মনে হোল। কিন্তু পরক্ষণেই আমার নিজেই থেমে যেতে হোল। ভদ্রমহিলার কোন উত্তেজনার বালাই নেই। এমন আত্মমগ্ন ঠাণ্ডা অনুত্তেজিত, জগতের প্রতি সম্পূর্ণ বিরাগী মহিলা আমি কখনো দেখি নি। তারপর তাঁর গলায় "ব্রহ্ম" কথাটা শুনে মনে হোল, সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের এই মিষ্টিক নাটকীয় কথাটা বেশ ভালই ছড়িয়েছে, আর তার সঙ্গে এই অঞ্চলের গল্প—অথচ আমি তো দীর্ঘ দিন এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছি ·····।

আমি এ প্রসঙ্গ এড়াতে চেষ্টা করলাম। আমি তাঁকে মহাত্মা গান্ধীর আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর প্রশ্ন করলাম। অবান্তর প্রশ্ন, আমায়

কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি নিজেই বাতিল করতাম। তিনি বললেন এটা ইংরেজদের ব্যাপার, তার কিছুই মন্তব্য করার নেই, তিনি ফিনল্যাণ্ডের এক ইহুদী বংশের মেয়ে; তবে তাঁর মতে, তিনি সাদা-চামড়ার লোকেদের 'ভণ্ডামী' একেবারেই সহ্য করতে পারেন না, এবং সেজন্যেই—এ সব থেকে দূরে থাকার জন্যেই তিনি ঠিক করেছেন কোন এক আশ্রমে গিয়ে সত্যের, জীবনের, অমৃতের সন্ধানে রত হবেন। তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে আমি অ্যাংলো স্যাক্সন জাতটা কিভাবে ভারতবর্ষের মহান সংস্কৃতিকে নেহাৎই ফাকিরি, মিষ্টিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাপার বলে অপপ্রচার করে আসছে, রামচরকের বইয়ে যে সমস্ত অবান্তর ধর্মীয় সত্যের এবং ক্রিয়া-কর্ম ভাবনার কথা বলা হয়েছে, তার প্রভাব অনুভব করলাম। এটা বোঝা যাচ্ছে, যে ভদ্রমহিলা দীর্ঘদিন ধরে একা; তিনি আমার সব কথাকেই সরাসরি নাকচ করছেন, তবু কথা বলছেন, কারণ অন্ততঃ একজন মানুষ পেয়েছেন যে তাঁর কথা শুনছে, বুঝুক আর না বুঝুক। কথায় কথায় জানতে পারলাম তাঁরা পাঁচ বোন। তিনি কেপটাউনের মিউনিসিপ্যাল অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজাতেন; জোহান্সবার্গের কনসার্টেও বাজিয়েছেন। মাসে চল্লিশ পাউণ্ড স্টার্লিং আয় ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেন নি—তারা বুর্জোয়া মনোবৃত্তিসম্পন্ন,—মেয়েরা বিয়ে ছাড়া আরও যে কিছু করতে পারে তা ভাবতেই পারে না। তিনি এই শ্বাসরোধ করা পরিবেশকে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁর কাজ ছিল রোজ রাতে তার নিজের পয়সায় কেনা ছোট মোটর গাড়ীতে চড়ে কনসার্টে বাজাতে যাওয়া আর…।

তিনি হয়তো পরম উৎসাহে আরও কিছুক্ষণ কথা বার্তা চালিয়ে যেতেন, কিন্তু রাত হয়ে গেছে, এই অজুহাতে আমিই চলে এলাম। আমি তাঁকে বলে এলাম, যে কোন রকমের প্রয়োজন হলেই যেন আমাকে ডেকে পাঠান, তারপর খুব সন্তর্পণে তাঁর সঙ্গে মৃদু হ্যাণ্ডসেক করে বিদায় নিলাম।

সে রাতে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম, অনন্ত ব্রহ্ম ব্যাপারটার মূল চরিত্রটা কি, যার আশায় ভদ্রমহিলা তাঁর সব কাজ কর্ম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁর জন্যে আমার খুবই করুণা হল, বেচারা শুধু রামচরক ছদ্মনামে ইংরেজ এক গল্পকারের অনন্ত ব্রহ্ম সম্পর্কে গল্প শুনেই একটা মোটামুটি সভ্য দেশের কর্ম, স্বাধীনতা ইত্যাদি ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ব্রহ্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন! অনেকক্ষণ ধরে তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে তাঁর

সব আবিষ্কার, যার মধ্যে দিয়ে তিনি "এক নতুন ইন্দ্রিয়াতীত জগতের" সন্ধান পেয়েছেন, সে সব এক অপার্থিব, রহস্যময় ব্যাপার। একদিন নাকি রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে একটা লাইব্রেরীর নাম পেয়েছিলেন, যার সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। পরের দিন সকালে কোথায় যেন যাবার পথে তাঁর গাড়ীটা মাঝ পথে দুর্ঘটনায় পড়ে, হঠাৎ দেখেন সামনেই সেই স্বপ্নে দেখা লাইব্রেরীটা। অথচ তিনি কেপটাউনের এই পথটা ধরে কতশতবার যাতায়াত করেছেন, কিন্তু এর আগে কোনদিন তাঁর এটা চোখেই পড়ে নি। তিনি তার ভেতরে ঢুকে প্রচুর ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও যোগ সম্পর্কে বই দেখতে পেলেন। তিনি রামচরকের প্রচুর বই পড়েছেন। সেগুলো ভারতাত্মা সম্পর্কে "গভীর জ্ঞান সঞ্চারী"।

দিন কয়েক ধরে আমার অনন্ত ঘোরাঘুরি বন্ধ করতে হয়েছে। আর সেই অভ্যাসমত স্বপ্নালু কল্পনা আর তার ধ্যানে মেতে থাকতে পারছি না…। জোন এখনো বেশ অসুস্থ, আমার তার কাছে থাকাটাই বেশি প্রয়োজন। এ কদিনেই সে আমার ওপর এত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যে তার এত দিনের একাকীত্ব ও ও মানব সঙ্গ ছেড়ে আসার কথা ভুলে সে সবসময় ছুতো-নাতা করে পরিচারককে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠাচ্ছে। অন্তরঙ্গতার সূত্র ধরে সে এখন দীর্ঘ সময় ধরে আমাকে তার জীবন কাহিনী শোনাতে ব্যস্ত, অনেক কিছু তার একান্ত ঘটনাও নাকি সে আমার কাছে স্বীকার না করে শান্তি পাচ্ছে না। সে বলছে, তার সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগে তার জীবনের সব কথা আমাকে বলা দরকার এবং সে তার গোপন প্রেম-ভালবাসার কথাও অকপটে ব্যক্ত করেছে। সে বিশ্বাস করে যে নেহাৎই একঘেয়ে চলতি চরিত্রগুলোর থেকে সে একেবারেই আলাদা জাতের এবং সে নাকি মাদাম বোভারির মত এক সময় তার জীবনে ক্রমাগত পুরুষ সঙ্গ করে এসেছে একের পর এক। তখন তার মনে হয়েছে সেটাই সব থেকে মহৎ এক আদর্শ বিশেষ, এক চরম সত্য। কিন্তু এখন নানা অভিজ্ঞতায় জোনির এই জগতের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, এই সমাজ, পরিবার, প্রেম-ভালবাসা, সবকিছু তার কাছে এক বিরাট ভুয়ো প্রবঞ্চনা বলে মনে হয়। সে যে কত কষ্টে এই সব পার্থিব বাঁধন থেকে মুক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে, সব কিছু ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে, সে সব অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে তার ভাবলেশহীন মুখে ব্যথার রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে তার সঙ্গীত ও শিল্প জগৎ থেকে বিদায় নেওয়া সত্যিই খুব বেদনার। সত্যিকারের ভালবাসার অভিজ্ঞতা তার জীবনে সামান্যই…সে বলেই ফেললো যারা তার

কাছে এসেছে তারা কেউই তাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে আসে নি। যাকেই সে ভালবেসে আঁকড়ে ধরেছে, পরে দেখেছে তারা প্রত্যেকেই অন্য কারো একনিষ্ঠ প্রেমিক। সে বুঝেছে, তার মন প্রাণ দেওয়া প্রেম কারো কাছে কোন মানসিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে নি, তাই সে ইচ্ছে করেই দৈহিক প্রেমের চরম সুখ কোথায় এই নিয়ে যেন গবেষণা করে এসেছে, তারপর তার এই পার্থিব বস্তু জগতের মায়া ত্যাগ করে অনন্ত ব্রহ্মের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। এই তো, আফ্রিকা ছেড়ে বেরিয়ে আসার মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগেই সে এক জার্মান ছেলের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছে, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছে তার হাতে। ছেলেটি একজন বিখ্যাত নৃত্য শিল্পী। সে জেনির প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিল, সত্যি বলতে কি বোধহয় ভালোবেসেই ফেলেছিল। সে বিশ্বাসই করতে চায়নি জেনির ভালোবাসার ছলনা আদপেই হৃদয়ের ভালবাসা নয়, তার এক নিষ্ঠুর খেলা মাত্র, দৈহিক মিলন সুখের ছেলেখেলা, আসলে ভালবাসার পাত্রদের সে মন থেকে ঘেন্না করে। সে তার বিশ্বাসের এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে পেঁছিলে মনে হওয়া সম্ভব, সমস্ত পুরুষ মানুষই এক একটা কামুক পশু মাত্র, এক একটা ক্ষীণজীবী, জড়ভরত, শুয়োর। সত্যিকারের প্রশংসনীয় পুরুষ হচ্ছে সে যার ভেতরে বিচার বিবেচনা, বিবেক ও অন্যের প্রতি সহানুভূতি, মমত্ববোধ আছে, এবং যে আদর্শের জন্যে "পার্থিব সুখ" কে হেলায় ত্যাগ করতে পারে। যেমন, সন্ন্যাসী, দার্শনিক বা কোন অধ্যাত্ম রহস্য সন্ধানী।···জেনির মাথায় এখন নানা রকমের অসংলগ্ন ভাবনা-চিন্তা ভীড় করে আছে। ওর নিজের জীবনের মানাসিক বঞ্চনার ইতিহাস এবং বর্তমানে নানা নারীসুলভ কুসংস্কার—পুরুষ সম্পর্কে "মহানুভব পুরুষ", "দেব সুলভ চরিত্র", "নির্জন জীবন", "সর্বত্যাগ", ইত্যাদি ভাবনা ওর সব গুলিয়ে দিয়েছে······।

আমি এ সমস্ত শুনে প্রায় ক্ষেপে উঠেছিলাম। আমি যেদিন থেকে জনসমাজ ত্যাগ করে এই নির্জন পাহাড়ে বাস করছি, সেদিন থেকে আমার মনে একটাই চিন্তা রয়েছে, আমাকে একটা আদর্শকে রূপ দিতে হবে, যে কোন মূল্যেই হোক। আর এই মেয়েটা অনন্ত ব্রহ্মকে খুঁজতে গিয়ে সব কিছু এমনি গুলিয়ে ফেলেছে যে কেবল অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে এবং নিজেই নিজেকে কষ্ট দিয়ে মারছে। ওর মাথার ভেতর হাজারো রকমের বিভ্রান্তিকর ধারণা কিলবিল করছে।

প্রতি রাত্রে আমি যখন ঘরে ফিরে আসি, আমি আমার ডায়েরিতে আমার

নিত্যদিনের চিন্তা, ধারণা, অভিজ্ঞতা লিখে রাখি। আমার মনে হচ্ছে, জেনির এখানে আসাটা আমার পক্ষে নিতান্তই একটা সাধারণ ঘটনা নয়। ওর উপস্থিতি বোধ হয় আমার সঙ্গে আবার নতুন করে আমার স্বেচ্ছায় ছেড়ে আসা বস্তু জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই জেনি সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং শারীরিক বল ফিরে পেয়েছে। কিন্তু এখনো তার চলে যাবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে আমার প্রতি তার মনোভাবও আমূল বদলে গেছে। প্রথম দিকে ওর কথাবার্তা আমাকে বেশ বিরক্ত ও উত্যক্ত করত। কিন্তু ও আমার প্রতি বেশ আকর্ষণের ভাব দেখাচ্ছে, আমার কথার মূল্য দিচ্ছে, এবং কতকগুলো বিষয়ে তার প্রতি আমার প্রশংসাকে সাগ্রহে গ্রহণ করছে—এক কথায় ওর ভেতর দিয়ে আমি আবার আমার ইওরোপীয় মূল্য বোধকে যাচাই করে নিচ্ছি, কারণ আমিও তাদের ফেলেই দূরে এসেছি, হয়তো আবার তাদের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে কিছুদিনের মধ্যে বা অনেকদিন পরে। কিন্তু আমার এবং আমার নতুন তরুণী বান্ধবীর স্বার্থেই এই যাচাই হয়ে যাওয়াটা জরুরী ছিল।

সেদিন ওর ঘরে ঢুকতে গিয়ে আমি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে থ' মেরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। ঘরের মধ্যে জেনি তখন প্রায় নগ্ন অবস্থায়। আমি অস্বীকার করব না, সেদিন আমি উত্তেজনা এড়াতে পারি নি হাঁ করে তাকিয়েছিলাম সেই মোহময়ী রূপের দিকে।

সে রাতে নানা ভাবনা আমার মাথায় ভীড় করে রইল। আমি নিজেকে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, মৈত্রেয়ীর ওপর আমার এই যে লাগাম-ছাড়া ভালবাসা, বাস্তবে তা কেবল আমার জীবনে প্রবল আঘাত, বিচ্ছেদ, আমার সব কিছু ছেড়ে এভাবে নির্জনে অজ্ঞাতবাস, নিজেকে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত, বিপর্যস্ত করে ফেলা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে নি। এই প্রেমের নেশা আমাকে একটা জরদ্গব সেণ্টিমেণ্টাল, ভীতু ক্লীবে পরিণত করেছে মাত্র। আমার সমস্ত পৌরুষ নিয়ে কর্মজগতের মুখোমুখি দাঁড়ানোর, নিজের ব্যক্তিত্বকেও কর্মক্ষমতাকে সকলের সামনে প্রতিষ্ঠা করার বদলে আমি জড়, অক্ষম, ব্যর্থতার জীবন বেছে নিলাম কেন! এক তুচ্ছ নারীর ভালবাসাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে আমি এই যে সর্বত্যাগী জীবনকে বেছে নিয়ে নিজেকেই নিরন্তর বঞ্চনা করে চলেছি, এর শেষ কোথায়? এখনো কি সেই নারীর, সেই প্রেমের মৃত প্রায় স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে আগামী দিনের বাস্তব সম্ভাবনাগুলোকে

বিসর্জন দেবার কোন যুক্তি আছে? নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে সে রাতটা আমার প্রচণ্ডভাবে ছটফট করে কাটল। আমার মনে হতে লাগল, একটা ভুয়ো আদর্শকে আঁকিড়ে ধরে থাকতে গিয়ে আমি আমার সমস্ত জীবনটাকেই বিপথে নিয়ে চলেছি যেটা একমাত্র মূর্খের মত নিজেকে ধ্বংস করে দেবার পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এটাও ঠিক, যে আমার মনের এখন যে অবস্থা, তাতে নতুন করে আবার নারী সঙ্গ, আবার সেই সংগ্রামের, কামনার, ব্যর্থ আকর্ষণের বাস্তব জগতের প্রতি আর আমার কোন মোহ রাখতে ইচ্ছে করছে না।' আমার এখন এই জীবনের বিনিময়ে একটা জিনিস দেখারই প্রচণ্ড আগ্রহ, যে এই পৃথিবী ও তার নারী জাতি নিজেরা আমার দ্বারা কখনো আকর্ষিত হয় কিনা।' আমার এই পলায়নী মনোবৃত্তি আর জগতের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা, অনীহাই কি আমার এই অবস্থার জন্যে দায়ী নয়? আমি নিজে ছাড়া আর কেউ কি জোর করে আমাকে এই পথে ঠেলে দিয়েছে? আমার কি এখনো নতুন করে ভাবার, নতুন পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে?

আমি জেনিকে যেন নতুন চোখ নিয়ে দেখতে চাইলাম। এবার আর আমার কোন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা কষ্ট হোল না, কোন অযথা সেণ্টিমেণ্ট কাজ করল না, প্রথম প্রেমের বিহ্বল অনুভূতি হোল না। আমার স্বাধীনতায় আর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

কেপটাউন ছেড়ে আসার সময়ে জেনির ভেতরে বস্তু জগতের প্রতি যে অনীহা তার নারীত্বের স্বাভাবিক ধর্ম অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তাকে রুক্ষ কর্কশ করে ফেলেছিল, আমার সান্নিধ্য নিঃসন্দেহে তাকে তার সেই অবস্থার ফাঁদ থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে আরও স্নিগ্ধ কোমল রমণী করে তুলেছে। ও বোধহয় আমাকে ওর নারীত্বের মোহজালে বন্দী করতে পেরেছে··· ··আমি যদি তাকে গ্রহণ করি, তার মধ্যে দিয়ে আবার নিজের কাছে প্রমাণ করে দিতে পারি যে আমার ভেতরের চিরকালের সেই পুরুষটা এখনো মরে নি,—আমার সমস্ত দোষ ত্রুটি, ক্ষুদ্রতা, উজ্জ্বল অনুভূতি নিয়েই আমি একটা মানুষ··· আবার যদি পৃথিবীর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াই, আমাকে তো বাধা দেবার কেউ নেই; আমি এতাবৎ যা করে এলাম, তার বিপরীতটা করারও সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে···।

আমায় স্বীকার করতেই হবে যে জেনি ক্রমশঃ আমার কাছে আরও কোমল, আরও স্নিগ্ধ, আরও বেশী করে নারী হয়ে যাচ্ছে। সে আমার সঙ্গে ধর্ম প্রসঙ্গ

নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছে, "তিব্বতের রহস্য' সম্পর্কে জানতে প্রচণ্ড আগ্রহী, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি ওটা ওর একটা ছল মাত্র। তার চোখ দুটো আরও ভাসা ভাসা, অর্ধনিমীলিত হয়ে উঠেছে যেন কি এক আরামের মদীর নেশায়, তার গলার স্বরে এক উষ্ণ আবিল সুর—যেন অনেক বেশি রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে ও। মাঝে মাঝেই ও সামান্য কথায় উচ্চকিত হয়ে হেসে খুন হচ্ছে, কারণে অকারণে আমার মুখের সামনে পরম যত্নে চকলেটের কাপ তুলে ধরছে—সবচেয়ে বড়কথা, যখন সে প্রথম এল, তখন তার মুখে মেয়েলী প্রসাধনের চিহ্ন মাত্র ছিল না ; এখন সে মুখে পাউডার মাখছে, সুন্দর ভাবে মেক-আপ করছে, সাজছে। সে অনবরত আমার কাছে জানতে চাইছে আমি এই নির্জন জগতে একা একা পড়ে আছি কেন, আমার হাতে এই কালচে পাথর বসানো আংটিটা কে দিয়েছে ইত্যাদি।

সবচেয়ে মজার কথা হল, জেনিকে দেখে এবং ওর সঙ্গে কথা বলার মধ্যেও আমি মৈত্রেয়ীর আভাস পাচ্ছি। আমার অন্তরে এখনো নিরন্তর প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে মৈত্রেয়ীর অধিষ্ঠান। যখনই আমি কল্পনা করতে চাইছি, যে আমি কোন নারীসঙ্গ উপভোগ করছি,—যেমন হাতের কাছে জেনিই তো রয়েছে,—তখনই আমি ভেতর থেকে টের পাচ্ছি যে সেটা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ভালবাসার প্রতিটি অভিব্যক্তির মধ্যেই একটা দুরু দুরু শিহরণের ভাব থাকে, কিন্তু আমার পক্ষে আর সেই ভাব ফিরে পাওয়া অসম্ভব। মৈত্রেয়ী আমার প্রাণ, মন সমস্ত সত্তাকে এমন ভাবে ঘিরে আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যে তার স্মৃতি আমাকে আর কোন কিছুর দিকে তাকাতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। সর্বত্র সে এসে দাঁড়াচ্ছে মূর্তিময়ী হয়ে, আমার যে কোন ভুলত্রুটির সম্ভাবনাকেই শাসন করছে, আমার পৌরুষের সম্মান যাতে ধুলোয় লুটিয়ে না পড়ে। তাহলে আমি কী করব ? তাহলে আমি কি আর এলোইজ বা আবেলারের মতো দুর্মদ, দুর্দমনীয় হতে পারব না এ জীবনে ? আমার যে আবার স্বাধীন ভা সবকিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে, আবার একবার পরখ করে দেখতে ইচ্ছে করছে মৈত্রেয়ীর পরেও আর একবার কাউকে নির্দ্বিধায় ভালবাসতে পারি কিনা, নতুন প্রেমের জোয়ারে আর একবার ভেসে যেতে পারি কিনা। কিন্তু আমার পক্ষে আমার পুরনো সংস্কার ভেঙে নতুন করে চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমারই কতকগুলো বিভ্রান্তিকর মনোভাব। আমি যেন কিছুতেই নতুন অভিজ্ঞতার ঝুঁকি নিতে সাহস পাচ্ছি না। বাধার শেকল ছিঁড়তে পারছি না। আমি কি

...তাই নিজেকে বড্ড ভুল করছি ... ?

জেনি আগামী সোমবার চলে যাবে বলে ঠিক করেছে। ও রাণীক্ষেত থেকে একটা কুলি পাঠাতে লিখে দিয়েছে। শেষের এই কটা দিন ও যেন বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। নানা ছল-ছুতোয় কেবল আমার কাছে কাছে ঘুরেছে, অকারণে হাসছে, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, যে পরিব্রাজক জীবন সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই, যাতে শুধু একাকীত্বের যন্ত্রনাই সার সেরকম জীবনের দিকে এগোবার দরকার কি ? আমাকে বার বার বোঝাচ্ছে, ওর আর আমার মত নির্জন জীবন যন্ত্রণার স্পৃহা নেই, কারণ সেখানে কারও পথ চেয়ে থাকার সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ওর এই হঠাৎ নারীত্বের জাগরণে বেশ মজাই পাচ্ছি। শনিবার সন্ধ্যায় খুব সুন্দর চাঁদ উঠেছিল, ঘন কুয়াশা ভেদ করে আকুল করা ছায়া-ছায়া মেঘ-জ্যোৎস্না। আমার ভেতরটা যে ঠিক কিরকম করছিল তা বোঝাতে পারব না ; কেন আমি আমার ভেতরটাকে এ ভাবে চেপে রেখেছি, আমি এত সতর্কভাবে নিজের কাছে কী গোপন করতে চাইছি ? আমি ঠিক করে ফেললাম আজ এই বারান্দায় বসে ওকে মৈত্রেয়ীর সমস্ত কাহিনী শোনাব।

কাহিনী বলতে বলতে মাঝ রাত পেরিয়ে গেল, সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জেনি আর আমি তখনও বসে আছি বারান্দায়। একটু চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নেবার জন্যে আমারা দুজনে ওর ঘরে ঢুকলাম। আমি ইতিমধ্যে মৈত্রেয়ী প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ শেষ করে এখন বাচ্চুর চিঠির কথা বলছি, এবং জেনিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি যে আমি মৈত্রেয়ীকে ভুলেই যাব ঠিক করেছি,—আর এই অযথা যন্ত্রনার স্মৃতি মনের মধ্যে পুষে রাখব না। যা গেছে তা যাক্। সেদিন ভাবের আবেগে কি যে বলেছি আর কি না বলেছি, তা নিজেই ভেবে পাই না। সেদিন যেন হঠাৎ খুশির মত্ততায় বোকার মত নিজেকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করতে রীতিমত বাচালতা এবং ভাঁড়ামিই করে ফেলেছি। আমি একটা সামান্য মানুষ, কেন যে অসামান্য একনিষ্ঠা দেখাতে গিয়েছিলাম, এই কথা ভেবে নিজেই হেসে খুন হয়েছি। জেনি শুকনো মুখে স্থির, স্তব্ধ হয়ে সব ইতিহাস শুনেছে, ওর দু চোখে জলের ধারা নেমেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ও কাঁদছে কেন। ও কোন উত্তর দিল না। আমি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত দুটো আমার হাতের মধ্যে নিলাম, তার দুবাহু দুহাতে চেপে ধরলাম যেন নতুন সঞ্চারিত আবেগে। সে আমার খুব কাছে এসে মাথা নীচু করে রইল। আমাদের

দুজনের উষ্ণ নিঃশ্বাস দুজনকে স্পর্শ করতে লাগল—আমি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ধরা গলায় চরম উৎকণ্ঠায় বললাম—কাঁদছ কেন ? বল, বল ! এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও চোখ বুজল, তারপর হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চুম্বন করতে লাগলো ।

প্রচণ্ড আনন্দ উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে আমি ঘরের দরজার খিলটা লাগিয়ে দিলাম ।

ডায়েরির পরবর্তী পাতাগুলোয় মনে হচ্ছে আর মৈত্রেয়ীর ইতিহাসে ভরে রাখতে পারবো না । এই সব স্মৃতির বোঝা টেনে বয়ে বেড়ানোর আর কোন প্রয়োজনই দেখছি না । এই দীর্ঘদেহী, সুবল ফিনল্যাণ্ড বাসিনীর শ্বেত শুভ্র দেহ দুহাতে আঁকড়ে ধরে আমি আর মৈত্রেয়ীর কথা ভাবতে চাইছি না—জেনিকে প্রতিটি চুম্বন করার মধ্যে যে মৈত্রেয়ীর কথা মনে আসছে সে মৈত্রেয়ী আমার প্রেমের ইতিহাস, তাকে আমি মন থেকে দূর করে দিতে চাই সম্পূর্ণভাবে । দার্জিলিং যে বরতনুকে ঘিরে আমার সেদিনের প্রেমের স্বপ্নসৌধ গড়ে উঠেছিল, সে প্রেমের আজ সমাধি হয়েছে । আমি এখন কথা প্রসঙ্গে যে মৈত্রেয়ীর কথা টেনে আনছি, সেটাও বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা নিয়েই ।

আমি কি মৈত্রেয়ীকে সত্যিই ভুলতে চাই, না কি আমি নিজের কাছে জোর করে প্রমাণ করতে চাই, আমার ভেতরে প্রেমের নিষ্ঠা বা একনিষ্ঠা বলে কিছুই নেই ? আবার নতুন করে প্রেম করতে আমার এতটুকুও কষ্ট, এতটুকু দ্বিধা হবে না ? আমি নিজের মনের ভেতরটা যথেষ্ট হাতড়েও কোন সদুত্তর পাচ্ছিনা ; নাকি এটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতাহীন জীবনে একটি ভুলের বোঝা মাত্র ? যার ফলে এই কাদায় পড়া অবস্থা ।···আমি কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারছি না যে সেই সব আপাতমধুর স্মৃতিগুলো হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কি করে । আবার আমি নিজেকে সেই সব হতভাগ্যদের সঙ্গে একাসনেও বসাতে পারছি না, যারা ভালবাসে, আবার ভুলে যায়, এবং এই করতে করতেই জীবন কাটিয়ে দেয়, প্রেম যে চিরন্তন, নির্দিষ্ট একনিষ্ঠতার প্রসাদ তা মনে না রেখেই । কয়েক সপ্তাহ আগেও আমি এ ভাবতে পারতাম না ।···কিন্তু জীবন এক অদ্ভুত অস্তিত্ব, আমারই দাঁতের বিষে আমি বিষ জর্জরিত, দোষ দেব কাকে ?

এ সব জিজ্ঞাসা আমার মনে ঝড় তুলছে, তার কারণ মৈত্রেয়ীর ওপর আমার ভালবাসা যে কতটা শক্তিশালী তা আমি জানি । একথা ঠিক যে জেনির সোহাগে, আলিঙ্গনে আগুন আছে, কিন্তু সে আগুনে আমি গা ঘিনঘিন

করতে করতে নিজেকে আহুতি দিয়েছি। যা করেছি, করেইছি, কিন্তু এ কথা ঠিক যে এর পর আর একটি নারীসঙ্গের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আমার অনেক—অনেক দিন লেগে যাবে। আর দুটো ক্ষেত্রের অস্তিত্বই আলাদা। আমি যাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি, সে হল মৈত্রেয়ী একমাত্র মৈত্রেয়ী। জেনি যখন নানাভাবে তার নিজস্ব ভঙ্গী এবং রুচিতে আমাকে আদর সোহাগ করে চলেছে, তখন আমি দাঁতে দাঁত চেপে থেকেছি। বেচারা জেনি, নেহাৎই মেয়েমানুষ। সে আমার দেহে পাশবিক সাড়া জাগিয়ে আমায় ক্ষেপিয়ে তুলতে পেরেছে, কিন্তু আমার মন থেকে, হৃদয় থেকে মৈত্রেয়ীকে মুছে দিতে পারে নি। অন্তরে যে নারীর স্মৃতি সদা চির জাগরুক হয়ে আছে, সে হল মৈত্রেয়ী একমাত্র মৈত্রেয়ীই। আর কেউ নয়।

মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি সব সময় আমার বুকের ওপর পড়ে থাকতে চাইছ কেন? সে তার ভাবলেশহীন দুটো নীল চোখ বড় বড় করে মেলে, বাচ্ছা মেয়ের মতো বলে উঠল—তুমি মৈত্রেয়ীকে যেমন করে ভালবাস, আমাকেও তেমনি করে ভালবাসবে বলে।

আমি চুপ করে গেলাম। এ রকম আকাঙ্ক্ষা কি সম্ভব? এই রকম ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা?

—যখন তুমি গল্প কর, মৈত্রেয়ীকে তুমি কত ভালবাস, তখন আমার নিজেকে বড় একা, বড় দুঃখী মনে হয়। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে···কান্না পায়···।

আমার মনে হয়, ও বুঝে ফেলেছে, যে আমি যে আদর সোহাগ উপভোগ করেছি সেটা নেহাৎই দৈহিক ইন্দ্রিয়ানুগ, আমিও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি না। পরদিন ভোরে ওর ঘর থেকে আমি যেন মুক্তি স্নান করে বেরিয়ে এলাম ও তখনও বিছানায় লেপ্টে শুয়ে আছে দোমড়ানো মোচড়ানো বাসি ফুলের মত, আমার মৈত্রেয়ীকে ভোলবার পাগল পারা চেষ্টার চিহ্ন স্বরূপ সমস্ত বিছানাটা এলোমেলো, নয়-ছয় হয়ে আছে।······

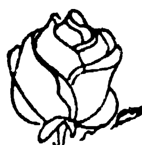
আমি সোমবার তাকে পাইন বন পেরিয়ে দূরে সেই ঝরণা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলাম। হায় ঈশ্বর! আমাকে কেন এ পথে নিয়ে যাচ্ছ? জেনি আইজাক! তোমাকে আমি কোনদিন স্বপ্নেও কাছে পাব?

আমার এই নির্জনে পড়ে থাকা, এই একাকীত্ব এবার আমার নিজের কাছে কি রকম বিরক্তিকর, বোকামি বলে মনে হতে লাগল। মৈত্রেয়ীকে নিয়ে আমার সাধের স্বপ্ন বার বার ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি লক্ষ্য করছি, যে আজকাল

সব স্মৃতি যেন অলীক কল্পনা বলে মনে হচ্ছে···আমার দিনে ক্লান্তি, রাতে অনিদ্রা···।

এর পর থেকে সব কিছু যেন বদলে যেতে লাগলো। একদিন সকালে আমি উপলব্ধি করলাম, এবার ফিরাও মোরে। আশ্চর্য, প্রভাত সূর্যের দিকে সরাসরি তাকিয়ে দেখলাম, সোনালী কিরণ, আর সবুজের মেলা। আমি বেঁচে গেছি: আমি মৃত্যুর কালো শীতলতা থেকে উদ্বেল আবেগ নিয়ে মুক্তি পেয়েছি। আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে, ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করছে। আমি বুঝতে পারছিনা কি করে এ অসম্ভব সম্ভব হল। কোন্ অপার্থিব শক্তি আমাতে ভর করে আমাকে বদলে দিয়েছে, সম্পূর্ণ পৃথক সত্তায় পরিণত করেছে।

আমি নির্জন পাহাড়কে বিদায় জানিয়ে ফিরে চললাম।



দিনের পর দিন আমি একটা চাকরির খোঁজে পোর্ট কমিশনার্স অফিস এবং অন্যান্য জায়গায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ব কথা দিয়েছিল ফ্রেঞ্চ কনসুলেটে ট্রানস্লেটরের চাকরি করে দেবে, সেটাও পাওয়া গেল না। আমার সম্বল বলতে আর শত খানেক টাকার বেশি কিছুই নেই, অথচ এখানে থাকতে গেলে আমার কিছু রোজগারের ব্যবস্থা চাইই। হারোও এই বিপদের সময়ও আমার প্রতি প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করল। আমি তাকে বলেছিলাম আমায় কটা দিন তার ঘরে থাকতে দিতে,—আমি ১৫ তারিখেই তার বাসা ছেড়ে দেব, কিন্তু সে আমার কথা রাখতে অস্বীকার করল একটা বাজে অজুহাতে যাতে আমি বিপদে পড়ি। সে বলল, আমি নাকি আর খৃষ্টান নই, কাজেই একজন পৌত্তলিকের সঙ্গে সে একঘরে শুতে পারবে না। আসল কথাটা হোল, সে আমার অবস্থাটা পুরোই জানত। সে জানত আমার কাছে আর বিশেষ টাকা নেই, আর আমার এখুনি একটা ভাল মাইনের চাকরিরও সম্ভাবনা নেই। মাদাম রিবেরিও এই সুযোগে ভুলেই গেল আমি তার জন্য কতটা করেছি। সে কেবল হারোওর ঘরে আমাকে নেহাৎ দেখে ফেলে, অনেক কষ্টে এক কাপ চা খাওয়াতে চাইল মাত্র। আমার আর বিক্রি করে পেট চালানোর মত অবশিষ্টও কিছুই নেই। খুব ভেঙে পড়লাম। বড় অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে। বড় হতাশায়, বড় কষ্টে……।

আমি আবার বাচ্চুর সঙ্গে দেখা করলাম। সে আমায় মৈত্রেয়ীর আর একটা চিঠি দিল। আমি সেটা নিতে অস্বীকার করলাম। সে আমার মনে করিয়ে দিল যে আমি ইঞ্জিনিয়ার মশাইকে আমার ওয়ার্ড অফ অনার দিয়েছিলাম। আমি কি সত্যই কোন কথা দিয়েছিলাম? আমার তো মনে পড়ছে না! বাচ্চু এমন ভান করল যেন মৈত্রেয়ীই বার বার তাগিদ দিচ্ছে আমাকে একদিন আলিপুরের পার্কে কিংবা সিনেমায় দেখা করার জন্য। মৈত্রেয়ী নাকি আমায় টেলিফোন করতে চেয়েছিল। আমি ফিরিয়ে দিলাম। সত্য বলতে কি একটু রূঢ়ভাবেই সব অস্বীকার করলাম। কিন্তু তার ফলে আমার ভেতরেও এক কষ্ট হতে লাগল। যখন বোকার মত, মাথা খারাপ করে চোখের জলে সব কিছু শেষ করে দিতে হচ্ছে, তখন আবার কোথা থেকে শুরু করব?

—ওকে বলে দিও, ও যেন তার অ্যালেনকে ভুলে যায়। সে মরে গেছে। কেউ যেন আর তার জন্য অপেক্ষা না করে।

আমি আমার ভেতরটা হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম, আর কি আমার ক্ষমতা আছে আবার নতন করে শুরু করার মতো! মৈত্রেয়ী কি সত্যিই আমার ওপর

চিরকালের জন্য নির্ভর করে থাকতে পারবে। কিন্তু আমি কিছুই খুঁজে পেলাম না, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। ওকে যদি নিয়ে যেতেই হয় হ্যাঁ তাই, ...কিন্তু কি করে নিয়ে পালাব? কি করে আবার আলিপুরের বাড়ীতে ঢুকব, কি করে মিঃ সেনের শ্যেনদৃষ্টি এড়াব?...হয়তো আবার নানা রকমের ঝামেলা বাধবে। হয়তো আমার বোধের কেউ মূল্যই দেবে না! হয়তো ও নিজেই আর আমায় বুঝবে না, আমার ওপর ভরসা করতে পারবে না। আমি জানি না, —আমি কিছুই জানি না। আমার এখন কেবল একটাই ইচ্ছে, ও আমায় ভুলে যাক্, ও যেন আমার জন্যে কষ্ট না পায়!

আমাদের ভালবাসা চিরজন্মের মত শেষ-হয়ে গেছে।

কাল ভোর থেকে টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। কেবল একই কথা ভেসে আসছে... "অ্যালেন কোথায়? আমি একটু ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওকে একটু বলে দিন, ব্যাপারটা খুবই জরুরী,...ওর বান্ধবী মৈত্রেয়ী ফোন করছে...।" শেষ পর্যন্ত আমায় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। ফোন ধরতেই ও বলল, "অ্যালেন এখুনি চলে এসে এই কালামুখীর সঙ্গে তোমার এতদিনের সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে যাও।" আমার ইচ্ছে করতে লাগল, এক্ষুনি ছুটে চলে যাই, ওর বুকে নিজেকে আছড়ে ফেলি...কিন্তু না। আমি কেবল মৃদু হাসলাম মাত্র। একটা বুনো অভিমান যেন আমায় পেয়ে বসেছে আমার যন্ত্রণা ক্রমশঃ তুঙ্গে উঠছে, আরও তুঙ্গে উঠুক যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে না যায়। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে বলব—ভগবান! যথেষ্ট হয়েছে।

আজ আমি যখন ব...এর সঙ্গে টেলিফোনে কথা শেষ করছি, হঠাৎ রিসিভারের মধ্যে দিয়ে কানে এল আর একটা গলার স্বর। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, মৈত্রেয়ীর গলা। কত ভয়ে, কত সন্তর্পণে বলছে—অ্যালেন, তুমি কেন চাইছ না যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি? তুমি কি আমায় ভুলে গেছ...?

আমি নিঃশব্দে টেলিফোনটা রেখে দিলাম। আশ পাশের টেবিল-আলমারি ধরে টলতে টলতে নিজের ঘরে এসে পেঁছিলাম। ওঃ ভগবান, কেন, কেন আমি ওকে ভুলতে পারছি না! কেন এই যন্ত্রণার আগুন কিছুতেই নিভছে না?......আমি এমন একটা কিছু করতে চাই, যাতে মৈত্রেয়ী আমাকে ভুল বোঝে, আমার ওপর বিরক্ত হয়, যা ওকে আমায় জোর করে ভোলার সুযোগ করে দেবে। আমি আর একটা মেয়ের সঙ্গে মিশব ঠিক করেছি সে গারট্রুড প্রিবং

আমি আলিপুরে বাচ্চুর সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলেও এলাম……

বার্মা অয়েল কোম্পানীর সঙ্গে কথাবার্তা অনেক এগিয়েছে। ওরা একজন এজেন্ট চাইছে। মনে হচ্ছে আমি পোস্টটা পেয়ে যাব। আমার পাওয়াটাও খুবই দরকার। সেদিন সারা দুপুর ও বিকেলটা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীতে ফ্লুভিয়্যাল এজেন্টের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা করলাম। এদিকে পুলিশও আমার ব্যাপারে এই নিয়ে দুবার আগ্রহী হয়েছে। ওরা ইওরোপীয়ান বেকারদের এখান থেকে ধরে ধরে আবার দেশে চালান করে দিচ্ছে। আমাকেও যদি দেয়, তাহলে তা হবে আমার পক্ষে নিষ্ঠুরতম পরাজয়……

আজ আমার কাগজপত্র গুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ মৈত্রেয়ীর একটা চিঠি বেরিয়ে পড়লো। চিঠিটা অজ্ঞাতনামা কেউ লিখেছিল ওকে, ওর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে. সঙ্গে একটা বিশাল ফুলের তোড়াও ছিল। চিঠিটা পড়ার এক অদম্য ইচ্ছে আমায় পেয়ে বসলো। কিন্তু আমি এখনও বাংলায় বড্ড কাঁচা, তাই চিঠিখানা পাশের ডাক্তারখানার এক ভদ্রলোককে দিয়ে পড়িয়ে নিলাম। ওটার লেখা—"…ওগো আমার চির-না-ভোলা, চির জাগরূক দীপশিখা, আজ আমি তোমায় দেখতে যেতে পারছি না। আজ তোমায় একান্ত একা, একান্ত আমার করে তো পাব না, যেমন করে সেদিন তোমায় সম্পূর্ণ আমার করে আশ্লেষে পেয়েছিলাম. আর সেদিন তো… "

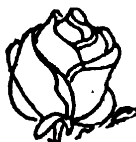
ওঃ, আর পড়া অসম্ভব! আমার ভেতর এক প্রচণ্ড ঈর্ষা অমানুষিক যন্ত্রণায় ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল। আমি আমার টেবিলের কাঠ দুহাতে প্রাণপণে চেপে ধরে নিজেকে সামলাতে লাগলাম। তা হলে আর আজও আমাকে ফোন করা কেন? এ কী তামাসা! ওঃ, ভগবান! আমি যে বড় ভালবেসে ছিলাম, বড্ড ভালবেসে ফেলেছিলাম! তা হলে কি সবটাই আমার ভুল? কোথায় আমার ভুল, কোথায় আমার গলদ্? নাকি, আমার বিপক্ষে সকলের অনেক, অনেক কিছু বলার রয়ে গেছে?

আজকাল আমি আর ডায়েরিতে সব ঘটনার কথা লিখি না। আশা করছি, খুব শিগ্গিরই ভারতবর্ষের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হবে! আমার চাকরির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। যদিও এখনও পাকা হয় নি, তবু আমি নিশ্চিত যে এ চাকরিটা আমার হবেই, এবং আমায় সিঙ্গাপুরে গিয়ে যোগ দিতে হবে, ওরা আমার যাওয়ার খরচ পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার চারপাশে আমাকে কিছু বলার মত কেউ নেই। আমি নিজেই নিজেকে উৎসাহিত ও চাঙ্গা করে তুলেছি যাতে

কাজটা পেয়ে যাই……।

হ্যারোওর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। নেহাৎ ক্লারা যদি না থাকত, তাহলে এতদিন হয়েই যেত কিছু একটা। ওর ওপর একটা ভয়ঙ্কর রাগ চেপে বসেছে আমার মনে। ব্যাপারটা নিয়ে একদিন গারতির সঙ্গে ক্লারার তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। তারপর থেকে আমি গারতির ঘরেই আছি, আর দুনিয়া শুদ্ধ লোকে আমাদের সবচেয়ে 'সুখী পরিবার' বলে ধরে নিয়েছে। লোকে ভাবছে আমরা দুজনে বুঝি গোপনে বিয়েটা সেরে নিয়েছি। গারতি আসল সত্যটা ভাল করেই জানে, আমি মৈত্রেয়ীর প্রেমে পাগল হয়ে আছি আর ওর সঙ্গে ঘুরলেই মৈত্রেয়ী আমার ওপর ক্ষেপে দূরে সরে যেতে পারে।

বাচ্চু নানা ছুতোয় আমাকে ধরবে বলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে আমায় যত চিঠি পাঠাচ্ছে আমি তার অর্ধেকও পড়ে দেখছি না। সেগুলো ন্যাক্কারজনক ইংরাজীতে লেখা। সে বারবার আমায় লিখেই চলেছে যে মৈত্রেয়ী সেই মারাত্মক ভুলটা করবে বলে ঠিকই করে ফেলেছে, আর তার ফলে লোকে তাকে খোঁজাখুঁজি করবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, মৈত্রেয়ী নাকি আমার কাছেই এসে উঠবে। তার এই মতলবের কথা পড়ে আমি মনে মনে বেশ শঙ্কিতই বোধ করলাম। কিন্তু আমি তাকে আমার এই ভাবনার কথা ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে দিলাম না, বরং খুব রূঢ় ভাবেই এ সব ব্যাপার এবং যা সে আমায় আগে বলেছিল, পুরোপুরিই উড়িয়ে দিলাম। বাচ্চু আমায় প্রায় ভয় দেখিয়েই জানিয়ে দিয়েছে যে আমায় খুঁজে বার করার জন্য মৈত্রেরী কোন বাধাকেই গ্রাহ্য করবে না। নাটক একেবারে…।



সিংগাপুর। আমার সংগে মিসেস সেনের ভাইপো জ…এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও এখানকার একটা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে কাজ করে। অপার আনন্দে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম, কত পুরনো দিনের কথা হোল। ওই এখানে আমার প্রথম পরিচিত ব্যক্তি। আমি ওকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করলাম। খাওয়ার পর সিগারেট খেতে খেতে ও সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ওর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় বলল,—অ্যালেন, তুমি কি জান, মৈত্রেয়ী তোমায় কত ভালবাসে? তোমাদের এই সম্পর্ক সকলেই জেনে গেছে…।

আমি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলাম। যদি ব্যাপারটা আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য খবর না হয়, তাহলে আমি আর এ নিয়ে কথা বাড়াতে চাই না, কোন উৎকণ্ঠা প্রকাশ, বা অন্য কিছু না , আমি জানি সকলে মিলে ব্যাপারটাকে নিয়ে অনেক জল ঘোলা করেছে ইতিমধ্যে। সত্যি, লোকের কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই?

কিন্তু জ……আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

—শোন, আমায় বলতে দাও, তোমার জন্যে আর একটা নতুন দুঃসংবাদ আছে।

—অন্ততঃপক্ষে সে মরেনি নিশ্চয়ই!

আমি প্রায় আর্ত স্বরে বলে ফেললাম—ব্যাপারটা জানার আগেই। আমার মনে হতে লাগল ও এখুনি যা বলবে তা আমি আমার মন, প্রাণ, অন্তর দিয়েই জানি, ও নিশ্চয়ই মৈত্রেয়ীর মৃত্যুর খবর দেবে। আমার মনে হল আমার চোখের সামনে থেকে মৈত্রেয়ী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে… ।

—মরলে তো চুকেই যেত। ও যা করেছে, সেটা তার চেয়েও ঘৃণ্য কাজ। ও ঐ ফলওয়ালাটার সংগে পালিয়েছে……?

আমার মনে হল চিৎকার করে কেঁদে উঠি, দাপাদাপি করি, প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ি। আমি টেবিলের কোনা দুটো চেপে ধরে নিজেকে কোন রকমে সামলালাম। মনে হচ্ছিল, চোখের সামনে অন্ধকার, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। জ…আমার করুণ অবস্থা দেখে আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগল।

—সত্যিই, ও যা করেছে, তা আমাদের সকলের কাছেই যথেষ্ট দুঃখের ব্যাপার। ছোট মা প্রায় দুঃখে পাগলই হয়ে গেছেন। মৈত্রেয়ীকে ধরে মেদিনীপুরে আটকে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা গোপন রাখার চেষ্টাই হয়েছিল। তবে এখন প্রায় সবাইই জেনে গেছে।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম ওরা ওকে খুব অত্যাচার করছে কিনা।

—মিঃ সেন তো ঠিক করেছেন ওকে আর ও বাড়ীর দরজা ডিঙোতে দেবেন না। বলছেন, মৈত্রেয়ীর পালানোর জন্যে যে দায়ী, তাকে পেলে উনি টুকরো করে ফেলবেন। সকলে চেয়েছিল ও পড়াশোনা করবে। আমি ঠিক জানি না,—বোধ হয় ফিলজফি।...ওরা ব্যাপারটা চেপে রাখতেই চেয়েছিল। কিন্তু তো সব্বাই জেনে ফেলেছে...কে ওকে ঘরে নেবে?.......মৈত্রেয়ী খুব চিৎকার চেঁচামেচি করেছে—"আমায় কুকুরের মুখে ফেলে দিলে না কেন? রাস্তায় বার করে দিলে না কেন?" যাচ্ছেতাই ব্যাপার।...আমি জানি, এটা মৈত্রেয়ী খুবই ভুল করেছে। কিন্তু এ ছাড়া ও আর কিই বা করতে পারতো?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমি ভেবেই চললাম। কিন্তু ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলামনা। আমি কি নরেন্দ্র সেনকে টেলিগ্রাম করব? মৈত্রেয়ীকে লিখব?

আমি বুঝতে পারছিলাম মৈত্রেয়ী এই ভুলটা আমার জন্যেই করেছে! বাচ্চু যে চিঠিগুলো আমায় এনে দিয়েছিল, সেগুলো সব যদি খুঁটিয়েপড়ে দেখতাম! হয়তো তার মধ্যে ওর কোন প্ল্যান লেখা ছিল! আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে...। আমি সব কিছু লিখে রাখব, সমস্ত কিছু।

...উত্তেজনার বশে আমি কোথাও একটা বিরাট ভুল করে বসিনি তো? আমার ভালোবাসার মূল্যবোধ নিয়ে আমায় কেউ বোকা বানায়নি তো? কেন আমি বিচার বিবেচনা না করে সবকিছু বিশ্বাস করতে গেলাম! কি জানি আমি?

আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে করতে লাগল মৈত্রেয়ীকে একবার অন্তত চোখের দেখা দেখি......

জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

———